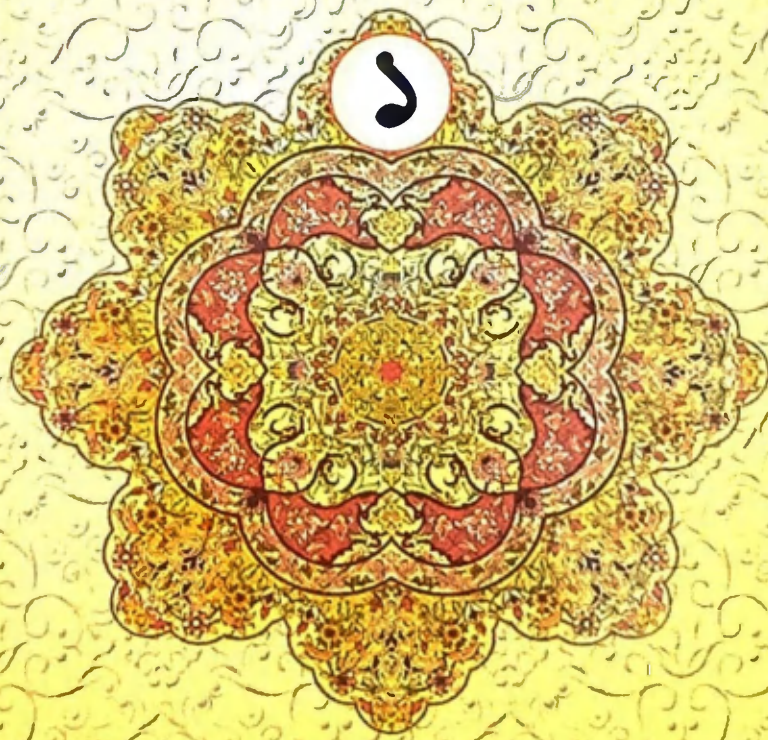


আপনার প্রশ্ন-আমাদের উত্তর
কুরআন-হাদীস থাকতে

মায়হাব কেন?



নির্দেশনায়
শায়খুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী দা.বা.

তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায়
সাইদ আহমদ

আপনার প্রশ্ন-আমাদের উত্তর
কুরআন-হাদীস থাকতে
মাযহাব কেন?



নির্দেশনায়

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দামাত বারাকাতুহুম)

তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায়

সাদ্দীদ আহমদ (হাফিয়াহুল্লাহ)

উস্তাদ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী ।
খতীব, নাসিরাবাদ সরকারি কলোনি জামে মসজিদ ।

প্রকাশনায়

উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf

নির্দেশনা: শায়খুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী (দামাত
বারাকাতুহম)

সম্পাদনা: সাজ্জিদ আহমদ (হাফিয়াহুল্লাহ)

সংকলন: উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগের মুতাআল্লিমীন
(১৪৩৭-৩৮ হিজরী, ২০১৬-১৭ ইংরেজি)

স্বত্ব: দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল: ১৪৩৯ হিজরী
২০১৮ ইংরেজি

প্রকাশনায়: উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

পরিবেশক: মাওলানা মুফতি ইসহাক, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া: ৩০০ টাকা মাত্র।

মুসলিম উম্মাহর দরদী রাহবার, ইসলাম ও মুসলমানদের অন্যতম ইতিহাস নির্মাতা, উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম, বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়্যাহর চেয়ারম্যান ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা

শাহু আহমদ শফী সাহেব দা.বা. এর-

দুআ ও অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد!

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি সক্রিয় রয়েছে। একটি শক্তির কাজ হচ্ছে মানুষকে হিদায়াত, কল্যাণ ও যাবতীয় মঙ্গলের পথে আহ্বান জানানো।

বিপরীত শক্তির কাজ হলো, মানুষকে ধ্বংসের অতলাস্তে নিক্ষেপ করতে যাবতীয় অপপ্রয়াসে প্রলুব্ধ করা।

দুই শক্তির এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিরন্তন। অপশক্তি যখনই বেপরোয়াভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন তার বিপরিতে হকের বাণী উচ্চকিত হয়েছে। সাময়িকভাবে অপশক্তির কৃত্রিম কারুকার্যতা প্রদর্শিত হলেও শেষ পর্যন্ত হকেরই বিজয় হয়েছে।

জামেয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকগণ সব ধরনের বাতিল মুকাবালা করে আসছেন। ইসলামের যেকোন শাখা কুচক্রী মহল দ্বারা আক্রান্ত হলে তার মুকাবালা ওয়াজ, মুনাযারা, পুস্তক রচনা ও মাঠে-ময়দানের আন্দোলন সহ সব মাধ্যমেই করে আসছেন।

বর্তমানে ফিতনা বেড়ে যাওয়ায় বাতিল প্রতিরোধে নিয়োজিত একদল দাঈ, মুনাযির, ওয়ায়েয ও লেখক তৈরির প্রকট প্রয়োজন সামনে রেখে ১৪৩৫ হিজরী সন মোতাবেক ২০১৪ সালে একটি স্বতন্ত্র বিভাগই খোলা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! বিভাগটি তার লক্ষ্যে পৌঁছায় সচেষ্ট রয়েছে।

বর্তমানে কাদিয়ানী, শিয়া, রেযাখানী, মওদূদী, আহলে হাদীস, এনজিও-এ কয়েকটা ফিরকা খুব তৎপর। আমি ইতিপূর্বে এ ফিরকাগুলো নিয়ে ‘হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব’ নামে একটি বইও প্রকাশ করেছি। উল্লিখিত প্রত্যেক ফিরকা বিষয়ে স্বতন্ত্র আরো বই-পুস্তক লেখা দরকার বলে মনে করি।

বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষে ‘কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ ও মাযহাব’ নামে ছাত্রদের কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো। এ বছরও ‘কুরআন-হাদীস থাকতে

মাযহাব কেন?’ বই আকারে ছাত্রদের প্রবন্ধ ছাপানোর উদ্যোগ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

এ বইটির কিছু অংশ দেখেছি। বইটি প্রশ্ন-উত্তর আকারে হওয়াতে বেশি ভাল হয়েছে। এতে অনেকের প্রশ্ন ও সন্দেহের অবসান ঘটবে এবং মনে রাখতেও সহজ হবে। বইয়ের কলেবর যদিও কিছুটা বড় হয়ে গেছে, তবে এতে অনেক ফায়দাজনক কথা এসেছে।

আশা করি এ বই সর্বসাধারণের পাশাপাশি তুলাবা-ফুযালাদেরও অনেক উপকারে আসবে।

‘দাওয়াহ বিভাগ’-এর উস্তাদগণের শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে আমার প্রিয় শাগরিদ মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেবের। তিনি ছাত্রদের তামরীন ও অনুশীলনমূলক প্রবন্ধগুলো অনেক মেহনত করে পুনঃপ্রস্তুত করে ছাপানোর উপযোগী করে তুলেছেন এবং দীর্ঘ ভূমিকাতে ইজতিহাদ-তাকলীদের মূল হাকীকত ও পরিধিসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা লিখেছেন। এতে অনেকের ভুল বুঝাবুঝির অবসান হবে এবং বিরোধীদের প্রোপাগান্ডার সুযোগ বন্ধ হবে। আল্লাহ তার ইলম, আমল ও খিদমাতে এখলাছ ও বেশা-বেশী বরকত দান করুন।

আশা করি তিনি ছাত্রদের পিছনে এভাবে মেহনত করে অন্যান্য ফিরকা বিষয়েও আরো কিছু মূল্যবান বই উপহার দিবেন। আল্লাহ পাক মাওলানার ও তালেবে ইলমদের অক্লান্ত পরিশ্রমের এ ফসলকে কবুল করুন এবং আম মাকবুল দান করুন। আরো ব্যাপক আকারে এ বিভাগ, উস্তাদ ও ছাত্রগণ সকলকে দ্বীনের খেদমত করার ও বাতিল প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(আহমদ শফী দা.বা.)

(Signature)

মহাপরিচালক, দারুল উলুম
মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
চট্টগ্রাম।

উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস ও সহকারী পরিচালক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক হযরতুল আল্লাম হাফেজ মুহাম্মদ

জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিয়াহুল্লাহ- এর

অভিমত

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং দরুদ ও সালামের হাদিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ও তাঁর আল ও আসহাবের উপর।

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে আজ অবধি হক ও বাস্তবতার মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় যুগে যুগে বহু দল-মতবাদের জন্ম হয়েছে। ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, প্রত্যেক দল ও মতবাদ হকের মোড়কে নিজেকে প্রকাশ করে। তবে পরবর্তীতে তাদের থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। হয়তো তারা জাগতিক কোনো শক্তির এজেন্ট বাস্তবায়নের মানসে নেমেছে বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষে কাজ করছে। আর মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস হলো, প্রত্যেক নতুন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ফলে সরলমনা মুসলমানরা তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাদের ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে উঠে। যার চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায়, মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসংবাদ ও কোন্দল।

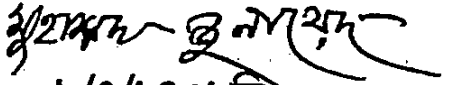
উল্লিখিত অবস্থার ব্যতিক্রম নয় বর্তমান নামধারী লা-মাযহাবী মতবাদ।

আলহামদুলিল্লাহ, উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এসব বাতিল মতবাদের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত কয়েক বছর পূর্বে 'উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। এ বিভাগের তালেবে ইলমরা তাদের আসাতিয়ায়ে কেরামের নেগরানীতে বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে।

‘কুরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব কেন?’ এ কিতাবটি সেই কাজেরই সুফল। দাওয়াহ বিভাগের উস্তাদ মাওলানা সাঈদ আহমদের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় রচিত এবং শুরুতে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহ লা-মাযহাবীদের তাকলীদ-মাযহাব সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অনেক প্রশ্নোত্তরসমূহের একটি অনবদ্য সংকলন।

আশা করি এ কিতাবটি সর্বস্তরের মুসলমান বিশেষ করে তাদের প্রোপাগাণ্ডায় আক্রান্ত মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দিবে ও বিভ্রান্ত মানুষদের হক পথে ফিরিয়ে আনবে। এবং এর মাধ্যমে লা-মাযহাবী ফিতনা মূলোৎপাটন হয়ে মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বিকশিত হবে, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তাআলা এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন!

(মুহাম্মদ জুনায়েদ)


৯/৭/১৪৩৯ই.

সহকারী পরিচালক,
দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী চট্টগ্রাম।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক


https://t.me/islaMic_bdf

আল্লাহ পাকের কুরআন এক হওয়া সত্ত্বেও আসেমের কেরাত, নাফে'র কেরাত এবং রাসূলের হাদীস এক হওয়া সত্ত্বেও বুখারীর হাদীস, মুসলিমের হাদীস যেভাবে বলা যায়, তেমনিভাবে কুরআন-হাদীস এক হওয়া সত্ত্বেও আবু হানীফার মাযহাব, শাফেয়ীর মাযহাবও বলা যায়।

ইমাম বুখারীর হাদীস যেমন রাসূলের হাদীস, ইমাম আবু হানীফার মাযহাবও তেমনি রাসূলের মাযহাব। পার্থক্য হল, ইমাম বুখারী রহ. হাদীসের শব্দ হেফাজত করেছেন, যদ্বারা আমরা হাদীস পড়তে পারি। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীসের মর্ম ও ব্যাখ্যা হেফাজত করেছেন, যদ্বারা আমরা হাদীস মতে আমল করতে পারি। বুখারীর হাদীসকে যেমন রাসূলের হাদীস নয় বলার সুযোগ নেই, তেমনি আবু হানীফার মাযহাবকেও রাসূলের মাযহাব নয় বলার অবকাশ নেই।

পূর্ববর্তি মুহাদ্দিসীনে কেরাম সংকলিত হাদীসের কিতাবকে উপেক্ষা করে যেমন নতুন করে হাদীসের শব্দ সংকলন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে পূর্ববর্তি ফুকাহায়ে কেরামের সংকলিত ফিকহ ও মাযহাব বাদ দিয়ে নতুন কোন ফিকহ ও মাযহাব সংকলন গ্রহণযোগ্য নয়।

কোন দলিল তলব করা ব্যতীত ডাক্তার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করা যেভাবে অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে না হয়ে, (ডাক্তারের প্রতি) স্বচ্ছ বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়। তদ্রূপ মাসায়েলের দলিল তলব করা ছাড়া ইমামের তাকলীদ ও অনুসরণও অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে না হয়ে, বরং (ইমামের প্রতি) স্বচ্ছ বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়।

মেডিকেল সাইন্স ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বই থাকার পরও যে কারণে ডাক্তারের কথা মানতে হয় এবং সংবিধান ও আইনের বই থাকা সত্ত্বেও উকিলের শরণাপন্ন হতে হয়, ঠিক একই কারণে কুরআন-হাদীস হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও ইমামগণের অভিমত ও মাযহাব অনুসরণ করতে হয়।

হাদীসের শব্দ ও ফিক্হ হল এমন, ঘরের ফাউন্ডেশন ও ইমারত যেমন। ফাউন্ডেশনবিহীন ইমারতের যেমন স্থায়ীত্ব নেই, তদ্রূপ ইমারতবিহীন ফাউন্ডেশনেরও কোন মূল্য নেই।

মুহাদিস ও ফকীহের উপমা হল, ফার্মাসিস্ট ও ডাক্তারের মত। ঔষধ ছাড়া ডাক্তারের ডাক্তারী যেমন ফল বয়ে আনে না, তেমনি ফার্মাসিস্টের কাছে ঔষধ থাকলেও কোন সফলতা দেখাতে পারবে না।

অসুস্থ হলে যেমন নিজেদের সিদ্ধান্তে চিকিৎসা করা দুনিয়ার জীবনের জন্য ঝুঁকিবহুল বিশ্বাস করি, অনুরূপ মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্তে শরীয়তের উপর আমল করাও আখেরাতের জীবনের জন্য বিপদসংকুল মনে করি। আর দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী; আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী।

মুজতাহিদ হল, মালিকে নিসাবের মত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ও বছর পূর্ণ হওয়া ছাড়া যেমন যাকাত ওয়াজিব হয় না, তেমনি ইজতিহাদের যোগ্যতা ও ইলমী-আমলী শর্ত পাওয়া যাওয়া ব্যতীত ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য হয় না।

পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ যেভাবে হয়রত ঈসা আ. এর উপর সমাপ্ত হয়নি, তদ্রূপ ইজতিহাদের দরজাও পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের উপর বন্ধ হয়নি। তবে ঈসা আ. এর পর যেমন পিতাবিহীন আর কেউ জন্ম গ্রহণ করেনি, তেমনি চারশ হিজরীর পর আর কোন কামেল মুজতাহিদের দেখা মিলেনি।

কিংবা বলতে পারেন, ৩ লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকার হিফয শক্তি যেমন ইমাম বুখারী/অন্য মুহাদিসগণের উপর সমাপ্ত হয়নি, তদ্রূপ ইজতিহাদের দরজাও ইমাম আবু হানীফা/অন্য মুজতাহিদগণের উপর বন্ধ হয়নি। কিন্তু ৩ লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকার হিফয শক্তির মালিক কোন মুহাদিসের যেমন তিন-চারশ হিজরীর পর হাদিস মিলেনি, তদ্রূপ চারশ হিজরীর পর কোন কামেল মুজতাহিদেরও দেখা মিলেনি।

সংক্ষিপ্ত সূচি

- ভূমিকা (ইজতিহাদ-তাকলীদ: জটিলতা ও সতর্কতা)/ ২১-১২৫
- তাকলীদ পরিচিতি/ ১২৬
- ইজতিহাদ পরিচিতি/ ১৩৬
- ইজতিহাদের শর্ত ও মুজতাহিদের উসূল/ ১৪৪
- কুরআন তো সহজ, ইজতিহাদের জন্য এত শর্ত কেন?/ ১৪৬
- ইজতিহাদ-তাকলীদের ইতিহাস ও প্রকারভেদ/ ১৫১
- তাকলীদ-ইজতিহাদের প্রামাণিকতা/ ১৫৯
- তাকলীদের যৌক্তিকতা ও গাইরে মুকাল্লিদীনদের ইমামদের দৃষ্টিতে তাকলীদ/ ১৬৬
- ইজতিহাদ-তাকলীদে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি/ ১৭৫
- চতুর্থ শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ প্রসঙ্গ/ ১৭৯
- বিশ্বব্যাপী মাযহাব অনুসারীদের অবস্থান ও পরিসংখ্যান/ ১৮২
- নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ ওয়াজিব/ ১৮৫
- চার মাযহাব থাকতে এক মাযহাবে সীমাবদ্ধ কেন?/ ১৯৩
- মাযহাব: পরিচিতি, সূচনা ও ক্রমবিকাশ/ ১৯৬
- হানাফী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/ ২০৪
- হানাফী মাযহাবের ধারাবাহিক সনদ/ ২১১
- প্রসঙ্গ “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব”/ ২১৩
- চতুর্থ শতাব্দীতে মাযহাব সূচনার দাবী ও তার খণ্ডন/ ২১৯
- মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে কি?/ ২২৬
- ভিন্ন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান/ ২২৯
- ভিন্ন মাযহাবের ইমামের পিছনে নামায আদায় প্রসঙ্গ/ ২৩৩
- মাযহাব চারটি কেন?/ ২৩৬
- মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ/ ২৪০
- ইমামগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁদের তাকলীদ করা/ ২৪৪
- কুরআনে কারীমে তো কিয়াস করতে নিষেধ করা হয়েছে/ ২৪৮
- তাকলীদ কি কুরআন বিরোধী?/ ২৫১
- কুরআন-হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা কী?/ ২৫৪

পারম্পরিক বিভেদে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ও মাযহাবসমূহের
'মতভেদ/ ২৬৫

ইমামগণের তাকলীদ পোপ-পাদ্রিদের তাকলীদে মতো হওয়ার কারণে
শিরক/ ২৭৪

ইমাম আবু হানীফা রহ. স্বল্প হাদীস জানার অপবাদ/ ২৮২

হানাফী মাযহাবের মাসায়েল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়/ ২৯৮

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ দলীল কি দুর্বল?/ ৩০৭

ইলমে হাদীস ও কূফা নগরী, ইমাম বুখারী ও মাযহাবে হানাফী/ ৩১১

হানাফীরা মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ ও তার জবাব/ ৩১৬

আহলে হাদীস: ইতিহাস, ক্রমবিকাশ, পরিচিতি ও পর্যালোচনা/ ৩৩৩

বিস্তারিত সূচি

- ভূমিকা (ইজতিহাদ-তাকলীদ: জটিলতা ও সতর্কতা)/ ২১
- ইজতিহাদ-তাকলীদ: জটিলতা ও সতর্কতা / ২২
- ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাবের ক্ষেত্র ও পরিধি/ ২৫
- তাকলীদের মূল উদ্দেশ্য: অস্পষ্টতা ও জটিলতার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণ/ ৩৭
- ইমামগণ শারে' (শরীয়তপ্রণেতা) নয়, বরং শারেহ (ব্যাখ্যাকার)/ ৪০
- সাধারণ ও গায়রে মুজতাহিদদের জন্য তাকলীদ আবশ্যিক/ ৪২
- ইজতিহাদের অযোগ্য আলেমদেরকেও তাকলীদ করতে হবে/ ৪৮
- মানুষ দুই শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ/ ৪৮
- ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, শাহ ওলীউল্লাহ ও আরবের আলেমগণ কি তাকলীদ বিরোধী?/ ৫২
- মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য, কারণ ও করণীয়/ ৫৭
- কুরআন-সুন্নাহ থেকে দ্বিতীয় প্রকার দলীলের দৃষ্টান্ত আল্লাহ, রাসূল, সাহাবা ও সালাফদের নীতি/ ৬১
- দ্বিতীয় প্রকার দলীলের ক্ষেত্রে মতভেদের হুকুম ও শরীয়তের মূলনীতি/ ৬৪
- ইজতিহাদী ইখতিলাফের স্বীকৃতি/ ৭০
- ইজতিহাদী ইখতিলাফের হুকুম ও করণীয়/ ৭১
- ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ, মুহাব্বত অপরিহার্য/ ৭৬
- রাবেতা আলমে ইসলামী এর ফিকহী বোর্ড এর সিদ্ধান্ত/ ৭৮
- শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদের ক্ষেত্রে নিজ এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা/ ৮৪
- শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদ বিলুপ্ত করা কিংবা সবাইকে একই পদ্ধতির অনুসারী বানানোর চেষ্টা করা বাস্তবতার পরিপন্থী/ ৯৭
- একটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথা ও ধোঁকা/ ৯৯
- ইজতিহাদী যোগ্যতা সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির বিষয়, সখ ও স্বপ্নের নয়/ ১০০
- সাওয়াব ও পুণ্য যোগ্যতার শর্তে আবদ্ধ/ ১০৫

- মুহাদ্দিস আর মুজতাহিদ এক নয়/ ১০৮
- নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ সম্পর্কে দুটি কথা/ ১১১
- অপব্যাক্যার কিছু নমুনা/ ১১৬
- বই প্রসঙ্গে কিছু কথা/ ১২৪

তাকলীদ পরিচিতি

- তাকলীদ অর্থ কী?/ ১২৬
- তাকলীদ কি দলিলবিহীন অনুসরণের নাম? / ১২৭
- তাকলীদ কি ‘অন্ধ বিশ্বাস’-এর নাম?/ ১২৭
- তাকলীদের অর্থ কি গরু-ছাগল, কুকুর ও ইত্যাদির গলায় শেকল লাগানো?/ ১২৭
- তাকলীদ ও ইত্তিবার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?/ ১২৯
- তাকলীদ ও ইত্তিবার ব্যাপারে লা-মাযহাবী ভাইদের প্রশ্নের জবাব/ ১৩০
- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (৬৩) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ উক্ত আয়াতের উপর আরোপিত প্রশ্নের জবাব/ ১৩২
- একজন বড় আলেমের তাকলীদ ও সাধারণের তাকলীদ কি একই ধরনের, নাকি এর কোনো স্তর রয়েছে?/ ১৩৩

ইজতিহাদ পরিচিতি

- ইজতিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?/ ১৩৬
- ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাঝে পার্থক্য আছে কী?/ ১৩৬
- আমরা জানি, ইমাম ইবনে সীরীন রহ.সহ অনেকেই বলেছেন, *أول من قاس* তাহলে ইমামগণ কি শয়তানের অনুসারী?/ ১৩৬
- কুরআন-সুন্নাহ থাকতে ইজতিহাদ-তাকলীদের প্রয়োজন কী?/ ১৩৭
- ইজতিহাদ-তাকলীদ কোথায় বৈধ? এবং কী কারণে মানুষ ইজতিহাদ-তাকলীদ করতে বাধ্য?/ ১৩৮
- মুজতাহিদ ইমামগণকে মানলে কি শিরিক হবে এবং তারা কি শরীয়তপ্রণেতা হয়ে যাবে?/ ১৪১
- মুজতাহিদ ইমামগণকে না মেনে আমরা নিজেরা ইজতিহাদ করে আমল করলে সমস্যা কোথায়?/ ১৪২

ইজতিহাদের শর্ত ও মুজতাহিদের উসূল

- ইজতিহাদ করার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?/ ১৪৪
- “وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ” কুরআন তো সহজ, ইজতিহাদের জন্য এত শর্ত কেন?/ ১৪৬
- মুজতাহিদের ইস্তিযাত (কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা উদঘাটন) করার উসূল কয়টি ও কী কী?/ ১৪৮
- দুই হাদীসের মধ্যকার তাআরুয (মতবিরোধ) নিরসনের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের উসূল কী?/ ১৪৯
- ইজতিহাদ কত প্রকার ও কি কি?/ ১৪৯
- ইজতিহাদের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করলে ক্ষতি কী ?/ ১৫০

ইজতিহাদ-তাকলীদের ইতিহাস ও প্রকারভেদ

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইজতিহাদের প্রমাণ আছে কি?/ ১৫১
- সাহাবায়ে কিরাম রা. ও তাবেরীনের যুগে ইজতিহাদের প্রমাণ আছে কি?/ ১৫৩
- তাকলীদ কত প্রকার ও কী কী?/ ১৫৪
- নববী যুগে উভয় প্রকার তাকলীদ কি বিদ্যমান ছিল?/ ১৫৫
- সাহাবায়ে কিরামের যুগেও কি উভয় প্রকার তাকলীদের প্রচলন ছিল?/ ১৫৬
- তাবেরীদের যুগেও কি উভয় প্রকারের তাকলীদের প্রচলন ছিল?/ ১৫৮

তাকলীদ-ইজতিহাদের প্রামাণিকতা

- কুরআন থেকে তাকলীদ বৈধতার প্রমাণ দিন?/ ১৫৯
- হাদীস থেকে তাকলীদ বৈধতার প্রমাণ পেশ করুন/ ১৬০
- আসারে সাহাবা তথা সাহাবীদের কর্যকলাপের মাধ্যমে তাকলীদের বৈধতা পেশ করুন/ ১৬২
- ইজতিহাদ কি বৈধ, বৈধ হলে তার প্রমাণ পেশ করুন?/ ১৬৩

তাকলীদের যৌক্তিকতা ও গায়রে মুকাল্লিদীনদের অনুসরণীয় ইমামদের দৃষ্টিতে তাকলীদ

- শরীয়তের ইজতিহাদী মাসআলায় তাকলীদ জরুরী হওয়ার যৌক্তিকতা কি?/ ১৬৬
- তাকলীদ করা ছাড়া কি হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব?/ ১৬৭
- তাকলীদের ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদীনদের অনুসরণীয় ও নির্ভরযোগ্য ওলামাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?/ ১৬৮

ইজতিহাদ-তাকলীদে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি

- কোনো ইমামের বক্তব্য ও ফতোয়া কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হলেও কি সেই ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব?/ ১৭৫

চতুর্থ শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ প্রসঙ্গ

- চতুর্থ শতাব্দীর পরে কি ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে? হলে তার প্রমাণ কী?/ ১৭৯
- এখনও কি কোনো মুজতাহিদ জন্ম নিতে পারে?/ ১৮০
- আমাদের আর মুজতাহিদগণের মাঝে কি কোনোরূপ পার্থক্য আছে? কুরআন সুন্নাহ তো সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে?/ ১৮০

বিশ্বব্যাপী মাযহাব অনুসারীদের অবস্থান ও পরিসংখ্যান

- সারা বিশ্বে মাযহাব অনুসরণকারীদের সংখ্যা কত এবং কোন মাযহাবের অনুসারী কী পরিমাণ?/ ১৮২
- হানাফী মাযহাবের অনুসারী বেশি হওয়ার কারণ কী?/ ১৮২
- কোন্ দেশে কোন্ মাযহাবের অনুসারীদের অবস্থান?/ ১৮৩
- সংখ্যাধিক্যের অনুসরণ করা কি কর্তব্য?/ ১৮৩

নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ ওয়াজিব

- তাকলীদ করা কি ওয়াজিব? ওয়াজিব হলে দলিল কী?/ ১৮৫
- নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানা কি ওয়াজিব?/ ১৮৫
- নির্দিষ্ট মাযহাব মানার বাধ্য-বাধকতা তো সালাফের যুগে ছিল না। এখন বাধ্য করার কারণ কী?/ ১৮৭
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেরী যুগের বিষয়টি রহিত করে সীমাবদ্ধ করার কারণ কী?/ ১৮৮
- তাকলীদে শাখছী বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানাটা কে ওয়াজিব করলেন?/ ১৮৯

- যেহেতু নির্দিষ্ট মাযহাব মানা ওয়াজিব; মাযহাব তো আরও রয়েছে। কিন্তু আপনি হানাফী মাযহাব কেন অনুসরণ করেন?/ ১৯১
- যেখানে সব মাযহাব চালু রয়েছে সেখানেও হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন কেন?/ ১৯১
- একজন নওমুসলিম কোন মাযহাব অনুসরণ করবে?/ ১৯২

চার মাযহাব থাকতে এক মাযহাবে সীমাবদ্ধ কেন?

- চার মাযহাবের নির্দিষ্ট একটিকে মানতে হবে কেন?/১৯৩

মাযহাব: পরিচিতি, সূচনা ও ক্রমবিকাশ

- মাযহাবের আভিধানিক ও পারিতাষিক অর্থ/ ১৯৬
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কি মাযহাব মানার প্রচলন ছিল?/১৯৬
- হাদীসে মুআয রা. এর উপর আরোপিত প্রশ্ন ও তার জবাব/ ১৯৮
- সাহাবায়ে কেরামের যামানায় কি মাযহাবের প্রচলন ছিল?/ ১৯৯
- সাহাবায়ে কেরামের যামানায় প্রসিদ্ধ মাযহাব কয়টি ছিল? এবং সেগুলো কাদের মাযহাব ছিল?/ ১৯৯
- তাবেরীন ও পরবর্তী যামানায় কোথায় কাদের ফতোয়ার প্রচলন ছিল?/ ২০০
- তাদবীনে ফিকহ বা ফিকহের সংকলন এর সূচনা কখন ও কীভাবে হয়?/ ২০৩
- হানাফী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/ ২০৪

ফিকহে হানাফীর ক্রমবিকাশ ও প্রসিদ্ধি লাভ

- বিশ্বব্যাপী অল্পসময়ে হানাফী মাযহাব প্রসিদ্ধি এবং অধিক অনুসারী হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী?/ ২০৫
- কাদের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের প্রচার লাভ হয়?/ ২০৭

যে সকল স্থানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী

- ভারত উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের সূচনা কখন থেকে শুরু হয়?/ ২০৭
- ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কেরামগণ?/ ২০৮
- ফিকহে হানাফীর সনদ ও পর্যালোচনা/ ২০৮

হানাফী মাযহাবের ধারাবাহিক সনদ ও ইমাম আবু হানীফা রহ.
এর ফিকহ-ফতোয়া গ্রহণ

- আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত ফিকহ-ফতোয়ার ধারাবাহিক সনদ আছে কি?/ ২১১

প্রসঙ্গ “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব”

- إذا صح الحديث فهو مذهبي প্রসঙ্গ “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব”/ ২১৩

চতুর্থ শতাব্দীতে মাযহাব সূচনার দাবী ও তার খণ্ডন

- “চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে কোন মাযহাব মানার প্রচলন ছিল না”। এমন বক্তব্যের জবাব/ ২১৯
- চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে নির্দিষ্ট মাযহাব মানার প্রচলন থাকার ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থাকলে তা উল্লেখ করুন?/ ২২১
- চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী মহান উলামাগণ, যারা নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন- এমন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করুন?/ ২২২
- বর্তমান প্রচলিত চার মাযহাব বিদআত হবে না কেন?/ ২২২

মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে কি?

- মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে কি?/ ২২৬
- কোন্ অবস্থায় মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে, আর কোন্ অবস্থায় পরিবর্তন করা যাবে না?/ ২২৬

ভিন্ন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান

- এক মাযহাবের অনুসারী মুফতি সাহেবের জন্য অন্য মাযহাবানুসারে ফতোয়া প্রদান করা কি বৈধ হবে?/ ২২৯
- অন্য মাযহাব অনুযায়ী আমল করা কিংবা ফতোয়া প্রদান কখন বৈধ?/ ২২৯
- عموم بلوی বা ব্যাপক প্রয়োজনের সম্মুখীন হওয়া বলতে কি বুঝায়? এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমের জন্য কি করণীয়?/ ২৩০
- عموم بلوی বা ব্যাপক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে অন্য মাযহাবমতে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কী কী শর্ত লক্ষণীয়? ২৩১
- একজন মুফতি সাহেবের কী পরিমাণ ইলমী যোগ্যতা প্রয়োজন অন্য মাযহাবের দলীলকে প্রণিধানযোগ্য বলে ফতোয়া প্রদানের জন্য?/ ২৩১

তালফীক পরিচিতি ও তার শরয়ী বিধান

- (تلفيق) তালফীক কাকে বলে, বিস্তারিত বিবরণ দাও?/ ২৩২
- তালফীক এর হুকুম কি?/ ২৩৩
- ভিন্ন মাযহাবলম্বী ইমামের পিছনে নামায আদায় করার হুকুম কি?/ ২৩৩

মাযহাব চারটি কেন?

- মাযহাব চারটি কেন? অর্থাৎ মাযহাব তো অনেক ছিল, শুধু চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হল কেন?/ ২৩৬

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

- তাকলীদ-মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা এবং না মানার পরিণতি কী?/ ২৪০
- নির্দিষ্ট মাযহাব না মানলে ক্ষতি কী?/ ২৪১
- ইমামগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁদের তাকলীদ করা/ ২৪৪

কুরআনে কারীমে কিয়াস করতে নিষেধ করা হয়েছে এরপরও কিয়াস শরীয়তের দলিল হয় কীভাবে?

- পবিত্র কুরআনে অনুমান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে কিয়াস শরীয়তের দলিল হয় কীভাবে?/ ২৪৮
- কিয়াসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করুন।/ ২৪৯
- সর্বপ্রথম কে কিয়াস অস্বীকার করেন? এবং পরে তার সাথে আর কে কে যুক্ত হন?/ ২৫০
- তাকলীদ কি কুরআন বিরোধী?/ ২৫১

কুরআন-হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা কী?

- ফিকহের পরিচয় কী?/ ২৫৪
- এরপরও কেউ যদি বলে, কুরআন-সুন্নাহ থাকতে ফিকহ কেন?/ ২৫৬
- কুরআন, হাদীস, সাহাবা, তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যের আলোকে ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলুন?/ ২৫৭
- কোনো ব্যক্তি সরাসরি হাদীসের উপর আমল করে ও হাদীস থেকে সরাসরি মানুষদের ফতোয়া দেওয়া শুরু করে, তাকে কি গোমরাহ বলা যাবে?/ ২৬২
- লা-মাযহাবীদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তার অপনোদন/ ২৬৩
- ফিকহশূন্য মুহাদ্দিসের পরিণতি/ ২৬৩

পারস্পরিক বিভেদে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ও মাযহাবসমূহের মতভেদ

- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا বিভিন্ন মাযহাব মানার দ্বারা কি কুরআনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য হয়?/ ২৬৫

- আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক, হাদীস এক, মাযহাব চারটি কেন?/
২৬৮
- ইজতিহাদী মতপার্থক্যের হুকুম কি? এবং এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?/
২৬৯
- পরস্পরের মতভেদ ভুলে সকলে একমত ও পথের অনুসারী হওয়া কি
একান্ত কাম্য নয়?/ ২৭১

ইমামগণের তাকলীদ পোপ-পাদ্রিদের তাকলীদের মতো হওয়ার কারণে শিরক

- اَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ উক্ত আয়াতে ধর্মগুরুদের
তাকলীদকে শিরকতুল্য বলা হয়েছে। তাহলে ইমামের তাকলীদ কি
শিরকতুল্য নয়?/ ২৭৪
- খৃস্টানদের পোপ অনুসরণ এবং মুকাল্লিদগণের ইমাম অনুসরণের মাঝে
পার্থক্যগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন?/ ২৭৭
- মুকাল্লিদরা কখন এবং কী কারণে ইমামগণের অনুসরণ করে থাকেন?/
২৭৮
- কথায় কথায় যারা মুসলিমদেরকে কাফের-মুশরিক বলে তাদের হুকুম কি?/
২৭৯

ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রতি স্বল্প হাদীস বর্ণনার অপবাদ

- কোন কোন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সম্পর্কে স্বল্প হাদীস জানার যে
অভিযোগ করেছেন তা কি সঠিক? আর এ অভিযোগের কারণ কী?/ ২৮২
- ইমাম আবু হানীফা রহ. কি ইলমে হাদীসে দক্ষ ছিলেন? থাকলে
তার প্রমাণ কী?/ ২৮৬

হানাফী মাযহাবের মাসায়েল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়

- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বর্ণিত মাসআলা ও হানাফী মাযহাবের সমাধান
কি হাদীস পরিপন্থি? কারা এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে?/ ২৯৮
- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিষয়ে ইবনে আবী শায়বার বক্তব্য কী? তা
সঠিক না অমূলক?/ ২৯৯
- কে কে ইবনে আবী শাইবার অসার বক্তব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব
দিয়েছেন?/ ৩০১
- ইমাম চতুষ্ঠয় ও অন্য মুজতাহিদগণ হাদীসের বিরোধীতা করেননি; বরং
হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন, এই মর্মে সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী
ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য কি?/ ৩০৪

- হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ দলীল কি (যয়ীফ) দুর্বল?/ ৩০৭
- ইলমে হাদীস ও কূফা নগরী ইমাম বুখারী ও মাযহাবে হানাফী/ ৩১১
- হানাফীরা মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ ও তার জবাব
- হানাফীরা কি মুরজিয়া?/ ৩১৬
- হানাফীরা মুরজিয়া না হলে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে মুরজিয়া কেন বললেন?/ ৩১৬

আহলে হাদীস: ইতিহাস, ক্রমবিকাশ, পরিচিতি ও পর্যালোচনা

- ইসলামী দৃষ্টিকোণে উপমহাদেশের অবস্থান কি?/ ৩৩৪
- উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন কবে এবং হানাফীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কী?/ ৩৩৭
- বর্তমান আহলে হাদীস ভাইদের শ্লোগান সদৃশ শ্লোগান কি পূর্ব যুগে ছিল?/ ৩৪০
- ভারত উপমহাদেশে কখন 'আহলে হাদীস আন্দোলন' শুরু হয়?/ ৩৪১
- বর্তমান আহলে হাদীসরা কি হাদীসে বর্ণিত সেই 'আহলুল হাদীস' বা 'আসহাবুল হাদীস'?/ ৩৪৫
- লা-মাযহাবী কি একটা নবজন্মা ফিরকা নয়?/ ৩৪৭
- বর্তমান আহলে হাদীসদের আর কোন নাম ছিল?/ ৩৪৯
- লা মাযহাবী ভাইদের নীতিমালা কী কী?/ ৩৫০

ভূমিকা

ইজতিহাদ-তাকলীদ
জটিলতা ও সতর্কতা

সাদ্দীদ আহমদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইজতিহাদ-তাকলীদ: জটিলতা ও সতর্কতা

আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র মনোনিত ধর্ম ইসলাম। এ ধর্মের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান কুরআন-সুন্নাহর বিদ্যমান। এটাই প্রত্যেক মুসলমানের মন ও মুখের সম্মতি এবং কলব ও কলমের স্বীকৃতি। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলেই গোমরাহী ও বিচ্যুতি। তাই প্রতিটি মুসলিমের আচরণ ও উচ্চারণে থাকতে হবে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকামের অনুসরণ ও অনুকরণ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে হতে হবে এর প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন।

কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকাম তিন প্রকার।

এক. {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} তথা আকীদা সংক্রান্ত।
 দুই. {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} তথা আখলাক সম্পর্কিত।
 তিন. {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} তথা আমলের সাথে সম্পৃক্ত।

আকীদার বিষয়গুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

- ক. আকীদার প্রথম ও প্রধানতম স্তর হল এমন কিছু আকীদা-বিশ্বাস, যা পোষণ করলে একজন ব্যক্তি ইসলামের দৌলতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়; এর বিপরীত হলে হতভাগা অমুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। এ সমস্ত আকীদাকে পরিভাষায় বলা হয়, أصول أهل القبلة বা أصول الإيمان।

• খ. আর কিছু আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের, যা থাকা- না থাকার উপর মুসলমান হওয়া- না হওয়া নির্ভর করে না। বরং একজন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর সে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র অন্তর্ভুক্ত হওয়া- না হওয়া নির্ভর করে। এ জাতীয় আকীদাকে পরিভাষায় *أهل السنة* বলা হয়।

আকীদার প্রথম স্তরের দিকে লক্ষ্য করে আমাদের নাম মুসলিম ও মুমিন।^৬ এবং এর বিপরীত বিশ্বাসীদের সাধারণ নাম ‘কাফের-মুশরিক’, বিশেষ নাম ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শীয়া, কাদিয়ানী (বা আহমদী) ইত্যাদী।

আর আকীদার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে আমাদের নাম ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’।^৭ এবং বিপরীত বিশ্বাসীদের সাধারণ নাম ‘আহলুল বিদআ ওয়াল ফুরকাহ’, বিশেষ নাম বেরেলভী বা রেজভী, মওদুদী ও (নামধারী) সালাফী আহলে হাদীস ইত্যাদি।^৮

দ্বিতীয় প্রকার তথা আখলাক সংক্রান্ত বিষয়াদিকে কুরআনের ভাষায় ‘তায়কিয়াহ’ ও হাদীসের ভাষায় ‘ইহসান’ বলা হয়েছে, প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ‘তাসাওউফ’ নামে। এ দ্বিতীয় প্রকার হাসিলের বিভিন্ন তরীকার দিকে লক্ষ্য করে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশ্বন্দিয়া-মুজাদ্দিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া নামগুলো উচ্চারণ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

^৬ আকীদার প্রথম স্তরের বিষয়টি বেশ জটিল ও কঠিন। কেননা একজন মুসলমানকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফের বলার উপর যেমন কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি একজন কাফেরকে সুস্পষ্ট কারণ থাকার পরও মুসলমান মনে করলে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। তবে প্রথমটার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে-

فصل الفرق بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي، الإعلام بقواطع الإسلام للفقهاء ابن حجر الهيتمي المكي، إكفار الملحدين في ضروريات الدين للإمام أنور شاه الكشميري، وصول الأفكار في أصول الإكفار للمفتي شفيع، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى أجمعين.

^৭ অবশ্য কখনো আকীদার উভয় স্তরের দিকে লক্ষ্য করেও ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ বলা হয়।

^৮ আর কিছু আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে তৃতীয় স্তরের, যার মধ্যে কোন্ পক্ষ সঠিক আর কোন্ পক্ষ বেঠিক, তা একেবারে নির্ধারিত করে বলা যায় না। তাই এগুলোর ক্ষেত্রে কোন পক্ষের উপরই ভ্রান্তির অপবাদ দেওয়া যাবে না। বরং এগুলো ইজতিহাদী বিষয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না? এ সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন, ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ ১২/২৬৩, ২০/২২ ও ২৪/৯৫।

তৃতীয় প্রকার তথা আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর কিছু ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহয় একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে কিংবা মতভিন্নতার সুযোগ রয়েছে। আর এ দিকটা লক্ষ্য করে কারো নাম হানাফী, কেউ মালেকী, কেউ বা শাফেয়ী, আবার কারো নাম হাম্বলী। উক্ত চার মাযহাবের লোকেরা হকপন্থী। এদের বিপরীত একটি দলের নাম হচ্ছে, লা-মাযহাবী, গায়রে মুকাল্লিদ বা (নামধারী) আহলে হাদীস (যারা তাকলীদ-মাযহাব বিদ্বেষ্টী ও ইমামগণের সমালোচনাকারী)।^৯

আমাদের মূল আলোচনা এ তৃতীয় প্রকারকেই কেন্দ্র করে। কারণ তাকলীদ-মাযহাব ও ইজতিহাদ মূলত হয়ে থাকে এ তৃতীয় প্রকারেই, যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

উপরোক্ত আলোচনায় ‘মুসলিম, আহলুস সুন্নাহ, চিশতিয়া ও হানাফী’ হওয়ার নামকরণ জানতে পেরেছি। একজন ব্যক্তি যেভাবে মুসলিম হওয়ার পর বিশেষ গুণের কারণে মুসল্লী, মুক্তাদী ও কারী ইত্যাদি হতে পারে, তদ্রূপ বিশেষ গুণের কারণে চিশতী ও হানাফী প্রভৃতিও হতে পারে।

উল্লেখ্য, আলোচিত তিন প্রকারের প্রথমটাকে ইলমী পরিভাষায় ‘আল-ফিকহুল আকবার’, দ্বিতীয়টাকে ‘আল-ফিকহুল আওসাত’ এবং তৃতীয়টাকে ‘আল-ফিকহুল আসগার’ বলা হয়। সালাফ ও পূর্ববর্তীদের যামানায় ‘আল-ফিকহ’ বা ‘ফিকহ’ শব্দটি আলোচিত তিনো প্রকারের সাথে ব্যবহার হলেও পরবর্তীকালে তা শুধু তৃতীয় প্রকারের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং এর উপরই ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অর্থাৎ ‘ফিকহ’ শব্দটি উচ্চারিত হলেই তৃতীয় প্রকার তথা আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোই সবার কাছে বুঝে আসে। এজন্য তৃতীয় প্রকারকে (فقهية) ফিকহিয়্যাহও বলা হয়।

তবে কুরআন-হাদীসে ফিকহের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে,^{১০} তা তিনো প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই বর্ণনাগুলোকে শুধু

^৯ লা-মাযহাবী ও গায়রে মুকাল্লিদদের মধ্যে আবার কিছু উগ্রপন্থী রয়েছে। তাদের সাথে মতভেদ শুধু তৃতীয় প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রথম প্রকার তথা আকীদা সংক্রান্ত বিষয়েও ইখতিলাফ রয়েছে। অর্থাৎ তারা এমন কিছু আকীদা পোষণ করে, যা ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ এর খেলাফ।

^{১০} যেমন সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াত ... فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...

“কেন এমন হয় না যে, মুসলিমদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ বের হবে, যাতে তারা ধর্মের ফিকহ অর্জনের চেষ্টা করে।” এভাবে হাদীসে যে ইরশাদ হয়েছে, مِّنْ يُرِذُّ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

“আল্লাহ তাআলা ঐরা কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের প্রজ্ঞা ও ফিকহ দান করেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় প্রকারের সাথে সীমাবদ্ধ করা (যা কেউ কেউ করে থাকেন) ভুল কাজ এবং এক প্রকার তাহরীফ।^{১১}

ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাবের ক্ষেত্র ও পরিধি:

বর্তমান সময়ে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব শব্দত্রয় বহুল আলোচিত ও প্রচলিত। কিন্তু শব্দত্রয় শরীয়তে প্রয়োগের ক্ষেত্র ও পরিধি জানা না থাকার কারণে অনেকেই আজ পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে করছে বিভ্রান্ত। এগুলো প্রয়োগের শরীয়তে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও পরিসীমা রয়েছে; এর বাইরে না ইজতিহাদ বৈধ, না তাকলীদ-মাযহাব বৈধ। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল :-

ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব শরীয়তে প্রয়োগের কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো বুঝে আসলে, আশা করি শব্দত্রয় প্রয়োগের ক্ষেত্র ও পরিধিও পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং অনেক বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে, ইনশাআল্লাহ। শর্তগুলো হল-

- ক. ঈমান ও মৌলিক আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব চলবে না।
- খ. আখলাক ও আমল এর সাথে সম্পৃক্ত সর্বজনবিদিত ও বোধগম্য বিধানসমূহে শব্দত্রয়ের প্রয়োগ হতে পারবে না।
- গ. শব্দত্রয় প্রয়োগের ক্ষেত্র বা মাসআলাটি منصوصة متعارضة তথা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী-এমন হতে হবে।
- ঘ. অথবা মাসআলাটি منصوصة محتملة তথা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু একাধিক অর্থ বা মর্মের সম্ভাবনা রাখে- এর মধ্য থেকে হওয়া।
- ঙ. কিংবা মাসআলাটি غير منصوصة অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট/পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই- এমন হওয়া।

^{১১} এভাবে ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিকহের যেই সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা معرفة النفس ما لها وما عليها. ফিকহের যেই সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن التأسيس. এভাবে করা হয়, তা শুধু তৃতীয় প্রকারকে লক্ষ্য করেই। এ সকল পার্থক্য আমাদের ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

প্রথম শর্ত: “শব্দত্রয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঈমান ও মৌলিক আকীদা সংক্রান্ত বিষয় হতে পারবে না।” কেননা আল্লাহ এক, আশ্বিয়ায়ে কেলাম তাঁর প্রেরিত এবং আখেরাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা বৈধ নয় এবং তাকলীদ-মাযহাবও জায়েয নয়।

আরেকটু বিস্তারিত করে বললে এভাবে বলা যায়, আমরা যে শুরুতে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকাম তিন প্রকার জেনেছি- এর প্রথম প্রকার হল আকীদা সংক্রান্ত। এর আবার দু’টি স্তর উল্লেখ হয়েছে। তো আকীদার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের (অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয় বাদ দিলে অন্য) বিষয়গুলোতে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব কোনটাই বৈধ নয়। এটাই জুমহুর ও অধিকাংশ ইমামের অভিমত।^{১২}

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম খতীব বাগদাদী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,
والأحكام على ضربين: عقلي وشرعي. فأما العقلي: فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة

الصانع تعالى وصفاته، ومعرفة الرسول ﷺ وصدقه، وغير ذلك من الأحكام العقلية.

সারাংশ, “আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে তাকলীদ বৈধ নয়।”^{১৩}

আল্লামা আমীর বাদশা হানাতী রহ. (মৃ. ৯৭২ হি.) ইবনুল হুমাম রহ. এর ‘আত-তাহরীর’ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘তাইসীরুত তাহরীর’ এ লিখেন,
(فما يحل الاستفتاء فيه) الأحكام (الظنية، لا العقلية) المتعلقة بالاعتقاد؛ فإن

المطلوب فيها العلم (على) المذهب (الصحيح)، فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح، وهو قول الأكثرين، واختاره الرازي والآمدي وابن

الحاجب، بل حكاها الإسفرايني عن إجماع أهل العلم من الحق وغيرهم من الطوائف.

সারমর্ম, “আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে তাকলীদ বৈধ নয়। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। বরং ইমাম ইসফারায়িনী রহ. এ বিষয়ে আহলে ইলমের ইজমা’ নকল করেছেন।”^{১৪}

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাতী রহ. (মৃত ১২৫৮ হি.) ‘ফাতাওয়া শামী’র মুকাদ্দামাতে লিখেন,

^{১২} তবে জুমহুর এ কথাও বলেছেন যে, মুকাদ্দিমদের ঈমান গ্রহণযোগ্য, যদিও এতে তাকলীদ করার কারণে সে গুনাহগার হবে। এ সম্পর্কে কিছু হাওয়ালা তো সামনে আসছে। আরো সবিস্তারে জানতে চাইলে দেখুন, ‘আল-ইতিমাদ ফী তাওদীহিল ইকতিসাদ’ গ্রন্থের ৬ নং মতলবে ১ নং প্রশ্নের উত্তর।

^{১৩} আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাঈহ ২/১২৮; আল-জুমা’ ফী উসূলিল ফিকহ, শীরাযী কৃত পৃ. ১২৫।

^{১৪} তাইসীরুত তাহরীর ৪/২৪৩; আরো দেখুন, ফাওয়াতিহুর রহমূত ২/৪৩৩।

ما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لأحد، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة.

“আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর আকীদাসমূহ কারো তাকলীদ ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব।”^{১৫}

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী শাফেয়ী রহ. (মৃত ৪৭৮ হি.) বলেন,
لم يقل بالتقليد في الأصول - العقائد - إلا الحنابلة... وقال القرافي:
وسألت الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد.

“আকীদার ক্ষেত্রে তাকলীদের কথা হাম্বলীরা ব্যতীত আর কেউ বলেনি।... তবে ইমাম কারাফী মালেকী রহ. বলেন, আমি হাম্বলীদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেছেন, আমাদের প্রসিদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, (আকীদার ক্ষেত্রে) তাকলীদ নিষিদ্ধ।”^{১৬}

আর এদিকে লক্ষ্য করেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

« لَا يُقْلَدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ »

“কেউ আকীদার ক্ষেত্রে অন্যের তাকলীদ করবে না। যেমন প্রথমজন ঈমান এনেছে বলে দ্বিতীয়জন ঈমান আনবে, অথবা একজন কুফরী করল দেখে অন্যজন কুফরী করবে।”^{১৭}

বলাবাহুল্য, যেহেতু ঈমান ও মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে কারো ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব কোনটাই বৈধ নয়, তাই আকীদার ক্ষেত্রে

^{১৫} ফাতাওয়া শামীর মুকাদ্দামা : ১/১৪০।

^{১৬} দেখুন, আল-বাহরুল মুহীত, যারকাশী ৬/২৭৮; আরো দেখুন, আল-ইহকাম লিল-আমেদী ৪/২৭১-৭৩; শরহ মুখতাছারির রওয়া ৩/৬৬২; শরহ তানকীহিল ফুসূল : পৃ. ৪৩০ ও ৪৪৪।

^{১৭} আল-মু'জামুল কাবীর, তাবরানী হা. ৮৭৬৪, হাইছামী রহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৮০)

উল্লেখ্য, এখানে দীন শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, আকীদা। কেননা দীন শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল আকীদা। যেমন সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতে দীন শব্দটি আকীদা অর্থে এস্টেমালা হয়েছে। এখানেও পরবর্তী বাক্য থেকে উক্ত অর্থ হওয়াটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। খতীব বাগদাদী রহ.ও উক্ত বাক্যের মধ্যে দীন শব্দটি আকীদা অর্থে ব্যবহার করেছেন। দেখুন, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফক্কিহ ২/১৩১-৩২। কিন্তু লা-মাযহাবী ভাইয়েরা বাক্যটিকে ‘দ্বীনের কোন ক্ষেত্রেই তাকলীদ বৈধ নয়’ এই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ এটি পরবর্তী বাক্য ও সালাফের বুঝের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনটি আপনারা দেখেছেন। বরং খোদ বর্ণনাটিরই শেষাংশে যে বাক্যটি রয়েছে,

وَأِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُفْتَدِينَ فَافْتَدُوا بِالْمَيِّتِ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ.

“কেউ যদি কারো অনুসরণ করতে চায়, তাহলে বিগতদের তরীকাই তার অনুসরণ করা উচিত।..” এর সাথেও সাংঘর্ষিক। আল্লাহ পাক সহীহ বুঝ দান করুন।

চার মাযহাব এক ও অভিন্ন। যেমন ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী শাফেয়ী রহ. (মৃত ৭৭১ হি.) ‘মু’য়ীদুন নি’আম’ কিতাবে বলেন,

وهذه المذاهب الأربعة - والله الحمد - في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول.

“আল্লাহর শৌকর! চার মাযহাবের আকীদা এক। তবে যারা মু’তায়িলা বা অন্য কোন ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী হয়েছে- এরা ছাড়া (চার মাযহাবের) অধিকাংশ অনুসারী হকপন্থী এবং তাহাবী রহ. এর (রচিত ‘আকীদাতুত তাহাবী’ গ্রন্থে বর্ণিত) আকীদা পোষণকারী। আর উক্ত আকীদা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।”^{১৮}

মশহুর ইতিহাসবিদ ও হাফেজুল হাদীস ইবনে আসাকির রহ. (মৃত ৫৭১ হি.) ‘তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী’ গ্রন্থে লিখেন,

ولسنا نرى الأئمة الأربعة الذين عنيتم في أصول الدين مُخْتَلِفِينَ، بل نراهم في القول بتوحيد الله وتزيهه في ذاته مؤتلفين، وعلى نفي التشبيه عن القديم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُجْتَمِعِينَ.

“আমরা চার ইমামের মাঝে মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য দেখতে পাই না। বরং এ বিষয়ে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ।”^{১৯}

শুধু চার ইমাম ও তাঁদের অধিকাংশ অনুসারী মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে একমত যে তা নয়, বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সকলেই এ বিষয়ে একমত। যেমন ইমাম আব্দুল কাহের বাগদাদী রহ. (মৃত ৪২৯ হি.) ‘আল-ফরকু বাইনাল ফিরাক’ কিতাবে বলেন,

فأما الفرقة الثالثة والسبعون: فهي أهل السنة والجماعة، من فريقَي الرأي والحديث دون من يشتري هو الحديث،... كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته وفي أسمائه وصفاته وفي أبواب النبوة والإمامة وفي أحكام العقبي، وفي سائر أصول الدين، وإنما يختلفون في الحلال

^{১৮} মু’য়ীদুন নি’আম ওয়া মুবীদুন নিকাম, সুবকী পৃ. ২২-২৩।

^{১৯} তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৩৬২, দারুল কিতাবিল আরবী- বৈরুত।

والحرام من فروع الأحكام، وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق،
وهم الفرقة الناجية. ... وقد دخل في هذه الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم
من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر.

“প্রকৃত মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মধ্যে যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, তাঁরা সবাই... মৌলিক আকীদার বিষয়ে একমত। তাঁদের মতভেদের ক্ষেত্র হচ্ছে আমল সংক্রান্ত বিষয়। আবার তাদের ইখতিলাফকৃত বিষয়ে কোন পক্ষই গোমরাহ বা ফাসেক নয়। তাঁরা সবাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আর এতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা, আওয়ামী, (সুফিয়ান) ছাওরী ও আহলে যাহেরের অনুসারীদের মধ্যে থেকে বড় একটি অংশ এবং অধিকাংশ উম্মত অন্তর্ভুক্ত।”^{২০}

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সবাই যদি আকীদার বিষয়ে একমত থাকেন, তাহলে ‘আশাঈরা’ ও ‘মাতুরীদিয়া’ নামে তাঁদের মাঝে বিভক্তি কেন? এবং আকীদার ক্ষেত্রে যদি তাকলীদ অবৈধ হয়, তাহলে উক্ত দুই দলের প্রধান ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. (মৃ. ৩২৪ হি.) ও ইমাম আবুল মনছুর মাতুরীদি রহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) এর অনুসরণ করা হয় কেন?

উত্তর :- প্রথমত: তাঁদের মাঝে বিভক্তি নেই, তবে মৌলিক আকীদা ছাড়া কিছু শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। আর তা গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়েছে।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন,

اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد، فيما يجب

ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمباني الموصلة لذلك،...

“জেনে রাখুন! আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সবাই একমত..। যদিও গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণে তাঁরা মতভেদ করেছেন।”^{২১}

ইমাম কামালুদ্দীন বায়াদী হানাফী রহ. (মৃত ১০৯৭ হি.) ‘ইশারাতুল মারাম’ গ্রন্থে লিখেন,

إنهم متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد، وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينها...

^{২০} আল-ফরকু বাইনাং ফিরাক পৃ. ২৩, দারুত তাওফীকিয়া লিত-তুরাছ।

^{২১} ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মুরতাযা যাবীদী ২/৬, মুআসসাআতুত তারীখিল আরবী-বৈরুত।

“মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে তাঁরা এক ও অভিন্ন। যদিও তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে।”^{২২}

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم متوافقون؛ إلا في

مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي، كما بين في محله.

“আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারী ‘আশাঈরা’ ও ‘মাতুরীদিয়া’ এর আকীদা এক ও অভিন্ন। তবে কয়েকটি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে কারো কারো অভিমত হল, উক্ত মতভেদ শাব্দিক অর্থে তথা উপস্থাপনের ভিন্নতা (বাস্তবিক অর্থে নয়)।”^{২৩}

দ্বিতীয়ত: আকীদার ক্ষেত্রে যদি তাকলীদ অবৈধ হয়, তাহলে ইমাম আশআরী রহ. ও ইমাম মাতুরীদি রহ. এর অনুসরণ করা হয় কেন?

এর উত্তর হল, ইমাম বায়হাকী রহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.), ইবনে আসাকির রহ. (মৃ. ৫৭১ হি.), সুবকী রহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) ও মুরতাযা যাবীদী রহ. (মৃ. ১২০৫ হি.) সহ অনেকে বলেছেন, ইমামদ্বয় দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কোন মাযহাব বা পথ ও মত সৃষ্টি করেননি। বরং ভ্রান্ত আকীদার অনুসারীদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা সমূহকে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেলাম ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন।

আর এ কাজ করতে গিয়ে মানুষের স্বভাবজাত রুচির পার্থক্য ও বুঝের তারতম্য থাকার কারণে অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাই প্রত্যেকে নির্দিষ্ট একটি তরীকা ও পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। এখন যারা আশআরী রহ. এর তরীকা অবলম্বন করেন, তাদেরকে ‘আশাঈরা’, আর যারা মাতুরীদি রহ. এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাদেরকে ‘মাতুরীদিয়া’ বলা হয়।^{২৪}

উত্তরদ্বয়কে সহজে বুঝতে চাইলে বলতে পারেন, বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের মাঝে যেমন বিভক্তি নেই তবে পার্থক্য রয়েছে, তদ্রূপ আশাঈরা ও মাতুরীদিয়াহর আকীদার মাঝেও বিভক্তি নেই তবে পার্থক্য রয়েছে।

^{২২} ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম আবী হানীফা আন-নু’মান, পৃ. ৩৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

^{২৩} রাদ্দুল মুহতার- মুকাদ্দামা : ১/১৪০।

^{২৪} দেখুন, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/৭; তাবয়ীনু কাযিবিদ মুফতারী পৃ. ১০৩, ৩৬০-৬২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, সুবকী ৩/৩৬৫, ৩৯৭ ও আহলুস সুন্নাহ আল-আশাঈরা পৃ. ৩৪-৩৭।

অর্থাৎ রাসূলের হাদীস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট একটি তরীকা ও পদ্ধতিতে উপস্থাপনের কারণে যেভাবে বুখারীর হাদীস এবং মুসলিমের হাদীস বলা হয়, আকীদার ক্ষেত্রেও উক্ত দুই ইমামের দিকে নিসবত ও সম্বোধন করাটা অনেকটা এমনই।

প্রথম শর্তের আলোচনা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল, আশা করি এতে বিষয়টা ভালোভাবে পরিষ্কার হয়েছে। এবার দ্বিতীয় শর্ত নিয়ে কিছু আলোচনা :-

দ্বিতীয় শর্ত: “আখলাক ও আমল এর সাথে সম্পৃক্ত যে সকল বিধান সর্বজনবিদিত ও বোধগম্য- এতে শব্দত্রয়ের প্রয়োগ হতে পারবে না।”

কেননা এ জাতীয় বিধানের অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত। এগুলো সবাই বুঝতে সক্ষম। এখানে ভুল বুঝাবুঝি কিংবা মতভেদের কোন সুযোগ নেই। কাজেই এতে শব্দত্রয়ের প্রয়োগ নিরর্থক বৈ কিছু নয়।

এ সম্পর্কে উসূলুল ফিকহের অধিকাংশ কিতাবে ইজতিহাদ-তাকলীদ অধ্যায়ে এবং তাকলীদ সংক্রান্ত প্রায় গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত বা বিশদাকারে আলোচনা রয়েছে। এখানে কয়েক জনের আলোচনা উল্লেখ করছি।

খতীব বাগদাদী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) ‘আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ’ গ্রন্থে লিখেন,

وأما الأحكام الشرعية، فضربان: أحدهما: يُعلم ضرورة من دين الرسول ﷺ كالصلوات الخمس، والزكوات، وصوم شهر رمضان، والحج، وتحريم الزنا وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه؛ لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه.

وضرب آخر: لا يُعلم إلا بالنظر والاستدلال: كفروع العبادات، والمعاملات، والفروج، والمناكحات، وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد، بدليل قول الله تعالى: { فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }؛ ولأننا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش، وهلاك الحرث والماشية، فوجب أن يسقط.

“শরীয়তের আহকাম-বিধান দু'ধরনের।

এক. ‘জরুরিয়াতে দীন’ বা দীনের সর্বজনবিদিত বিধান। যেমন নামায, যাকাত, রমযানের রোযা ও হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়া এবং

ব্যভিচার ও মদপান ইত্যাদি হারাম হওয়া। এ জাতীয় বিধানের ক্ষেত্রে তাকলীদ করা জায়েয নেই। কেননা এগুলো সবাই বুঝতে সক্ষম। কাজেই এতে তাকলীদ নিরর্থক।

দুই. যা রীতিমত গবেষণা ছাড়া বোধগম্য নয়, যেমন ইবাদত, মুআমালাত ও বিয়ে-শাদীর খুঁটিনাটি মাসায়েল। এগুলোর ক্ষেত্রে গবেষণা প্রয়োজন বিধায় তাকলীদ বৈধ। কেননা ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমাদের জানা না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে নাও’। তাছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে তাকলীদ নিষিদ্ধ হলে সবাইকে বাধ্যতামূলক ইলম চর্চায় নিয়োজিত হতে হবে। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই অচল হয়ে যাবে এবং খেত-খামার ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই শেষ হয়ে যাবে। এমন পথ বর্জন করা অপরিহার্য।”^{২৫}

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল আযীম মাক্কী হানাফী ওরফে ইবনে মুল্লা ফারুখ রহ. (মৃ. ১০৬১ হি.) ‘আল-কাওলুস সাদীদ’ কিতাবের শুরুতে লিখেন,

اعلم! أنه لم يُكَلَّفِ الله تعالى أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به مُحَمَّدًا ﷺ وَالْعَمَل بِشَرِيْعَتِهِ، غير أن العمل بما مُتَوَقَّف على الوُقُوف عَلَيْهَا، وَالْوُقُوف عَلَيْهَا لَهُ طَرَق: فَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَشْتَرِك بِهِ الْعَوَام، وَأَهْل النَّظَر كَالْعَمَلِ بِفَرِيضَةِ الصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءِ إِجْمَالًا؛ وَكَالْعَمَلِ بِحُرْمَةِ اللُّوَاطَةِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا عِلْمُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، فَذَلِكَ لَا يَتَوَقَّف فِيهِ عَلَى اتِّبَاعِ مُجْتَهِدٍ وَمَذْهَبٍ مَعِينٍ، بَلْ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ اِعْتِقَادُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا مَا لَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِضَرْبٍ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، فَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ بِتَوْفَرِ آيَاتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فَعْلُهُ، كَالْأُئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مَنْ أَرْشَدَهُ إِلَى مَا كُفِّ بِهِ، مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْعَدَالَةِ، وَسَقَطَ عَنِ الْعَاجِزِ تَكْلِيفُهُ بِالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ؛ لِعَجْزِهِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:

[২৮৬], وَقَوْلُهُ تَعَالَى: { فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } وَهِيَ الْأَصْلُ فِي اعْتِمَادِ التَّقْلِيدِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الْكَمَالُ ابْنُ الْهَمَامِ فِي "التَّخْرِيرِ".

“আল্লাহ তাআলা কাউকে হানাফী বা মালেকী অথবা শাফেয়ী কিংবা হাম্বলী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেননি। বরং সবাইকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ে আসা সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর শরীয়তের উপর আমল করা ওয়াজিব করেছেন। কিন্তু আমল নির্ভর করে শরীয়ত জানার উপর। আর (শরীয়তের আহকাম বিভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে) তা জানার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি। তন্মধ্যে এক প্রকার হল, যা সাধারণ ও জ্ঞানী সহ সব শ্রেণীর লোক বুঝতে সক্ষম। যেমন নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয হওয়া এবং সমকামিতা ও হত্যা ইত্যাদি হারাম হওয়া। এ জাতীয় বিধানের উপর আমল কোন মুজতাহিদ বা নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করার উপর নির্ভর করে না। বরং প্রত্যেক মুসলমানই তা জানতে পারে।...

পক্ষান্তরে আরেক প্রকার হল, যা রীতিমত গবেষণা ছাড়া বোধগম্য নয়। এগুলো যারা শর্তসাপেক্ষে বুঝতে সক্ষম, যেমন পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ, তাদের জন্য তা গবেষণা করে বুঝে আমল করা ওয়াজিব।

আর যারা বুঝতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণ করা ওয়াজিব। যেহেতু আল্লাহ পাক কারো উপর তার সাধ্যতীত কিছু চাপিয়ে দেন নাই, তাই অক্ষম ব্যক্তির জন্য গবেষণা করাও ওয়াজিব নয়। আর এদেরকে লক্ষ্য করেই ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমাদের জানা না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে নাও’। এটাই তাকলীদ বিষয়ে মূল কথা, যেমনটি মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. ‘আত-তাহরীর’ কিতাবে ইঙ্গিত করেছেন।”^{২৬}

হানাফী মাযহাবের মশহুর আলেম আবদুল গণী নাবলুসী রহ. (মৃ. ১১৪৪ হি.) বলেন,

فالأمر المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى التقليد فيه لأحد الأربعة، كفرضية الصلاة، وحرمة القتل، والسرقه. والأمر المختلف فيه، هو الذي يحتاج إلى التقليد فيه.

^{২৬} আল-কাওলুস সাদীদ ফী বা’যি মাসায়িলিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ পৃ. ৩২, দারুদ দাওয়া- কুয়েত।

“সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত আহকামের ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয়ের কোন একজনের তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। যেমন নামায ফরয হওয়া এবং হত্যা ও চুরি-ডাকাতি হারাম হওয়া। তবে ইমামদের মতভেদপূর্ণ মাসায়েলের ক্ষেত্রেই শুধু তাকলীদে প্রয়োজন হয়।”^{২৭}

হাম্বলী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ‘আল-মুসাওওদাহ’তে রয়েছে,

قال ابن عقيل: ولم يختلفوا في أنه ليس له أن يقلد في أصول الشريعة،

كوجوب الصلوات وأعداد الركعات.

قال شيخنا: قال أحمد: لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولا يثبت إلا بدليل

قطعي، ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني، ولا اجتهاد في القطعي.

“ইবনে আকীল রহ. বলেন, শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে যে তাকলীদ বৈধ নয়, এতে তাঁরা ইখতিলাফ করেননি। যেমন নামায ওয়াজিব হওয়া এবং নামাযের রাকাত সংখ্যা ইত্যাদি।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম আহমদ রহ.-এর এ বক্তব্য নকল করেন যে, (অর্থ ও মর্ম) সুনির্ধারিত এবং অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে তাকলীদ জায়েয নয়। বরং সম্ভবাপূর্ণ (অর্থ ও মর্ম) এবং অকাট্যহীন দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে তাকলীদ জায়েয।”^{২৮}

প্রিয় পাঠক! ইমামগণের বক্তব্য থেকে সম্মিলিতভাবে এটা নিশ্চয় প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীয়তের আহকাম-বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীস দুই ধরনের।

এক. কুরআন-সুন্নাহর কিছু বিধান সহজ, বোধগম্য ও সর্বজনবিদিত, যে কেউ চেষ্টা করলে তা বুঝতে সক্ষম। আর এগুলোই দ্বিতীয় শর্তের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ “আখলাক ও আমল এর সাথে সম্পৃক্ত যে সকল বিধান সর্বজনবিদিত ও বোধগম্য- এতে শব্দত্রয়ের প্রয়োগ হতে পারবে না।” কেননা এ জাতীয় বিধানে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাবের কোন প্রয়োজন নেই এবং সুযোগও নেই। কারণ এগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত। এগুলোই দ্বীনের মূল ভিত্তি হিসেবে গৃহীত এবং এগুলোর উপর সবাই সম্মত। সুতরাং এতে শব্দত্রয়ের প্রয়োগ অবৈধ।

^{২৭} খুলাসাতুত তাহকীক ফী হুকুমিত তাকলীদ ওয়াত তালাফীক পৃ. ৪।

^{২৮} আল-মুসাওওদাহ ফী উসূলিল ফিকহ, পৃ. ৪৫৮, মাতবা’আতুল মাদানী, কায়রো।

দুই. কিছু আয়াত ও হাদীসের বিধান এমন আছে, যেগুলোতে ইজতিহাদ বা রীতিমত গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।

এখন আমাদের জানা দরকার, এমন আয়াত ও হাদীসের বিধানের পরিচয় কী? বা এগুলো কত ধরনের হয়ে থাকে?

এ বিষয়ে সারকথা হল, এমন আয়াত ও হাদীসের বিধান তিন ধরনের হয়ে থাকে। আর তা হল, ঐ শেষ তিন শর্ত, যা শব্দত্রয় প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে (গ, ঘ, ঙ নাম্বারিং করে) উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ

• মাসআলাটি منصوعة متعارضة তথা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী। যথা নামাযে আমীন আস্তে বলার পক্ষে যেমন সহীহ দলিল রয়েছে; তেমনি রয়েছে জোরে বলার পক্ষেও।^{২৯}

• অথবা মাসআলাটি منصوعة محتملة তথা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু একাধিক অর্থ বা মর্মের সম্ভাবনা রাখে। যেমন পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট আইয়ামে (দিনসমূহে) কুরবানীর পশু যবেহ করতে বলা হয়েছে।^{৩০}

এখন ‘আইয়াম’ শব্দটির অর্থ অভিধানে রাত ছাড়া শুধু দিন অর্থও রয়েছে, আবার রাতসহ দিন অর্থও এসেছে। যদি প্রথম অর্থ হয়, তাহলে রাতে পশু যবেহ করা বৈধ হবে না; দ্বিতীয় অর্থে হলে বৈধ হবে। কিন্তু আয়াতে কোন্ অর্থ উদ্দেশ্য, তা সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত নয়।

• কিংবা মাসআলাটি غير منصوعة অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট/পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই। যেমন পানির মধ্যে মশা পড়লে পানি নাপাক হবে কি না? ইনজেকশন দিলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না? ইত্যাদি।

সারকথা, “ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব”-এ শব্দত্রয়ের প্রয়োগ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল, আখলাক ও আমল এর সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাসমূহ থেকে উপরোক্ত তিন প্রকারের কোন একটির ক্ষেত্রে হতে হবে।

এছাড়া সুনির্ধারিত ও সর্বজনবিদিত বিধানে শব্দত্রয়ের প্রয়োগ অবৈধ।

উক্ত কথাটিকে সুস্পষ্ট করে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) তাঁর ইজতিহাদ-তাকলীদ সম্পর্কে অদ্বিতীয় উপকারী কিতাব ‘আল-ইকতিসাদ’-এ বলেন,

^{২৯} এর জন্য ‘নামাযে আমীন বলার ফযীলত, হুকুম ও পদ্ধতি’ নামক ছোট পুস্তিকাটি দেখতে পারেন।

^{৩০} সূরা হজ্জ : ২৮।

منصوص مسائل تین قسم کے ہیں: اول وہ جن میں نصوص متعارض ہیں۔ دوم وہ جن میں نصوص متعارض نہیں مگر وجوہ معانی متعددہ کو محتمل ہوں... سوم وہ جن میں تعارض بھی نہ ہوں اور ان میں ایک ہی معنی ہو سکتے ہوں۔ پس قسم اول میں رفع تعارض کے لیے مجتہد کو اجتہاد کی اور غیر مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہوگی۔ قسم ثانی ظنی الدلالة کہلاتی ہے اس میں تعین احد الاحتمالات کے لئے اجتہاد و تقلید کو حاجت ہوگی۔ قسم ثالث قطعی الدلالة کہلاتی ہے اس میں ہم بھی نہ اجتہاد کو جائز کہتے ہیں نہ اس اجتہاد کی تقلید کو۔

“کُورآن و سُنْناہِی س্পষ্ট/পরিস্কারভাবে উল্লিখিত বিধান তিন প্রকার । প্রথমত: দৃশ্যত: পরস্পর বিরোধী বিধান । দ্বিতীয়ত: একাধিক অর্থ বা মর্মের সম্ভাবনা রাখে বা দ্ব্যর্থবোধক বিধান । তৃতীয়ত: সুনির্ধারিত ও সর্বজনবিদিত বিধান ।

প্রথম ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণের জন্য মুজতাহিদ ইمامগণের ইজতিহাদ বা গবেষণা প্রয়োজন । এবং সাধারণের কর্তব্য হল, তাঁদের তাকলীদ বা অনুসরণ । আর তৃতীয় ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়টিই আমরা নাজায়েয বলি ।”

অন্যস্থানে তিনি কُورآن-সُنْناہِی পরিস্কারভাবে উল্লেখ নেই- এমন বিধান সম্পর্কে বলেন, “এ ক্ষেত্রে ইমামের জন্য ইজতিহাদ (ও কিয়াস) করে এর হুকুম পরিস্কার করা ও সুস্পষ্ট করা বৈধ এবং সাধারণের জন্য তা অনুসরণ করাও বৈধ ।”^{৩১}

তাকলীদ বা মাযহাব মানার আরেকটি ক্ষেত্র হল, কُورآن-সُنْনাহর সব ধরনের বিধানে যেসব করণীয় রয়েছে, সেগুলোর স্তরসমূহ জেনে আমল করা । অর্থাৎ কোন্টি ফরয, কোন্টি ওয়াজিব ও সُنْনাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ জেনে আমলের গুরুত্ব প্রদান করা । কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ

^{৩১} আল-ইকতিসাদ ফীত তাকলীদ ওয়াল ইজতিহাদ, পৃ. ৬৭ ও ৬ ।

“তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামকে আবাদ করার কাজকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলীর) সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য হতে পারে না...।”^{৩২}

অনুরূপ যেসব বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে, সেগুলোর স্তরসমূহ জানা। যেমন হারাম, মাকরুহ ও অনুত্তম ইত্যাদি এবং তদানুযায়ী বিরত থাকার চেষ্টা করা। ইরশাদ হয়েছে,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَتُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

“তোমাদেরকে যেই বড় বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি নিজেই তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ মিটিয়ে দেব...।”^{৩৩}

উপরোক্ত স্তরসমূহ কুরআন-সুন্নাহর কিছু স্থানে সহজে বুঝা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। কেননা এ সমস্ত বিবরণ কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। কাজেই এতেও তাকলীদ-মাযহাব প্রয়োগ হবে।

এছাড়া যে সকল দলিল ও হাদীস পৌঁছার মাধ্যম বা গ্রহণযোগ্যতা বিচারে অকাট্যহীন কিংবা কিছুটা সন্দেহযুক্ত যেমন ‘খবরে ওয়াহিদ’, এগুলো সহীহ ও দলিলযোগ্য হওয়া- না হওয়াটা ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যেখানে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে, তাতে তাকলীদ-মাযহাবেরও অবকাশ থাকবে।

তাকলীদের মূল উদ্দেশ্য

অস্পষ্টতা ও জটিলতার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণ

প্রিয় পাঠক! উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে কোনো ইমামের স্বতন্ত্র আনুগত্য করা তাকলীদের উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহতে প্রাপ্ত উপরোল্লিখিত অস্পষ্টতা ও জটিলতার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মতে কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণই হল তাকলীদের আসল উদ্দেশ্য।

^{৩২} সূরা তাওবা ১৯।

^{৩৩} সূরা নিসা ৩১।

উক্ত বাস্তবতাটিকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

فطاعة الله ورسوله، وتحليل ما أحله الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الإنس والجن، واجب على كل أحد، في كل حال سرا وعلانية.

لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس: رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك؛ لأنه أعلم بما قال الرسول، وأعلم بمراده.

فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم: وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول، يبلغونهم ما قاله، ويفهمونهم مراده، بحسب اجتهادهم واستطاعتهم.

“জিন-ইনসানের প্রত্যেকের উপর গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যিক। এবং যেই জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল বলে ঘোষণা করেছেন তা হালাল জানবে আর যেগুলোকে হারাম বলেছেন তা হারাম জানবে। এভাবে যেই জিনিসকে ওয়াজিব বলেছেন তা ওয়াজিব হিসাবে গ্রহণ করবে।

তবে কিছু আহকাম এমন রয়েছে, যা (অস্পষ্টতা ও জটিলতার কারণে) অনেক লোক বুঝতে পারে না। এ সকল ক্ষেত্রে ওই সমস্ত লোক যারা জানে তাদের শরণাপন্ন হবেন। কেননা তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও তার সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

কাজেই মুসলমানদের অনুসরণীয় ইমামগণ হলেন, প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে (শরীয়তের বিধান জানা ও বুঝার) সেতু ও মাধ্যম। তাঁরা স্বীয় ইজতিহাদ ও সক্ষমতা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং তার মর্ম বুঝিয়ে দেন।”^{৩৪}

এজন্য আল্লামা ইবনে হায্ম যাহেরী রহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة، وإن خفي دليله على العوام،

ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلى الخطاء، وأنهم يشرعون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال من قائله عن الطريق.

“মুজতাহিদগণ যা কিছু ইজতিহাদ করে বের করেন, তা সবই শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। যদিও এর দলিল (সম্প্রস্ট না হওয়ার কারণে) সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্ট থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তারা ইমামদের প্রতি ভুল বিষয় সম্পৃক্ত করে। এবং এই অভিযোগ করে যে, ইমামগণ এমন বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা নেই। এ জাতীয় বক্তব্য বক্তার বিদ্যুতি ও ভ্রান্তির প্রমাণ।”^{৩৫}

তাকলীদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায্যিম রহ.ও (মৃ. ৭৫১ হি.) একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه، فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ، إن شاء الله.

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান অনুসরণে একনিষ্ঠ, কিন্তু কিছু মাসআলা (অস্পষ্টতা ও জটিলতার কারণে) তার নিকট বোধগম্য হয়নি। অতএব সেক্ষেত্রে যদি ঐ ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীর তাকলীদ করে, তবে এটা প্রশংসনীয় ও সাওয়াবের কাজ। এতে নিন্দনীয় বা গোনাহের কিছু নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদ এর আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।”^{৩৬}

আমাদের বক্তব্যও একই। যেমন ভারত উপমহাদেশের বিরল ব্যক্তিত্ব হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন,

تقليد کی تفسیر یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارشادات پر عمل کرتے

ہیں اس تفسیر پر جو امام ابوحنیفہ بیان کی ہے۔

“তাকলীদের ব্যাখ্যা এই যে, আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (অস্পষ্ট ও জটিল) হাদীস ও নির্দেশনাসমূহ ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনুসরণ বা আমল করি।”^{৩৭}

তাইতো ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রহ. (মৃ. ১৮১ হি.) বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহী সমাধান হাদীসেরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা। তিনি বলেন,

^{৩৫} আল-মিযানুল কুবরা, শা'রানী ১/১১৬, আলামুল কুতুব।

^{৩৬} ই'লামুল মুআক্কিয়ীন ৩/৪৪৮, তাহকীক, আবু উবায়দা।

^{৩৭} আশরাফুল জাওয়াব, থানভী ১৬১-৬২, ইকরা বুকডিপো, দেওবন্দ।

لا تقولوا رأي أبي حنيفة، بل قولوا تفسير الحديث.

“তোমরা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ‘রায়’ বলো না; বরং বলো, ‘হাদীসের ব্যাখ্যা’।”^{৩৮}

ইমাম শাফেয়ী রহ. (মৃ. : ২০৪ হি.) বলেন,

جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن.

“উম্মত (এর ইমামগণ) যা বলেন সবই সুন্নাহর ব্যাখ্যা, আর সকল সুন্নাহ মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা।”^{৩৯}

সুতরাং বুঝা গেল, ইমামের অনুসরণ বা তাকলীদের মূল হল- অস্পষ্ট ও জটিল ক্ষেত্রগুলোতে ইমামের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মতে কুরআন-সুন্নাহরই অনুসরণ করা।

ইমামগণ শারে’ (শরীয়তপ্রণেতা) নয়, বরং শারেহ (ব্যাখ্যাকার):

বিষয়টি সহজে অনুধাবন করার জন্য দুটি উদাহরণ পেশ করছি।

এক. আমাদের দেশ সংবিধান পরিচালিত দেশ। এই সংবিধানের ধারা-উপধারাগুলো বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ আকারে আমাদের সামনে রয়েছে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু দেশের কোটি কোটি নাগরিকদের মধ্যে কয়জন সংবিধানের উপর সরাসরী আমল করতে পারে? সাধারণ লোকদের কথা বাদই দিলাম, বরং যারা মাস্টার বা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্টার বা ডক্টর তারাও সংবিধানের বই খুলে জটিল ধারা সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোকামী করেন না। বরং সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ঠিক একই অবস্থা কুরআন-হাদীসের ক্ষেত্রেও।^{৪০}

এভাবে সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করেন সরকার ও সংসদ সদস্যগণ। আর ব্যাখ্যাদাতা হলেন, সংবিধান ও আইনশাস্ত্রে দক্ষ উকিল ও বিচারকগণ। তারা সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বিচারকগণ রায় দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে যেমন কোন বিচারক বা উকিলকে আইনপ্রণেতা বলা হয় না, বরং তাদেরকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকার বলা হয়, তদ্রূপ মুজতাহিদ ইমামগণকেও শরীয়তপ্রণেতা বলা যাবে না, বরং কুরআন-সুন্নাহ নামক সংবিধানের ব্যাখ্যাকার বলতে হবে।^{৪১}

^{৩৮} ফাযায়েলে আবী হানীফা, ইবনে আবীল আওয়াম পৃ. ১০১।

^{৩৯} আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, সূয়ুতী।

^{৪০} কারো প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন...? এর উত্তর সামনে আসবে।

^{৪১} এর মূল বক্তব্যটি দেখুন, মুফতি তাকী ওসমানী দা.বা. এর ‘তাকলীদ কী শরয়ী হাইছিয়াত’ কিতাবে।

সুতরাং ইমামগণকে শরীয়তপ্রণেতার আসনে বসিয়ে তাকলীদকে শিরক এবং মাযহাব অনুসারীদেরকে মুশরিক বলার কোন সুযোগ নেই।

দুই. কোন ব্যক্তি কূপ খনন করে বা মেশিনের সাহায্যে মাটির অতল গহ্বর থেকে পানি তুলে আনার কারণে কেউ তাকে পানির সৃষ্টিকর্তা বা আবিষ্কারক বলে না। কারণ সবাই জানে, আল্লাহ প্রদত্ত পানি পূর্ব থেকেই মাটির নিচে ছিল। তবে কূপ খননের কারণে এখন তা প্রকাশ পেয়েছে। ঠিক একই অবস্থা মুজতাহিদ ইমামগণের ক্ষেত্রে। তাঁরাও কুরআন-সুন্নাহর অস্পষ্ট হুকুমসমূহ আল্লাহপ্রদত্ত ইলমী দক্ষতা দ্বারা ক্রিয়াসের মাধ্যমে ও চূড়ান্ত গবেষণা করে জনসম্মুখে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কূপ খনন করে পানি প্রকাশকারীকে যেমন পানির সৃষ্টিকর্তা বলাটা বোকামী ও মূর্খতা, তদ্রূপ ইমামগণকে শরীয়তপ্রণেতা বলাটাও একই কথা। সাথে সাথে কূপ থেকে পানি সংগ্রহকারীদের যেমন মুশরিক বলা যায় না, অনুরূপ মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারীদেরকেও মুশরিক বলা যাবে না।

সারকথা, মুজতাহিদ ইমামগণ কেবল ব্যাখ্যাদানকারী ও প্রকাশকারী মাত্র। যেভাবে উকীল ও বিচারপতিরা সংবিধানের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত দান করলে আইনপ্রণেতা সাব্যস্ত হন না, তেমনি ইমামগণকেও তাঁদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার কারণে শরীয়তপ্রণেতা সাব্যস্ত করা যাবে না।

অনুরূপ কূপ খনন করে পানি প্রকাশকারীকে যেমন পানির সৃষ্টিকর্তা বলা হয় না, তদ্রূপ অস্পষ্ট হুকুমসমূহ ক্রিয়াসের মাধ্যমে বের করার কারণে ইমামগণকেও শরীয়তপ্রণেতা বলা যাবে না।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে অন্য কাউকে শরীয়তের বিধান প্রণয়নের অধিকার দিয়ে তার স্বতন্ত্র আনুগত্য তাকলীদের উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহতে প্রাপ্ত উপরোল্লিখিত অস্পষ্টতা ও জটিলতার ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, বিজ্ঞ ইমামের সিদ্ধান্ত ও তাঁর দেখানো পথে কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণই হল তাকলীদের নির্ভেজাল উদ্দেশ্য।

প্রিয় পাঠক! এটাই তাকলীদের মূল কথা ও আসল কথা। এখানে বলুন তো কোন্ বিষয়টা কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ এবং শিরিকের সমার্থক? এরপরও কেউ যদি বলে, তাকলীদ শিরক এবং মাযহাবের অনুসারীরা মুশরিক, তাহলে তার বিবেকের উপর ক্রন্দন করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাড়াবাড়ি-ছাড়াবাড়ির পথ ছেড়ে সীরাতে মুস্তাকীমের দিশা দিন। আমীন!

সাধারণ ও গায়রে মুজতাহিদদের জন্য তাকলীদ আবশ্যিক:

কুরআন-সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জীবন ব্যবস্থা। তাই সঙ্গতভাবেই এতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সব সমস্যার সমাধান এতে দেখতে পায় না। খালি চোখে যেমন বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অনেক কিছু আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে তা দেখতে পাই, তেমনি আল্লাহ তাআলা মুজতাহিদ ইমামগণকে এমন ইলমের অণুবীক্ষণ-ক্ষমতা দিয়েছেন, যা দিয়ে সহজেই তাঁরা সকল সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় দেখতে পান এবং সমাধান বের করতে সক্ষম হন।

সুতরাং বুঝা গেল মানুষ দুই শ্রেণীর: মুজতাহিদ এবং সাধারণ বা গায়রে মুজতাহিদ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য হল প্রথম শ্রেণীর অনুসরণ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

“অতএব তোমরা যদি না জানো (দ্বিতীয় শ্রেণী), তবে ওলামাদেরকে (প্রথম শ্রেণীকে) জিজ্ঞাসা কর।”^{৪২}

একই মর্মের গ্রহণযোগ্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

“না জানলে কর্তব্য হল, (ওলামাদেরকে) জিজ্ঞাসা করা।”^{৪৩}

উসূলুল ফিকহ ও তাকলীদ সংক্রান্ত প্রায় গ্রন্থে অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম উল্লিখিত আয়াত এবং অনেকে উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে বলেছেন, দ্বিতীয় শ্রেণী তথা সাধারণ ও মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ করা অপরিহার্য। নিম্নে কয়েকজনের বক্তব্য উল্লেখ করা হল।

বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও ফকীহ খতীব বাগদাদী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) ‘আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ’ গ্রন্থে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب القول فيمن يسوغ له التقليد، ومن لا يسوغ.

“তাকলীদ কার জন্য বৈধ এবং কার জন্য বৈধ নয়- এ বিষয়ে আলোচনা।” এরপর বলেন,

^{৪২} সূরা আশ্শিরা ৭; সূরা নাহাল ৪৩।

^{৪৩} আবু দাউদ, হা- ৩৩৬, হাদীসটির আরো সনদ ও শাওয়াহেদ রয়েছে, তাই এটি সহীহ লিগায়রিহী।

أما من يسوغ له التقليد فهو العامي: الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالماً، ويعمل بقوله، قال الله تعالى: {فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.... إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

“শরীয়তের আহকাম ও তার উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, এমন সাধারণ ব্যক্তির জন্য আলেমের (তথা মুজতাহিদের) তাকলীদ করা এবং তাঁর কথা মতে আমল করা বৈধ।” অতঃপর তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ উপরোল্লিখিত আয়াত এবং নিজ সনদে হাদীসটি পেশ করে বলেন,

ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد، كتقليد الأعمى في القبلة؛ فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.

“যিনি মুজতাহিদ নন, তার জন্য তাকলীদ করা অপরিহার্য। যেভাবে কিবলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগ্যতার অভাবে অন্ধ ব্যক্তির উপর চক্ষুশ্রম ব্যক্তির তাকলীদ করা অপরিহার্য।”^{৪৪}

ইমাম ইবনে আব্দিল বার মালেকী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকলীদ করা নিন্দিত হওয়ার প্রমাণাদি আলোচনা করে বলেন,

وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تزل بها؛ لأنها لا تبين موقع الحجة، ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها؛ إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم.

ولم يختلف العلماء: أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل {فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه.

وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك - والله أعلم - لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم.

“তাকলীদ নিন্দিত হওয়ার প্রমাণাদি মুজতাহিদগণের জন্য প্রযোজ্য। আর সাধারণদের যে কোনো উদ্ভূত বিষয়ে শরয়ী হুকুম জানার জন্য অবশ্যই স্বীয় আলেমগণের (তথা মুজতাহিদগণের) শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ তারা দলিলের মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম না। তাদের বুঝ ও জ্ঞান ইজতিহাদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। ইলমের অনেক স্তর রয়েছে। নিম্নস্তরের জ্ঞান লাভ করা ছাড়া উপরের স্তরে পৌঁছা যায় না।...

এ ব্যাপারে ওলামাদের মতানৈক্য নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য স্বীয় ওলামাদের (মুজতাহিদগণের) তাকলীদ করা অপরিহার্য। আর আল্লাহ পাকের ইরশাদ ‘তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর’ থেকে তাঁরাই উদ্দেশ্য।

সর্বসম্মত কথা হলো, কিবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তির অবশ্যই বিশ্বস্ত কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলীদ করতে হয়। অনুরূপ দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, শরয়ী আহকামের ক্ষেত্রে আলেমের তাকলীদ করা। ওলামাদের ঐকমত্য যে, সাধারণ মানুষের জন্য ফাতওয়া প্রদান করা জায়েয নাই।^{৪৫} কারণ সে শরয়ী বিধানের দলিল ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম নয়।^{৪৬}

ইনিই হলেন সেই ইবনে আব্দিল বার রহ., যাকে একটি মহল ভুল বুঝে বা অপব্যাক্যার আশ্রয় নিয়ে তাকলীদ বিরোধী ও তাকলীদের নিন্দাকারী হিসেবে মশহুর করে রেখেছেন। অথচ তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকলীদ নিন্দিত হওয়ার কথা বলেছেন।

ইমাম কুরতুবী মালেকী রহ.ও (মৃ. ৬৭১ হি.) ‘তাকসীরে কুরতুবী’তে আয়াতটির ব্যাক্যায় একই কথা বলেছেন।

তিনি সূরা নিসার ১৭০ নং আয়াতের ব্যাক্যায় লিখেন,
 أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين
 يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. واختلف العلماء في جوازه في مسائل
 الأصول على ما يأتي، وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح.

“হক বিষয়ে তাকলীদ করা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মুসলমানদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। যাতে জাহেল ও সাধারণরা আশ্রয় গ্রহণ

^{৪৫} অথচ বর্তমানে সাধারণ লোকেরা যেভাবে ফতোয়া দিচ্ছে এবং সরকারের কিছু এমপি-মন্ত্রী দেশের বড় আলেম ও মুফতি বনে যাচ্ছেন, মনে হয় কিয়ামত খুবই সন্নিকটে।

^{৪৬} জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, পৃ. ৩৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

করে থাকে। আকীদাগত বিষয়ে তাকলীদের বৈধতা নিয়ে মতভেদ থাকলেও আমল সংক্রান্ত বিষয়ে তাকলীদের বৈধতা সহীহ ও বিশুদ্ধ।”

ইমাম আবু বকর জাসাস হানাফী রহ. (মৃ. ৩৭০ হি.) উসূলুল ফিকহের খুবই মূল্যবান ও উপকারী কিতাব ‘আল-ফুসূল ফীল উসূল’ এ লিখেন,

إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه مساءلة أهل العلم عنها. وذلك لقول الله تعالى: {فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. وقال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}. فأمر من لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن المصدر الأول، ثم التابعين، إلى يومنا هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها.

“মুজতাহিদ নন এমন সাধারণ ব্যক্তির যে কোনো উদ্ভূত বিষয়ে আলেমগণ (মুজতাহিদগণ) থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর’। আরো ইরশাদ হয়েছে, ‘কেন এমন হয় না যে, মুসলিমদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ বের হবে, যাতে তারা দ্বীনের ফিকহ অর্জনের চেষ্টা করে। এবং যখন তাদের কওমের লোক (জিহাদ থেকে) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করবে, ফলে তারা সতর্ক থাকবে’।^{৪৭}

কাজেই আল্লাহ পাক দ্বীনের উদ্ভূত বিষয়ে সাধারণদেরকে মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। আর এ কর্মধারা ও পদ্ধতি-ই প্রথম যুগ ও তাবীয়ীনদের যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত চলে আসছে। অর্থাৎ দ্বীনের উদ্ভূত বিষয়ে সাধারণরা মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হওয়া।”

অতঃপর তিনি সাধারণদের লোকদের বিভিন্ন অবস্থা ও তাকলীদের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন,

فثبت أن عليه مساءلة أهل العلم بذلك وقبول قولهم فيه.

“সুতরাং প্রমাণিত হল, সাধারণদের জন্য উদ্ভূত বিষয়ে মুজতাহিদগণকে জিজ্ঞাসা করা ও তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরিহার্য।”^{৪৮}

তিনি ‘আহকামুল কুরআন’ এ সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াত-

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ

“...তারা যদি তা রাসূল বা যারা উলুল আমর (কর্তৃত্বের অধিকারী) তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত।”-এর ব্যাখ্যায় লিখেন,

وَمِنْهَا أَنَّ الْعَامِّيَّ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ.

“উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্ভূত বিষয়ে সাধারণ মানুষের জন্য মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা অপরিহার্য।”

উল্লেখ্য, জাস্‌সাস রহ. যে বলেছেন, “সাধারণরা মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হওয়ার কর্মধারা প্রথম ও তাবীয়ীনদের যুগ থেকে এ পর্যন্ত চলে আসছে।” এটা শুধু তাঁর দাবি নয়, বরং আরো অনেকে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যেমন ইবনে খালদুন রহ. (মৃ. ৮০৮ হি.) তার ‘মুকাদামা’তে বলেন,

إِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ فِتْيَا، وَلَا كَانَ الدِّينَ يُوْخَذُ عَنْ جَمِيعِهِمْ،

وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مَخْتَصًا بِالْحَامِلِينَ لِلْقُرْآنِ، الْعَارِفِينَ بِنَاسِخِهِ...

“সকল সাহাবা মুফতি ও মুজতাহিদ ছিলেন না এবং সকল সাহাবা থেকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা হত না। বরং এ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু সাহাবা ছিলেন।..”

অর্থাৎ কিছু সাহাবা মুজতাহিদ ছিলেন, আর তাঁদের থেকেই অন্যরা দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

আরো সুস্পষ্ট করে আল্লামা আমিদী রহ. (মৃত্যু ৬৩১ হি.) লিখেন,

لَمْ تَزَلِ الْعَامَّةُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ قَبْلَ حَدُوثِ الْمَخَالِفِينَ يَسْتَفْتُونَ

الْمُجْتَهِدِينَ وَيَتَّبِعُونَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ،...

“সাহাবা ও তাবীয়ী যুগে সাধারণ লোকেরা মুজতাহিদগণ থেকে জিজ্ঞাসা করতেন (ভিন্নমত পোষণকারীদের আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত) এবং শরয়ী আহকামের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করতেন।”^{৪৯}

^{৪৮} আল-ফুসূল ফীল উসূল ৪/২৮১-৮২।

^{৪৯} আল-ইহকাম লিল-আমেদী : ৪/৪৫১।

সৌদি আরবের শায়খ বিন বায রহ. এর পরে যার স্থান শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ উছাইমিন রহ. (মৃত্যু ১৪২১ হি.) বলেন,

والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الله تعالى يقول: { فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى عهدنا هذا: من لا يستطيع الوصول إلى الحكم نفسه لجهله وقصوره، ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قالوا، هو التقليد.

“বাস্তবতা হল, তাকলীদ সাহাবা যুগ থেকেই চলে আসছে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর’। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবা যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত একদল লোক এমন রয়েছে, যারা অজ্ঞতার কারণে ও যোগ্যতার অভাবে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম জানতে অক্ষম। তাদের কর্তব্য হল, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আর এটার নামই তাকলীদ।”^{৫০}

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী হাম্বলী রহ. (মৃ. ৬২০ হি.) বলেন,

وأما التقليد في الفروع: فهو جائز إجماعاً... بل وجب على العامي ذلك.

“আমল সংক্রান্ত বিষয়ে তাকলীদ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।.. বরং সাধারণ মানুষের উপর তা ওয়াজিব।”^{৫১}

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

والذي عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.

“অধিকাংশ উম্মতের সিদ্ধান্ত হল, কারো জন্য ইজতিহাদ করা জায়েয এবং কারো জন্য তাকলীদ করা জায়েয। (কেননা) তাদের সিদ্ধান্ত তাকলীদকে হারাম সাব্যস্ত করে প্রত্যেকের উপর ইজতিহাদ চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে না। আবার ইজতিহাদকে হারাম ঘোষণা করে প্রত্যেকের উপর তাকলীদ ওয়াজিব করে দেওয়ার স্বপক্ষেও না।

^{৫০} মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিহী ২৬/৪০৩-৪০৪।

^{৫১} রওয়াতুন নাযির ওয়া জুনাতুল মুনাযির, ২/৩৮২-৮৩, মুআসাসাতুর রাইয়ান।

(বরং) যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে (শর্তানুযায়ী) সক্ষম, তার জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ। আর যে ইজতিহাদ করতে অক্ষম, তার জন্য তাকলীদ করা বৈধ।”^{৫২}

লক্ষ্য করুন! যারা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.কে তাকলীদের বিরোধিতার জন্য সারে তাজ ও অগ্রপথিক মনে করেন, তারা ভালোভাবে বক্তব্যটি পড়ুন ও বুঝার চেষ্টা করুন। এখানে তিনি জুমহুরে উম্মত নয়, বরং জামাহীরে উম্মতের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন ইজতিহাদ-তাকলীদ জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে।

যে সকল আলেম ইজতিহাদের যোগ্য নন, তাদেরও তাকলীদ করতে হবে:

আল্লামা আমিদি রহ. (মৃ. ৬৩১ হি.) বলেন,

العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد، - وإن كان محصلاً لبعض العلوم
المعتبرة في الاجتهاد - يلزمه اتباع قول المجتهدين، والأخذ بفتواه عند المحققين من
الأصوليين.

“সাধারণ ব্যক্তি এবং যিনি ইজতিহাদের যোগ্য নন, (যদিও ইজতিহাদের প্রয়োজনীয় কিছু ইলম তার অর্জিত থাকে) তাদের জন্য আবশ্যকীয় হল, মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা এবং তাঁদের ফতোয়া গ্রহণ করা। এটাই মুহাক্কিক উসুলীগণের ফায়সালা।”^{৫৩}

ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) ‘তাফসীরে কুরতুবী’তে সূরা নিসার ১৭০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

وعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه
الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب،...

“আলেমের জন্যও কর্তব্য হল, কোন উদ্ভূত বিষয়ে দলিল স্পষ্ট না হলে আরেকজন আলেমের তাকলীদ করা।...”

মানুষ দুই শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ:

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, মানুষ দুই শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ। হয় মুজতাহিদ, নয়তো গায়রে মুজতাহিদ বা মুকাল্লিদ।

^{৫২} মাজমুউল ফাতাওয়া ২০/২০৩।

^{৫৩} আল-ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম ৪/৪৫১, দারুছ ছামী'রী।

ইমাম তকীউদ্দিন সুবকি রহ. ‘আদ-দুররাতুল মুদিয়া’ কিতাবে লিখেন,
 إن الناس علي قسمين: عالم مجتهد متمكن من استخراج الأحكام من الكتاب
 والسنة، أو عامي مقلد لأهل العلم. ووظيفة المجتهد إذا وقعت واقعة أن يستخرج
 الحكم فيها من الأدلة الشرعية، ووظيفة العامي أن يرجع إلى قول العلماء، وليس
 لغير المجتهد إذا سمع آية أو حديثاً أن يترك به أقوال العلماء، فإنه إذا رآهم قد
 خالفوا ذلك مع علمهم به: علم أنهم إنما خالفوه لدليل دلّهم على ذلك. وقد قال
 الله تعالى: {فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}...

والقصد أن غير العالم المجتهد – ولا سيما العوام – إذا سمعوا آية فيها عموم
 أو إطلاق لم يكن لهم أن يأخذوا بذلك العموم أو الإطلاق إلا بقول العلماء، ولا
 يعمل بالعمومات والإطلاقات إلا من عرف الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص،
 والمطلق والمقيّد، والمجمل والمبين، والحقيقة والمجاز. ...

“মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত । ১. মুজতাহিদ আলেম, যিনি কিতাব ও সুন্নাহ
 থেকে বিধি-বিধান বের করতে সক্ষম । ২. আলেমগণের অনুসারী সাধারণ
 মুকাল্লিদ । কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে মুজতাহিদের কর্তব্য হলো,
 শরীয়তের দলিলের আলোকে তার বিধান বের করা এবং সাধারণ মানুষের
 কর্তব্য হলো, মুজতাহিদের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা । যারা মুজতাহিদ
 নয় তাদের জন্য কোন একটি আয়াত বা হাদীস দেখে মুজতাহিদ আলেমের
 বক্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয় । কেননা সে যখন দেখল যে, এই দলিল
 সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এর উপর আমল করা থেকে বিরত
 থেকেছেন, তখন সে নিশ্চিত থাকবে যে, তারা সুনির্দিষ্ট দলিলের আলোকেই
 এর বিরোধিতা করেছেন । আলাহ তাআলা বলেছেন, ‘তোমরা যদি না
 জানো, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো’ ।

আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, মুজতাহিদ আলেম নয় এমন ব্যক্তি
 বিশেষভাবে সাধারণ মানুষ যখন কোন আয়াত শুনবে যেখানে আম বা
 মুতলাক হুকুম রয়েছে, তাদের জন্য ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য ছাড়া এই
 আম বা মুতলাকের উপর আমল করা বৈধ নয় । নাসেখ-মানসুখ, আম-
 খাস, মুজমাল-মুবায্যান, ও হাকীকত-মাজায সম্পর্কে অবগত না হয়ে আম
 ও মুতলাক বিষয়ের উপর আমল করা বৈধ নয় ।”

এরপর তিনি দু'পৃষ্ঠাব্যাপী বেশ ক'টি উদাহরণ উল্লেখ করে লিখেন,

وهذا يوضح أن العمل بالعموم بمجرد من غير نظر في أدلة التخصيص والتقييد خطأ من العامل به، وأمثلة ذلك كثيرة لا تطيل بذكرها،... فإذا اعترف أنه لا ينبغي له أن يعمل بالعموم حتى يعرف هل له مخصص، ويعرف ما يعارضه من الأدلة: فوُض الأمر إلى أهله، وعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وكذلك لا ينبغي أن يأخذ بأدلة الكتاب حتى يعلم ما في السنة مما يبيّنه أو يخصه أو يقيد، قال الله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤].

“উল্লিখিত উদাহরণ থেকে স্পষ্ট, খাস ও মুকায়্যাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ছাড়া সাধারণভাবে কোন আয়াত বা হাদীসের উপর আমল করা একটি ভুল পদ্ধতি।.. কোন আমের উপর আমল করার জন্য তার কোন খাস এবং উক্ত বিধানের বিরোধী কোন দলিল আছে কি না, সেটা জানা আবশ্যিক।

সুতরাং প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, সে বিষয়টিকে যোগ্য ব্যক্তির নিকট ন্যস্ত করবে। সে অবশ্যই অবগত রয়েছে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে মহাজ্ঞানী রয়েছে। একইভাবে কুরআনের কোন আয়াতের উপর আমল করার পূর্বে উক্ত আয়াতের খাস বা মুকায়্যাদ কোন হাদীস আছে কি না, সেটা জানা আবশ্যিক। আলাহ তাআলা বলেছেন, আমি আপনার নিকট পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি তাদের নিকট অবতীর্ণ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন।”

অতঃপর সুবকী রহ. লিখেছেন,

فمن لم يعرف الكتاب والسنة وأقوال الأئمة: لم يكن له أن يقف عند دليل

يسمعه، من غير إمام يرشده.

“যে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইমামগণের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য কোন ইমামের দিক-নির্দেশনা ব্যতীত কোন দলিল শুনে তার উপর আমল করা সংগত নয়।”^{৫৪}

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ولا يخلو أمر الداعي من أمرين: الأول: أن يكون مجتهداً، أو مثقلاً؛ فالجهد

ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة، ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه. الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها.

“দাঈ ও আহবানকারী দুই শ্রেণী থেকে কোন এক শ্রেণীর হবেন। হয় নিজে মুজতাহিদ হবে, নয়তো কারো তাকলীদকারী হবে।... যদি কারো তাকলীদ করে, তবে সালাফের তাকলীদ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রাথমিক যুগ পরবর্তী যুগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”^{৫৫}

অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর অভিমত হলো, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নয় তাকে তাকলীদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালের যেমন তেমন কারো অনুসরণ না করে সালাফ পূর্ববর্তী কোনো ইমামকে অনুসরণ করবে।

এ কারণেই ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সুহবতপ্রাপ্ত এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের সমাদৃত ইমাম হাফেজ যাহাবী রহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) ‘সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ গ্রন্থে বলেন,

فالمقلدون صحابة رسول الله ﷺ، ثم أئمة التابعين... ثم كأي حنيفة، ومالك، والأوزاعي،... ثم كابن المبارك، والقاضي أبي يوسف،... ثم كالشافعي، وأبي غنيد، وأحمد،... ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد، ووضعت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد... ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة. وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا.

“তাকলীদের উপযুক্ত সাহাবায়ে কেরাম, অতঃপর তাবেয়ী যুগের ইমামগণ, এরপর (ইমাম) আবু হানীফা, (ইমাম) মালেক, আওয়ামী, তারপর হচ্ছে ইবনুল মোবারক, কাযী আবু ইউসুফ, এঁদের পর হলেন, (ইমাম) শাফেয়ী, আবু উবাইদ ও (ইমাম) আহমদ রহ. প্রমুখ। এ জাতীয় লোকদের পর ইজতিহাদ কমে গেল এবং ফকীহগণ তাকলীদকে গ্রহণ করল। আর বর্তমান (৬৭৩-৭৪৮ হি.) শুধু চার মাযহাবই বাকি রয়েছে। এবং চার মাযহাব সম্পর্কে ভালভাবে জানে এমন লোকের সংখ্যাই নগণ্য, মুজতাহিদ হওয়া তো দূরের কথা।”^{৫৬}

এর কারণ হচ্ছে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও স্মৃতিশক্তি, ন্যায় ও ধার্মিকতা এবং তাকওয়া ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যতা ও নিঃস্বতা এতই প্রকট যে, পূর্ববর্তীদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাওয়াও এক নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া কিছু নয়। এছাড়া তাঁরা ছিলেন কুরআন অবতরণ ও সুন্নাহ বাস্তবায়নের সময় ও পরিবেশের নিকটতম প্রতিবেশি।

^{৫৫} প্রাপ্ত ২০/৯।

^{৫৬} সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/৯১-৯২, মুআসাসাতুর রিসালা।

এ নৈকট্যের সুবাদে কুরআন-সুন্নাহর মর্ম অনুধাবন ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ তাঁদের জন্য ছিল সহজ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ।

কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করাই নিরাপদ ও যুক্তিসম্মত। আর এটাই হল, কারো তাকলীদ বা মাযহাব মানার মূলকথা।

এ বিষয়ে ইমামগণ উসূলে ফিকহের কিতাবের শেষের দিকে ‘ইজতিহাদ-তাকলীদ’ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য আলোচনার ক্ষেত্রেও তারা এ জাতীয় বক্তব্য বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সবার ভাষ্য হচ্ছে, যে মুজতাহিদ নয়, সে মুকাল্লিদ।

অনুরূপ আল্লাহ পাকের ইরশাদ থেকেও বুঝা যায়, মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ। ইরশাদ করেন, ‘তোমরা যদি না জানো, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো’।^{৫৭} অর্থাৎ যারা জানে তাদের নাম মুজতাহিদ, যারা জানে না তাদের নাম মুকাল্লিদ। আর এ দুইয়ের বাহিরে যারা হবে তাদের নাম গায়রে মুকাল্লিদ। মুত্তাবি’ নামে কোন প্রকারের স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন দলিল নেই। এমনকি আবু আব্দুল্লাহ বসরী নামক ব্যক্তি ও ইবনুল কায্যিম রহ. ছাড়া অন্য কোন ইমামেরও বক্তব্য নেই।

কাজেই যারা মুত্তাবি’ নামে কোন প্রকারের স্বপক্ষে কথা বলে, তারা মূলত ওই দুই জনেরই মুকাল্লিদ। আর যারা মুত্তাবি’ নাম ধারণ করে অন্যের মুকাল্লিদ হয়ে, তারা আবার তাকলীদকে কীভাবে নাজায়েয বলে? এ সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে যাদের আগ্রহ হয়, তারা অধমের ‘আল-ই’তিমাদ’ গ্রন্থ দেখতে পারেন।

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, মানুষ দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ। মুজতাহিদ ও গায়রে মুজতাহিদ বা মুকাল্লিদ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য হল প্রথম শ্রেণীর অনুসরণ করা।

ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায্যিম, শাহ ওলীউল্লাহ ও

আরবের আলেমগণ কি তাকলীদ বিরোধী?

তাকলীদ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দুটি বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এছাড়া আরো বক্তব্য রয়েছে, যা একত্রিত করা হলে স্বতন্ত্র পুস্তিকার রূপ ধারণ করবে। তবে এখানে আর দুটি উল্লেখ করছি।

^{৫৭} সূরা আশ্বিয়া ৭; সূরা নাহাল ৪৩।

তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَقَدْ اتَّبَعَ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِدِّينِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ قَوْلَ غَيْرِهِ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ مَحْمُودٌ مُثَابًّا، لَا يُذَمُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُعَاقَبُ.

“যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম জানতে অক্ষম, সে যদি এ ক্ষেত্রে দীনদার কোন আলেম (মুজতাহিদ) এর অনুসরণ করে এবং তার পক্ষে এটা জানা সম্ভব নাও হয় যে, অন্য ইমামের উক্তি তাঁর অনুসরণীয় ইমামের উক্তির চেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তবুও সে প্রশংসার যোগ্য এবং সাওয়াবের অধিকারী হবে। এই তাকলীদের জন্য তাকে তিরস্কার করা যাবে না এবং (আখেরাতেও) সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না।”^{৫৮}

তিনি আরো বলেন, চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব কারো পছন্দ হলে ঐ বিষয়ে আপত্তি করা অন্যের জন্য বৈধ নয়। তাঁর ভাষ্য-

من ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك.

“যার কাছে শাফেয়ী মাযহাব ভালো লাগে, সে মালেকী মাযহাব পছন্দ করে এমন কারো প্রতি আপত্তি করতে পারবে না। অনুরূপ যার কাছে হাম্বলী মাযহাব প্রাধান্য পায়, সে শাফেয়ী মাযহাব বা অন্য কোনো মাযহাবের অনুসারীর প্রতি আপত্তি করতে পারবে না।”^{৫৯}

ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর নিম্নোক্ত কথা কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান অনুসরণে একনিষ্ঠ, কিন্তু কিছু মাসআলা তার নিকট বোধগম্য হয়নি। এ ক্ষেত্রে যদি সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীর তাকলীদ করে, তবে এটা প্রশংসনীয় ও সাওয়াবের কাজ। এতে নিন্দনীয় বা গোনাহের কিছু নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদ এর আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।”^{৬০}

^{৫৮} মাজমুউল ফাতাওয়া ২০/২২৫।

^{৫৯} প্রাপ্ত ২০/২৯২।

^{৬০} ই‘লামুল মুআক্কিয়ীন ২/৪৩৮, দারুল হাদীস, কায়রো।

তিনি উপরোক্ত বক্তব্য যেই শিরোনামের অধীনে করেছেন, তা হল-

ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به،

وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب.

“তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং তা তিন প্রকার ।

ক. এমন ক্ষেত্র যেখানে মাসআলা বলা ও ফতোয়া দেওয়া হারাম ।

খ. এমন ক্ষেত্র যেখানে তাকলীদ করা ওয়াজিব ।

গ. এমন ক্ষেত্র যেখানে তাকলীদ করা জায়েয, ওয়াজিব নয় ।”^{৬১}

আফসোস! তিনি শিরোনাম ও উল্লিখিত বক্তব্যে ওয়াজিব ও জায়েয তাকলীদের আলোচনা করার ও বিবরণ দেওয়ার ওয়াদা করলেও আর দেননি । যদি দিতেন, তাহলে মনে হয়, আজকাল লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাঁর কিছু বক্তব্য নিয়ে যেভাবে বৈধ তাকলীদ ও মাযহাবের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন- এর সুযোগ হত না । তবে সমঝদারদের জন্য তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যে তাকলীদের ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা বুঝার উপাদান রয়েছে । আল্লাহ পাক সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন ।

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. (মৃত্যু ১১৭৬ হি.) তাকলীদকে দু’ভাগ করেছেন । ১. ওয়াজিব তাকলীদ । ২. হারাম তাকলীদ ।

আর ওয়াজিব তাকলীদের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন,

فأحدهما أن يكون من اتباع الرواية دلالة، تفصيله أن الجاهل بالكتاب

والسنة لا يستطيع بنفسه التبع ولا الإستنباط، فكان وظيفته أن يسأل فقيها ما

حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا وكذا، فإذا أخبر تبعه؛ سواء

كان مأخوذاً من صريح نص، أو مستنبطاً منه، أو مقيساً على المنصوص، فكل

ذلك راجع إلى الرواية عنه صلى الله عليه وسلم -ولو دلالة، وهذا قد اتفقت

الأمة على صحته قرناً بعد قرن، بل الأمم كلها اتفقت على مثله في شرائعهم.

“এক প্রকারের তাকলীদ (ওয়াজিব তাকলীদ) হাদীস অনুসরণে গণ্য হবে । তা হলো, কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেহেতু নিজেই শরয়ী আহকাম উদ্ভাবন ও উদঘাটন করতে সক্ষম নয়, অতএব তার দায়িত্ব সে কোনো ফকীহকে প্রশ্ন করবে, এই এই মাসআলায় রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা কী? আর সে ফকীহের ফায়সালা অনুসারে আমল করবে। চাই তাঁর ফায়সালা সুস্পষ্ট ‘নস’ বা ‘নস’ থেকে ইজতিহাদকৃত হোক অথবা কিয়াসলব্ব হোক। সবই হাদীসের অনুসরণ হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রকারের তাকলীদের সিদ্ধতার উপর যুগে যুগে উম্মতের ইজমা’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বরং সকল উম্মতের ঐক্যমতে এ ধরনের তাকলীদ জায়েয।”^{৬২}

তিনি অন্যত্র বলেন,

إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم، وأشربت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه.

“তদানীন্তন কাল থেকে অদ্য পর্যন্ত উক্ত সঙ্কলিত চার মাযহাবের তাকলীদ বৈধ হওয়ার উপর ইজমা’ সংঘটিত হয়েছে। আর এতে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে, যা লুকায়িত নয়। বিশেষ করে আমাদের এই (ইলম ও আমলের অক্ষমতার) যুগে, ...।”^{৬৩}

তিনি মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে বলেন,

اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها

كلها مفسدة كبيرة.

“জেনে রাখ! এই চার মাযহাব অনুসরণের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে এর থেকে বিমুখতায় রয়েছে বড় ধরনের ক্ষতি।”^{৬৪}

সৌদি আরব ও আরব বিশ্বে শিরক-বিদআত উৎখাত করে তাওহীদ ও সুন্নাতকে যারা যিন্দা করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রহ.। তিনি নিজে, তাঁর ছেলে ও তাঁর সিলসিলার অন্য আলেমগণ সকলেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (অর্থাৎ তাকলীদ করেছেন) যেমন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. এর ছেলে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, যিনি তার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তিনি বলেন,

^{৬২} ইকদুল জীদ পৃ. ৬৭ দারুল ফাতাহ।

^{৬৩} হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/৩৫০, কাদীমী কুতুব খানা করাচি ও আল-ইনসার পৃ. ৯৭।

^{৬৪} ইকদুল জীদ : ৪০, মাকতাবায়ে দারুল ফাতাহ

ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من
 قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة،
 والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة،
 بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.

“ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.
 এর মাযহাবের অনুসারী। আর যে ব্যক্তি চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোনো
 একটির তাকলীদ করে আমরা তার উপর কোনো অভিযোগ করি না। তবে
 আমরা (চার মাযহাব ছাড়া) অন্য কোনো মাযহাব সমর্থন করি না। কারণ
 অন্য মাযহাব সংকলিত ও সংরক্ষিত নয়।... বরং আমরা লোকদেরকে চার
 ইমামের কোনো এক ইমামের মাযহাব মানতে বাধ্য করি।”^{৬৫}

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহ. তাঁর উপর উত্থাপিত কিছু
 অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেন,

فمنها: قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول: إن الناس من
 ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد،
 ... وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.

جوابي عن هذه المسائل، أن أقول: سبحانه هذا بهتان عظيم!

“সে সব অভিযোগের মধ্য থেকে কয়েকটি এই, আমি নাকি বলি:-

এক. চার মাযহাবের কিতাবসমূহ বাতিল।

দুই. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা ভিত্তিহীন জিনিসের উপর
 আমল করে আসছে।

তিন. আমি মুজতাহিদ হওয়ার দাবিদার। আমি তাকলীদ করি না।
 এসকল অভিযোগের জবাবে আমি শুধু এটুকুই বলব, এ সবই আমার উপর
 অপবাদ বৈ কিছুই নয়।”^{৬৬}

শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ উছাইমীন রহ. বলেন, তাকলীদ দুই
 প্রকার ব্যক্তির জন্য জায়েয। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হল,

أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد.

^{৬৫} আদুরারুস সানিয়াহ : ১/২২৭।

^{৬৬} আর-রাসাইলিশ খসিয়া পৃ. ৪।

“তাকলীদকারী এমন সাধারণ লোক, যে নিজে (কুরআন-সুন্নাহ থেকে) হুকুম উদঘাটন করতে পারে না। তার জন্য ফরয হল তাকলীদ করা।”^{৬৭}

উপরোক্ত ইমামগণের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, তাঁরা সকলেই গায়রে মুজতাহিদ ও সাধারণদের জন্য তাকলীদের স্বপক্ষে ছিলেন।

মাযহাব সমূহের মতপার্থক্য, কারণ ও করণীয়:

আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক এবং হাদীস এক, তাহলে মাযহাব কেন চারটা? নামাযের পদ্ধতি কেন দু’ধরনের? নামাযে আমীন জোরে বলবে, না আস্তে বলবে? আর এক মাযহাব বা নামাযের একটি পদ্ধতি যদি সঠিক হয়, তাহলে দ্বিতীয়টা কী অথবা তা আসল কোথেকে? কেননা শরীয়ত তো দু’টি নয়...। এ সমস্ত প্রশ্ন আজ শিক্ষিত থেকে আম সাধারণ পর্যন্ত অনেকের কাছে। এমনকি কোন কোন আলেমের কাছেও।

তবে কুরআন-হাদীস থেকে বিধান আহরণের উসূল ও মূলনীতি সম্পর্কে যারা অবগত, তাদের কাছে এ সমস্ত প্রশ্নের কারণ ও উত্তর স্পষ্ট। কেননা তারা জানেন যে, শরীয়তের দলিল দু’ধরনের।

১. কতইয়্যাৎ:^{৬৮} অর্থাৎ উপরোল্লিখিত যে সকল ক্ষেত্রে “ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব”- এ শব্দত্রয়ের প্রয়োগ অবৈধ। কেননা এগুলো এমন দলিল, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং যার অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত। যেখানে সংশয় বা ভুল বুঝাবুঝি কিংবা মতভেদের কোন অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা একটিই; সবার মত ও পথ এক ও অভিন্ন। ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা ও শরীয়তের সমস্ত মৌলিক বিধান; বরং মাসায়েলের বিরাট এক অংশ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে কোনো ধরনের মতভেদ-বিভেদ হতেই পারে না। তাই এসব বিষয়ে ইমামগণের মাঝেও কোনো মতভেদ ও মাযহাব নেই। কেউ মতভেদ করলে তা অবশ্যই হঠকারিতা। কুরআনে এ প্রকারের দলিল থাকার পরও মতভেদ করা বা দলিল গ্রহণ না করার নিন্দা ও হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

^{৬৭} আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৭, দারু ইবনিল জাওযী।

^{৬৮} ‘কতইয়্যাৎ’ থেকে উদ্দেশ্য হল, قُطِعِي الشُّبُوتُ اَلْقَطْعِي الشُّبُوتُ وَالِدَلَالَةُ, কুরআনে কারীম ও হাদীসে মুতাওয়াতির। আর قُطْعِي الدَّلَالَةُ হল, খাস, মুকায়াদ, যাহের, ও ইবারাতুন নস ইত্যাদি।

২. যন্নিয়াত:^{৬৯} অর্থাৎ উপরোক্ত যে সকল ক্ষেত্রে “ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব”- এ শব্দত্রয়ের প্রয়োগ বৈধ। কেননা এ জাতীয় দলিলের অর্থ ও মর্মে রয়েছে অস্পষ্টতা বা দলিলের ভিন্নতা কিংবা বাহ্য বিরোধিতা অথবা পৌছার মাধ্যম ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারে অকাট্যহীনতা।

ফিকহ ও আমল সংক্রান্ত মাসআলা সমূহের শাখাগত বড় অংশ এর শামিল। এখানে দলিলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ এ ধরনের মতভেদ স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বহাল রেখেছে। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তী যুগে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ মতভেদের কারণ, দলিল না জানা বা না মানা নয়। কেননা এ মতভেদের প্রেরণা দলিলের অনুসরণ। স্বয়ং দলিলই ওই মতভেদের উৎস। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতা বিচারে অকাট্যহীন দলিল থাকা বা দলিলের একাধিক অর্থ ও মর্মের সম্ভাবনা থাকা কিংবা দলিলের ভিন্নতা অথবা বাহ্য বিরোধিতার কারণেই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরে যাওয়ার কারণে নয়।

উদাহরণস্বরূপ গ্রহণযোগ্যতা বিচারে অকাট্যহীন কোন দলিল সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে দলিলযোগ্য কিনা- এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভিন্নতা দেখা দেয়। অর্থাৎ কারো নিকট তা সুনির্দিষ্ট উসূলের ভিত্তিতে দলিলযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়; আবার কারো নিকট তা অন্য উসূলের ভিত্তিতেই দলিলের অনুপযুক্ত মনে হয়। তখন যার নিকট তা দলিলযোগ্য, তিনি উক্ত দলিলের আলোকে মাসআলার বিধান নির্ধারণ করেন। আর যার নিকট তা দলিলের অনুপযুক্ত, তিনি এর বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও মাযহাব সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি ভালোভাবে পরিষ্কার হওয়ার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন! মুরসাল হাদীস, স্বভাবত: মুরসাল হাদীসের বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন।

^{৬৯} ظَنِّيُّ الْبُيُوتِ وَالْأَلَلَةِ، وَقَطْعِيُّ الْبُيُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ، وَظَنِّيُّ الْبُيُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ

অর্থাৎ ظَنُّ শব্দটি যে ধরনের দলিলের উপর (শুধু উসূলুল হাদীস বা শুধু উসূলুল ফিকহের আলোকে হোক কিংবা উভয়ের আলোকে হোক) বলার সুযোগ রয়েছে, তা সবই ইজতিহাদের ক্ষেত্র। আর ইজতিহাদ হলে স্বভাবত মতপার্থক্য হবেই। সুতরাং দলিল ظَنِّيُّ হওয়াটাই মতপার্থক্যের মূল কারণ। এখন আল্লাহ পাক সব দলিলকেই কেন ‘কতইয়াত’ থেকে করেননি, যাতে মতভেদ ও মতপার্থক্যের সুযোগই না থাকত? এর সুনিশ্চিত ও বিস্তারিত উত্তর তো আখেরাতেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানা যেতে পারে। তবে যতটুকু তিনি বান্দার সামনে প্রকাশ করেছেন, তাও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে পারেন।

কেননা তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই সরাসরি রাসূল থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখন বর্ণনা সূত্রের এই বিচ্ছিন্নতার কারণে হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত হিসেবে পরিত্যাজ্য হবে, নাকি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে? বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে মুরসাল হাদীস যযীফ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত; দলিল হিসেবে উল্লেখের অনুপযুক্ত। অপরদিকে অধিকাংশ ফকীহ যেমন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রহ. এক বর্ণনা অনুযায়ী মুরসাল হাদীস সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাঁদের নিকট মুরসাল হাদীস দলিলযোগ্য এবং এর উপর আমল করাও গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী রহ. উভয় বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করে মাঝামাঝি একটি মত গ্রহণ করেছেন। তিনি সাধারণভাবে তা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন না। আবার একেবারে তা প্রত্যাখ্যানও করেন না। বরং হালকা দুর্বল হিসেবে গণ্য করেন। তাই মুরসাল হাদীসের জন্য যদি চারটি সমর্থন বিষয়ের কোনটি পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত হাদীস তাঁর নিকটও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়।^{৭০}

উপর্যুক্ত মতানৈক্যের কারণে বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সাথে অন্য তিন ইমামের মতবিরোধ হয়েছে। কারণ তাঁরা মাসআলার দলিল হিসেবে মুরসাল হাদীস উল্লেখ করেন। আর চারটি সমর্থন বিষয়ের কোন একটি না থাকায় স্বাভাবিকভাবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব উক্ত তিন ইমামের বিপরীত। একইভাবে মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে তিন ইমামের মাযহাব অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতেরও বিপরীত হবে।

অনুরূপ দলিলের বাহ্যবিরোধিতা নিরসন করার জন্য তিনটি পদক্ষেপের কোন একটি গ্রহণ করতে হয়। ১. জমা' বা সমন্বয় সাধন। ২. তারজীহ বা অগ্রগণ্য নির্ণয়করণ। ৩. নাসখ বা নাসেখ-মানসূখ নির্ণয়করণ। এখন স্বভাবত জানার পরিধি ও বুঝের তারতম্যের কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে ইজতিহাদের মাধ্যমে এই তিনটি কাজ সম্পন্ন করে মাসআলার বিধান আহরণ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়ে

^{৭০} সমর্থন বিষয়ের চারটি হল- ১. হাদীসটি অন্য সূত্রে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হওয়া। ২. অন্য সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হওয়া। ৩. কিছু সাহাবী উক্ত মুরসাল হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা। ৪. অধিকাংশ আলেম উক্ত হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা।

থাকে। (যেমন এক ইমাম সুনির্দিষ্ট উসূলের ভিত্তিতে বিরোধপূর্ণ দুই দলিলের একটিকে অগ্রগণ্য মনে করেন; আরেক ইমাম তার বিপরীত দলিলকে অগ্রগণ্য মনে করেন।) আর উক্ত মতপার্থক্য পরবর্তীতে যার যার মত ও মাযহাব নামে অভিহিত হয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره. ولا يعرف هذا

التفاضل إلا من خاض في تفاصيل العلم.

“প্রত্যেক ইমামের এমন কিছু মাসআলা রয়েছে, যাতে তিনি তাঁর মত ও মাযহাবকে অন্যের মাযহাবের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করেন। আর ইলমের শাখা-প্রশাখাগুলোতে যারা বিচরণ ও গবেষণা করেছেন, তারাই এ অগ্রগণ্যতার কারণ বুঝতে পারেন।”^{৭১}

লা-মাযহাবী ভাইদের অনেকের ধারণা, হাদীস সহীহ হলেই তো জটিলতা শেষ এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

كم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير.

“কত সহীহ হাদীস এমন রয়েছে, যার অর্থে রয়েছে অনেক মতানৈক্য।”^{৭২}

যারা ইজতিহাদলদ্ধ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি আমল করা দুই দুই চারের মতো সহজ মনে করেন, তারা উপরোক্ত আলোচনা ও ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য পড়ে আশা করি কিছুটা হলেও এক্ষেত্রে কেমন ইলম ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা উপলব্ধি করবেন।

সুতরাং প্রমাণিত হল, দ্বিতীয় প্রকার দলিল তথা যন্নিয়াতের ক্ষেত্রে মতভেদ হবে। তবে এ মতভেদের উপমা হলো, গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ। বিল্ডিংয়ে উঠার একাধিক সিঁড়ি। এগুলোর কোনটাকেই প্রত্যাখ্যান কিংবা নিন্দা জ্ঞাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।

এ মতভেদের বিষয়ে শরীয়তের বিধান হলো, এই মতভেদকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া ও কাঁদা ছোড়াছোড়ি করা গর্হিত কাজ। এখানে দলিলভিত্তিক মতভেদ স্বীকৃত, বরং নন্দিত। কিন্তু ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ।

^{৭১} মাজমুউল-ফাতাওয়া ২০/২৯৩।

^{৭২} নকদু মারাতীবিল ইজমা' পৃ. ৩০৪, দারু ইবনে হাযম।

অনুরূপ এ মতভেদ বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা ভুল এবং সবাইকে এক মাযহাব কিংবা এক মত ও পথের অনুসারী বানানোর জল্পনা-কল্পনা করা বাস্তবতা পরিপন্থী। সর্বপোরে এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইচ্ছার পরিপন্থী এবং সাহাবা ও সালাফের কর্ম বিরোধী।

কুরআন-সুন্নাহ থেকে দ্বিতীয় প্রকার দলিলের দৃষ্টান্ত আল্লাহ, রাসূল, সাহাবা ও সালাফদের নীতি

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, **وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**.
“তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন কুর পর্যন্ত”।^{৭৩}

এ আয়াতে কুর (قُرُوء) শব্দটি **قُرء** এর বহুবচন। অভিধান মতে শব্দটি দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। ঋতুশ্রাব ও ঋতুশ্রাব পরবর্তী পবিত্রতা। উভয় অর্থ অনুযায়ী বিধানের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে, যা আহলে ইলমের কাছে অজানা নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বিভিন্ন আলামত ও অন্য দলিলের আলোকে প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন। এটাই হানাফী মাযহাবে গৃহীত। আর য়ায়েদ ইবনে সাবেত রা. দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং শাফেয়ী মাযহাবে তা অনুসৃত।

আচ্ছা বলুন তো দেখি! আল্লাহ পাক শুরু থেকেই জানতেন কিনা **قُرء** শব্দটি দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রাখবে। আর ইবনে মাসউদ ও য়ায়েদ রা. নামে দু’জন সাহাবী থাকবে, যারা মতভেদ করে একজন আরেকজনের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করবেন এবং এ মতভেদ ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী রহ.-এর মাঝেও বহাল থাকবে, আর যুগ যুগ ধরে তা চলতে থাকবে?

উত্তরে বলবেন, অবশ্যই জানতেন। তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন শব্দচয়ন করলেন না কেন, যাতে মতভেদের কোন সুযোগই থাকতো না? অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই বা কেন শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করে দিলেন না?

এভাবে হাদীসের ভাবার্থেও একাধিক সম্ভাবনা থাকে, যা খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানার পরও নিরসন করেননি। যেমন প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ؛ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ، فَلَمْ يُعْفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, (খন্দক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, কেউ যেন বনু কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামায না পড়ে। (অনেকে সময়মত পৌঁছে গেলেন। তবে) কিছু সাহাবা রাস্তায় থাকাবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। (এঁদের মাঝে মতভেদ দেখা দিলো যে, নামায কোথায় পড়া হবে) একদল বললেন, আমরা নামায বনু কুরাইযাতে গিয়েই পড়বো, (যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।) অন্যদল বললেন, আমরা নামায পড়ে গন্তব্যে পৌঁছাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য (দ্রুত পৌঁছানো) নামায কাযা করা নয়। অবশেষে এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি কাউকেই ভৎসনা করেননি।”^{৭৪}

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فصلت طائفة إيماناً واحتساباً، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً.

“যারা পথে নামায পড়েছেন তারাও রাসূলের প্রতি ঈমানের কারণে সাওয়াবের নিয়তে নামায আদায় করেছেন। আর যারা কাযা করেছেন তারাও একই কারণে কাযা করেছেন।”^{৭৫}

যাই হোক, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ হাদীসের মর্ম স্থির করতে মতভেদ হয়েছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানার পরও এ মতভেদ দূর করেননি, কোন দলকেই কিছু বলেননি। তাছাড়া প্রথমে বলার সময়ও এমন বাক্য বলেননি কেন, যাতে মতভেদের সুযোগই না থাকতো।

এভাবে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করার পক্ষে যেমনি সহীহ হাদীস রয়েছে, তেমনি না করার পক্ষেও সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ না করার হাদীসটিকে

^{৭৪} বুখারী, হাদীস নং ৪১১৯।

^{৭৫} মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ৫/৩৭০, দালাইলুন নুবুওয়্যাহ, বায়হাকী ৪/৯।

ইমাম তিরমিযী, ইবনে হাযম যাহেরী, ইবনুল কাত্তান, সুয়ূতী ও আহমদ শাকের রহ. প্রমুখ সহীহ ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন।^{৭৬} এছাড়া আরো সহীহ হাদীস তো রয়েছেই।^{৭৭}

আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর রা., হযরত আলী রা., ইবনে মাসউদ রা. ও ইবনে ওমর রা.-সহ অনেকের আমল ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ না করার পক্ষে। তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম শা’বী, ইব্রাহীম নাখারী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক (নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে), আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইবনে আবী লায়লা রহ. প্রমুখসহ অনেকে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ না করার মত দিয়েছেন।^{৭৮}

তাহলে বলুন দেখি! ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ বিষয়ে একাধিক দলিল বা মতভেদ সৃষ্টিকারি দু’ধরনের হাদীস ও আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেল কেন? অথবা এর কোন মিমাংসা তিনি করে গেলেন না কেন? আর সাহাবায়ে কেরাম উক্ত মতভেদ দূর করতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বা এ বিষয়ে সবাই এক হলেন না কেন? এবং তাঁদের পরবর্তীরা সবাইকে এক মাযহাব কিংবা এক মত ও পথের অনুসারী বানিয়ে গেলেন না কেন?

যদি বলা হয়, এখানে একটি পদ্ধতি সঠিক আর অপরটি বেঠিক। তাহলে তো বলতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কখনো সঠিক পথের রাহবারী করেছেন, কখনো (নাউযুবিল্লাহ) উল্টো পথ দেখিয়েছেন। আর কিছু সাহাবা ছিলেন সঠিক পথের অনুসারী আর কিছু ছিলেন বিপথগামী। এটি এমন এক ভ্রান্ত কথা, যা পরিষ্কার কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা পরিপন্থী।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যন্নিয়্যাত বা এ প্রকারের মতভেদ বিলুপ্ত করতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ কিংবা সবাইকে এক মাযহাবের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করা ভুল। এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইচ্ছার পরিপন্থী এবং সাহাবা ও পরবর্তীদের কর্ম বিরোধী।

আবার এটি বাস্তবতারও পরিপন্থী। এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।

^{৭৬} তিরমিযী ১/৫৯, আশরাফিয়া দেওবন্দ, আল-আরফুশ শাযী ১৩২।

^{৭৭} দেখুন, নায়সুল ফারকাদাইন, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.।

^{৭৮} নাছবুর রায়াহ ১/৩৯৪, মাআরিফুস সুন্নাহ ২/৪৬৪।

দ্বিতীয় প্রকার দলিলের ক্ষেত্রে মতভেদের হুকুম ও শরীয়তের মূলনীতি

প্রথমে আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন, اختلاف বা মতানৈক্য তিন প্রকার। যথা :

ক. الاختلاف بين الكفر والإسلام তথা ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংঘাত।

খ. الاختلاف النظري দর্শন ও আদর্শের মতবিরোধ।

গ. الاختلاف الاجتهادي ইজতিহাদী বা গবেষণাকেন্দ্রিক মতভিন্নতা।

প্রথম প্রকার : ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংঘাত মানবজাতির সূচনাকাল থেকে সকল নবী-রাসূলের যুগেই ছিলো। এ দুইয়ের মাঝে কোন্টি সঠিক তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই।”^{৭৯}

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

“যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না। আখেরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”^{৮০}

সুতরাং ইসলামই কেবল আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্ম। ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরের বিরোধিতা হল, প্রভুর মনোনীত সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংঘাত।

উল্লেখ্য, ইসলামের বিপরীত যত ধর্ম বা মতবাদ রয়েছে, সবই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তারা ইসলামের নাম ও লেবেল ব্যবহার করুক, যথা কাদিয়ানী ও শীয়া; অথবা না করুক, যেমন ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও

^{৭৯} সূরা আলে-ইমরান ১৯।

^{৮০} আলে-ইমরান ৮৫।

নাস্তিক ইত্যাদি। কেননা এরা সবাই নিঃসন্দেহে ইসলাম থেকে খারেজ; এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: ‘ইখতিলাফে নযরী’ তথা দর্শন ও আদর্শের মতবিরোধ। এটি ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র বিপরীত আকীদা ও আমল গ্রহণের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রা., ওমর রা.- এর যুগে এবং ওসমান রা. এর শুরু যুগে ‘ইখতিলাফে নযরী’ বা মতাদর্শের ইখতিলাফের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হযরত ওসমান রা. এর খিলাফতের শেষ যুগে এর উদ্ভব ঘটে।

উল্লেখ্য, মতাদর্শের ইখতিলাফ সাহাবাদের শেষ যুগে মাথাচাড়া দিলেও কোন সাহাবী তাতে জড়িত হননি। আর সাহাবাদের পরস্পরের মাঝে যে ইখতিলাফ দেখা যায়, (যেমন, জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিক্কা) এগুলো তৃতীয় প্রকার তথা ইজতিহাদী ইখতিলাফের পর্যায়ভুক্ত ছিল।

ইসলামের মধ্যে মতাদর্শের ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম দুটি দল আত্মপ্রকাশ করে, রাফেযী ও খারেজী। এরপর মু’তাজিয়া, মুরজিয়া ও জাহমিয়া এবং বর্তমানে বেরেলভী বা রেজভী ও মওদূদী ইত্যাদি।

আর মতাদর্শের ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে যে অনেক মতভেদ দেখা দিবে এবং বিভিন্ন দল-উপদল তৈরী হবে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। সাথে সাথে কোন্ দল সঠিক পথের পথিক হবে এবং তখন কাদেরকে অনুসরণ করতে হবে, তাও তিনি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন। হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“আমার পর তোমাদের যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমাদের জন্য তখন জরুরী হলো, আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে মজবুত করে ধরবে। আর নিত্য-নতুন কাজ থেকে দূরে থাকবে। কারণ (ইবাদতের ক্ষেত্রে) সকল নতুন কাজ বিদআত। আর সকল বিদআত হল গোমরাহী।”^{৮১}

‘তিরমিযী’ শরীফের হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ... وَإِنْ بَنَى إِسْرَائِيلُ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিলো। আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। কিন্তু সব দলই জাহান্নামী, শুধু একদল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত (তথা জান্নাতী)। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত (ও জান্নাতী) দল কোন্টি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের মত ও পথের পথিক হবে।”^{৮২}

رواه الترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح. والحاكم (٣٢٩) وقال: حديث صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي. والبيهقي (١٠٢) وقال: حديث حسن. وقال أبو نعيم في "المستخرج" ٣٦/١: هذا حديث جيد من حديث الشاميين، وهو وإن تركه الإمامان البخاري ومسلم فليس ذلك من جهة إنكارٍ منهما له؛ فإنهما قد تركا كثيرا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب. اهـ. وكذا نقل عنه ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم" ١١٠/٢، وقال: وخرجه ابن ماجه أيضاً وهذا في الظاهر إسناده جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون. اهـ.

^{৮২} তিরমিযী ২৬৪১; মুসতাদরাকে হাকিম ৪৪৪, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য।

أخرجه الترمذي وغيره من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقال: حديث حسن غريب مفسر. وقد نقل ابن الجوزي في "تليس إبليس"، وابن القيم في "حاشيته على أبي داود"، والعراقي في "تخريج الإحياء"، والسخاوي في "الأجوبة المرضية"، والرُّباعي في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار"، والباركفوري في "تحفة الأحوذى" تحسین الترمذي له. وأيضاً قد نقله القرطبي في تفسيره، ثم قال: قال أبو عمر (ابن عبد البر): والإفريقي ثقة، وثقة قومه وأئنا عليه، وضعفه آخرون. اهـ.

وقبله وثقه يحيى القطان في روايتين - ابن راهويه وأبي زرعة - عنه، وسحتون، وأحمد بن صالح فقال: من تكلم في ابن أنعم فليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات. والبخاري يقوي أمره، وقال: هو مقارب الحديث، وقد ضعفه آخرون. (ينظر: تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب في ترجمته).

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: إنه ثقة، ومن ضعفه فلا حجة له... وقد صحح روايته في موضع آخر. انظر: الترمذي بتحقيقه (١٤٣/١، ٣٨٦). وقال المحقق الشيخ عوامة حفظه الله في حاشية "الكاشف" (٢٥٢/٣) بعد ما نقل «وفي التقريب ضعيف في حفظه»: وهذا اشتهر الرجل، ولا ينبغي إطلاق ذلك عليه... اهـ.

وقال الهيتمي: عبد الرحمن بن زياد اختلف في الاحتجاج به. (مجمع الزوائد ٢/٢١٨). فهو مختلف فيه. قال المنذري في مقدمة "الترغيب" والسيوطي في "التدريب": حديث "المختلف فيه" حسن. اهـ. فابن القطان حسن حديث عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، كما في التهذيب (٢٦٠/٥) وحسن الذهبي حديث شهر بن حوشب، كما في "ديوان الضعفاء" (ص ١٨٩) بعد أن قالاهما مختلف فيهما.

অন্য হাদীসে হযরত মুআবিয়া রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইরশাদ নকল করেন,

وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ -، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

“এই উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ নিজস্ব খেয়াল-খুশির অনুসারী বিভিন্ন দলে। এক দল ছাড়া সবগুলো যাবে জাহান্নামে। আর সেটি হচ্ছে ‘আল-জামাআহ’।”^{৮৩}

সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতী দলটির নাম হল, ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. শেযোক্ত দুই হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة.

“মুক্তিপ্রাপ্ত দলটিকে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ বলা হয়।”^{৮৪}

হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. (ম্. ৭৭৪ হি.) লিখেন,

وأيضا إنما أنكروا على ابن أنعم الأحاديث الغرائب التي يحى بها، كما في "طبقات علماء إفريقية" للقيرواني وفي "الميزان" للذهبي، ذكرا في ترجمته، وليس هذا الحديث منها. ولهذا يميل القلب إلى حسن هذا السند.

على أن له شاهدا رواه الطبراني في "الصغير" (٧٢٤)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (٢٧٣٣). وأيضا رواه أسلم في "تاريخ واسط" (ص ١٩٦) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء" (٦٥٩/٢)، والجورقاني في "الأباطيل والمنكير والصحيح والمشاهير" (٢٨٣) وقال: هذا حديث عزيز حسن مشهور، ورواته كلهم ثقات أثبات، كأنهم بدور وأقمارا اهـ. جميعهم من طريق عبد الله بن سفيان المدني، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ثم ساق الحديث... وقال: ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الإفريقي. اهـ. وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (١٨٩/١) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. وليس في النسخة الموجودة عندنا، فلعله في بعض نسخه. فلم يذكر فيه أحد تعديلا إلا ابن حبان على ما قاله الهيثمي؛ ولا جرحا إلا العقيلي. وعلى كل حال فالحديث حسن، كما قال الترمذي ومن تبعه. والله أعلم.

^{৮৩} মুসনাদে আহমদ ১৬৯৩৭, আবু দাউদ ৪৫৯৭, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

أخرجه الحاكم (٤٠٧) وقد صححه، ووافقه الذهبي. قال ابن تيمية في "الاقتضاء" ١٣٧/١: هذا حديث محفوظ. وجودة الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ٢٣٠/٣. وحسن إسناده الحافظ ابن كثير في "النهاية في الفتن" ٢١/١ والحافظ ابن حجر في "الكافي الشاف" ص ٦٣.

^{৮৪} মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/৩৪৫।

وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيما بينهم على نحل، كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رَوَاهُ الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية منهم، فقال: "ما أنا عليه [اليوم] وأصحابي".

“এই উম্মতও পরস্পরে ইখতিলাফ করে অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে। সবগুলো গোমরাহ একটি দল ছাড়া। আর সেটি হচ্ছে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’। যারা কুরআন-সুন্নাহকে শক্তভাবে ধরে এবং সাহাবা-তাবিয়ীন ও ইমামগণের পথকে আঁকড়ে ধরে।...”^{৮৫}

‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ নামটি নতুন কোন নাম নয়। সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে চলে আসছে। সূরা আলে-ইমরানের ১০৬ নং আয়াত হল, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ.

অর্থাৎ “কেয়ামতের দিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কতক চেহারা কালো হবে।”

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

“আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ মুখ কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল হবে, আর আহলুল বিদআহ ওয়াল ফুরকার চেহারা কালো হবে।”^{৮৬}

সারকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিভিন্ন মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং এত দল-উপদলের জন্ম হয়েছে। আর কোন্ দলটির অনুসরণ করলে মুক্তি মিলবে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং “ইসলামে এত দল কেন, আমরা কোন্ দিকে যাব?” এ ধরনের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য, আলোচিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের মতানৈক্যকারীরাও নিজেদের ধর্ম বা মতাদর্শের দলিল-প্রমাণ কুরআন-হাদীস থেকেই দিয়ে থাকে, যদিও তা অশুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ পাক বলেন,

^{৮৫} তাফসীরে ইবনে কাছীর ৬/৩৩৩।

^{৮৬} দেখুন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীর, কুরতুবী, শাওকানীর ফাতহুল কাদীর এবং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাবসমূহে অনেক স্থানে রয়েছে।

{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} أي: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم

يحبسون أنفسهم مهتدون. قاله ابن كثير في تفسيره.

“প্রতিটি দল নিজেদের (ভ্রান্ত) ধারণা মতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তা নিয়েই উৎফুল্ল।”^{৮৭}

অর্থাৎ ভ্রান্ত দলগুলো নিজেদের গোমরাহী নিয়েই উৎফুল্ল। কেননা তাদের ধারণা মতে তারা হেদায়তপ্রাপ্ত।

তৃতীয় প্রকার : ইজতিহাদী বা গবেষণাকেন্দ্রিক মতানৈক্য। এটি সাধারণত শাখাগত আমল সংক্রান্ত বা ফুরূয়ী মাসায়েলে হয়ে থাকে। এ ইখতিলাফ বা মতানৈক্যের অস্তিত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের যুগে ছিলো। বরং পূর্ববর্তী নবীদের মাঝেও এমন ইখতিলাফ হয়েছে। যেমন দাউদ ও সুলাইমান আ. পিতা-পুত্রের মাঝে হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা আশ্বিয়ার ৭৮-৭৯ নং আয়াতে

{وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ وَكُنَّا

لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَمًا}

তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সুলাইমান আ. এর ইজতিহাদ যে আল্লাহ তাআলার মানশা মোতাবেক ছিল, সেদিকেও ইশারা করেছেন। তবে পিতা-পুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন।

যেমন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. আয়াতদ্বয় উল্লেখ করে বলেন,

فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة فخص الله أحدهما بالفهم وأثنى

على كل منهما.

এ দুই (দাউদ ও সুলাইমান আ.) সম্মানিত নবী একটি বিষয়ে (দুই রকম) ফায়সালা করেছেন। আল্লাহ পাক একজনকে সঠিক বুঝ দান করেছেন। তবে উভয়ের প্রশংসা করেছেন।^{৮৮}

এখানে ইজতিহাদের মতপার্থক্য হয়েছে, মতপার্থক্যের কারণে কারো নবুওয়াত চলে যায়নি, বরং উভয়ের প্রশংসা করেছেন।

অনুরূপভাবে এ ইখতিলাফ বা মতানৈক্যের অস্তিত্ব ও স্বীকৃতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানাও ছিলো, সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীদের যুগেও হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

^{৮৭} সূরা মুমিনুন ৫৩ ও সূরা রুম ৩২।

^{৮৮} মাজমুউল ফাতাওয়া ২০/২২৪।

ইজতিহাদী ইখতিলাফের স্বীকৃতি :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ ইখতিলাফের অস্তিত্ব ও স্বীকৃতির অনেক প্রমাণ রয়েছে। তিনি ইজতিহাদী ইখতিলাফ বা গবেষণাকেন্দ্রিক মতানৈক্যের দুইভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যথা :

ক. আমলী স্বীকৃতি। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া ইজতিহাদী ইখতিলাফ সমূহকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। তন্মধ্যে বনু কুরাইযায় পৌঁছে আসরের নামায পড়ার বিষয়ে দুই দল সাহাবার মতানৈক্যের হাদীসটি কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এতে তিনি মতানৈক্যকারী কোন পক্ষকেই কিছুই বলেননি। এ ছাড়াও অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রমাণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদী ইখতিলাফকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, হাদীসের কিতাবসমূহে এর বর্ণনা রয়েছে।

খ. কিয়ামত পর্যন্ত ইজতিহাদী ইখতিলাফের স্বীকৃতির ঘোষণা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নববী যুগের ইখতিলাফকেই স্বীকৃতি দেননি, বরং কিয়ামত পর্যন্ত ইজতিহাদী ইখতিলাফের অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ: فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ: فَلَهُ أَجْرٌ».

“আমর ইবনুল আস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ফায়সালাকারী ব্যক্তি যদি ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, তাহলে তার জন্য দুটি আজর ও প্রতিদান রয়েছে। আর যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে, তবে তার জন্য একটি প্রতিদান।”^{৮৯}

এ হাদীসে স্পষ্ট ঘোষণা হয়েছে, ইজতিহাদ সাওয়াব লাভের কারণ। যোগ্য ব্যক্তি ইজতিহাদে ভুল করলেও তাকে একটি সাওয়াব দেয়া হবে। এভাবেই ইজতিহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

অনুরূপ সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগেও ইজতিহাদী ইখতিলাফ ছিল।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন,

ولم يزل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين يؤم بعضهم بعضا مع أنهم يختلفون في الفروع.

“সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ ফুরু’ বা আমল সংক্রান্ত মাসায়েলে ইখতিলাফ করেছেন এবং একে অপরের পিছনে নামাযও পড়েছেন।”^{৯০}

সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ বিন বায রহ. বলেন.
فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا، لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله.

“সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী আলেমগণ আমল সংক্রান্ত মাসায়েলে মতভেদ করেছেন। কিন্তু এই মতভেদ তাঁদের মাঝে বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করেনি। কেননা তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল দলিলের আলোকে হক ও সত্যকে জানা ও চেনা।”^{৯১}

এ সম্পর্কে সাহাবা ও তাবেয়ীনের ফাতাওয়া সমৃদ্ধ হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ এবং আল-ফিকহুল মুদাল্লাল ও মুকারানের কিতাবসমূহে ভরপুর দলিল ও আলোচনা রয়েছে। আমরা শুধু আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবী ভাইদের আস্থার জন্যই উক্ত দুই মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরেছি।

ইজতিহাদী ইখতিলাফের হুকুম ও করণীয়:

আমরা উপরে এ কথা জেনে এসেছি যে, ইজতিহাদ এর ক্ষেত্র হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার দলিল তথা যন্নিয়াত। আর দলিল যন্নিয়াত থেকে হওয়াটাই ইজতিহাদী ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য বা ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব হওয়ার মূল কারণ। কেননা ইজতিহাদ এর সুযোগ থাকলে যে ইখতিলাফ ও ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব হবেই এ কথা বুঝার জন্য তেমন বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

আর ইজতিহাদী ইখতিলাফের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম হচ্ছে, এখানে দলিলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে, যেমনটি মুজতাহিদগণ ও মাযহাবের ইমামগণ করেছেন। কিন্তু একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ।

^{৯০} মুখতাছারুল ফাতাওয়াল মিছরিয়া পৃ. ৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

^{৯১} মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায, ১১/১৪২।

আমরা ‘আসবাবু ইখতিলাফিল আইম্মা’ ও ‘আদাবুল ইখতিলাফ’ বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারব যে, এ প্রকারের মতভেদকে ‘ইখতিলাফে মুবাহ’ বা ‘শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদ’ বলা হয়। যার প্রেরণা দলিলের অনুসরণ। স্বয়ং দলিলই যার উৎস। যা নিন্দিত নয়, বরং নন্দিত। আযাব নয় রহমত।

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহ. শরীয়তের মূলনীতি উল্লেখ করে বলেন,
 وَقَاعِدُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ: أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنَ
 الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، إِذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛
 بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ، كَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَفِي نَوْعِي الْأَذَانِ التَّرْجِيعِ
 وَتَرْكِهِ، وَنَوْعِي الْإِقَامَةِ شَفْعِهَا وَإِفْرَادِهَا.

وَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْإِسْتِفْتَاخَاتِ وَأَنْوَاعِ الْإِسْتِعَاذَاتِ،
 وَأَنْوَاعِ الْقِرَاءَاتِ، وَأَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ الزَّوَائِدِ، وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَسُجُودِ
 السُّهُوِّ، وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ، وَالتَّحْمِيدِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا، وَغَيْرِ
 ذَلِكَ؛ لَكِنْ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ هَذِهِ الْمَأْثُورَاتِ وَيُفْضَلُ عَلَى بَعْضٍ، إِذَا قَامَ دَلِيلٌ
 يُوجِبُ التَّفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ الْآخَرُ.

“এক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধিক সঠিক নীতি হলো, ইবাদতের বিষয়ে একাধিক পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় পাওয়া গেলে কোনোটাকেই মাকরুহ বলা যাবে না, বরং সবগুলোই শরীয়তসম্মত। যেমন সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানে তারজী’ হবে কি হবে না, ইকামতের শব্দাবলী একবার বা দু’বার উচ্চারণ করা, তাশাহুদের বিভিন্ন প্রকার, নামাযের শুরুতে পড়ার বিভিন্ন দুআ, কুরআন মজিদের বিভিন্ন কিরাত, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের বিভিন্ন নিয়ম (যেমন ছয় বা বার), জানাযার নামায, সিজদা সাহ ও রুকুর আগে-পরে কুনুত পড়ার বিভিন্ন तरीকা এবং রাব্বানা লাকাল হামদ বা রাব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ ইত্যাদি সব বিষয়ে আমরা এটাই বলে থাকি। তবে কখনো কোনো একটি নিয়ম মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দলিলের কারণে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও অপরটিকে মাকরুহ বলা হয় না।”^{৯২}

তিনি এ প্রকার মতভেদ সম্পর্কে ‘ইকতিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকিম’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন,

وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد؛ لكن الدم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغى.

“আর এ প্রকার মতভেদ, যাকে আমরা ‘ইখতিলাফে তানাওউ’ বা ‘দলিলের বিভিন্নতার কারণে মতভেদ ও মতভিন্নতা’ বলি, এতে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রত্যেক পক্ষ সঠিক। কিন্তু এ প্রকার মতভেদের ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি সেটা নিন্দিত। কেননা কুরআন থেকে বুঝে আসে যে, এ ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই প্রশংসনীয়, যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি না করে।”^{৯৩}

তাদের প্রিয় শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,
 إِنَّ أَكْثَرَ صُورِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لَا سِمْمَا فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا
 أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ فِي الْجَانِبَيْنِ، كَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، وَنِكَاحِ
 الْمُحْرَمِ، وَتَشْهَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْإِخْفَاءَ بِالْبِسْمَةِ، وَبِأَمِينٍ، وَالْإِشْفَاعَ
 وَالْإِيتَارَ فِي الْإِقَامَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

وَكَانَ السَّلَفُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَصْلِ الْمَشْرُوعَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ خِلَافُهُمْ فِي أَوَّلِي
 الْأَمْرَيْنِ. وَنَظِيرُهُ: اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ فِي وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ. وَقَدْ عَلَّلُوا كَثِيرًا مِنْ هَذَا
 الْبَابِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفُونَ وَأَنَّهُمْ جَمِيعًا عَلَى الْهُدَى؛ ...

وَالَّذِي يَرَوِي عَنِ السَّلَفِ مِنْ تَأْكِيدِ الْأَخْذِ بِمَذْهَبِ أَصْحَابِهِمْ، وَأَلَّا يُخْرَجَ
 عَنْهَا بِحَالٍ؛ فَإِنْ ذَلِكَ إِمَّا لِأَمْرِ جَبَلِيٍّ؛ فَإِنْ كُلُّ إِنْسَانٍ يَحِبُّ مَا هُوَ مُخْتَارُ أَصْحَابِهِ
 وَقَوْمِهِ حَتَّى فِي الزِّيِّ وَالْمَطَاعِمِ، أَوْ لَصَوْلَةِ نَاشِئَةٍ مِنْ مُلَاحِظَةِ الدَّلِيلِ، أَوْ لِنَحْوِ ذَلِكَ
 مِنَ الْأَسْبَابِ فَظَنُّهُ الْبَعْضُ تَعْصِبًا دِينِيًّا حَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ.

“ইমামদের মাঝে অধিকাংশ মতভেদ উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। বিশেষত যে সকল বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ ছিল, যেমন ইকামত, তাশাহুদ, তাকবীরে তাশরীক, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর (ছয়

বা বার), বিসমিল্লাহ ও আমীন আস্তে বলা এবং ইকামতের শব্দাবলী নিয়ে মতভেদ। এ সবই উত্তম-অনুত্তম নিয়ে।”

তিনি আরো বলেন, “তঁারা উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেক পদ্ধতি বৈধ ও শরীয়তসম্মত কিনা- এ নিয়ে মতভেদ করেননি, বরং তাঁদের মতভেদ ছিল কোন্ পদ্ধতি উত্তম, তা নিয়ে। কেননা তঁারা মনে করতেন, এ মতভেদ কুরআন মাজিদের বিভিন্ন কীরাতের পাঠের মতভেদের মতো। তঁারা বলতেন, এগুলোর অনেক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও মতভেদ ছিল। অথচ তঁারা সবাই হেদায়তপ্রাপ্ত ছিলেন।”

অতঃপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “যে সমস্ত পূর্ববর্তীগণ তাঁদের অনুসৃত পথই আঁকড়ে ধরতে বলতেন, এটা তো একটি স্বাভাবিক বিষয়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি আকাংখা করে যে, তার ও তার আপনজনদের প্রিয় বস্তু সবাই গ্রহণ করুক এমনকি খানা-পিনা ও লেবাস-পোষাকসহ সর্বক্ষেত্রে। অথবা অন্য কোন কারণে আঁকড়ে ধরতে বলতেন। অথচ কেউ কেউ ধারণা করল যে, এটি তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামি। মাআযাল্লাহ।”^{৯৪}

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রহ. কে (মৃত্যু ১০৬ হি.) যোহর ও আসরের নামাযে ইমামের পিছনে মুজাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন-

إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُسْوَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ.

“তুমি যদি পাঠ কর, এর স্বপক্ষে বহু সাহাবার মত রয়েছে। আর যদি পাঠ না কর, এতেও অনেক সাহাবার অভিমত রয়েছে।”^{৯৫}

প্রখ্যাত মুহাক্কিক আব্দুল হাই লাখনভী রহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন, সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে সাহাবা ও তাবিয়ীগণের যুগে মতভেদ ছিল। এ কারণেই পরবর্তী ইমামগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে। তবে যার কাছে যে দলিল ও মতটি অগ্রগণ্য মনে হয়েছে, তিনি তা গ্রহণ করেছেন।^{৯৬}

আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক ইমাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ. (মৃ. ১৩০৭ হি.) “নুয়ুলুল আবরার” গ্রন্থে লিখেন,

وقد وردت الأدلة في الجانبين. وقال في موضع آخر: وإن كان يجوز الخفض.

^{৯৪} আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ পৃ. ১০৮-১০৯।

^{৯৫} আল-ইসতিযকার, ইবনে আদিল বার ১/৪৭১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

^{৯৬} আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ : ১/৪১৪, দারুল সুন্নাহ ও দারুল কলম।

“আমীন জোরে ও আস্তে বলা- উভয় দিকে দলিল রয়েছে।”

অন্যস্থানে বলেন, “যদিও আমীন আস্তে বলা জায়েয।..”^{৯৭}

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী রহ. (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন,
والصواب: أن الخبرين بالجمهور بها والمخافتة صحيحان، وعمل بكل من فعله
جماعة من العلماء، وإن كنت مختاراً خفض الصوت بها؛ إذ كان أكثر الصحابة
والتابعين على ذلك.

“সঠিক কথা হচ্ছে, আমীন জোরে ও আস্তে উভয় ধরনের হাদীসই
সহীহ। উভয় পদ্ধতিতে ওলামায়ে কেরামের একদল আমল করেছেন।
তবে আমার নিকট আস্তে ও অনুচ্চস্বরে আমীন বলা পছন্দনীয়। কেননা
অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী আমীন আস্তে বলতেন।”^{৯৮}

লা-মাযহাবী বন্ধুদের মান্যবর ইমাম আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী রহ.
(মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

فلما صح أنه - عليه السلام - كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة
الإحرام ولا يرفع، كان كل ذلك مباحاً لا فرضاً، وكان لنا أن نصلي كذلك، فإن
رفعنا صلينا كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وإن لم نرفع
فقد صلينا كما كان - عليه السلام - يصلي.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেহেতু তাকবীরে
তাহরীমার পর ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করা- না করা উভয় পদ্ধতিই বিশুদ্ধভাবে
প্রমাণিত, কাজেই কোন পদ্ধতিই ফরয নয়, বরং মুবাহ মাত্র। আমাদের
উচিত নামাযের সময় কোন একটাকে গ্রহণ করা। কেননা আমরা যদি
‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করি, এটাও নবীজীর নামায। আর যদি ‘রাফয়ে
ইয়াদাইন’ না করি, তাও নবীজীর নামায।”^{৯৯}

^{৯৭} নুযুলুল আবরার, সিদ্দীক হাসান খান পৃ. ১৪৭ ও ৮২, দারুল মা'রিফা- বৈরুত।

^{৯৮} শরহে বুখারী, ইবনে বাত্তাল ২/৪০০; আল-জাওহারুন নাকী ফীর-রাদি আলাল বায়হাকী, ইবনুত
তুরকুমানী ১/১৩২, দায়িরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৬ হি.; নুযুলুল আবরার,
নবাব সিদ্দীক হাসান খান পৃ. ৮২, দারুল মা'রিফা- বৈরুত।

^{৯৯} আল-মুহাদ্দা ৩/২৩৫, ইদারাতুত তিবাআতিল মুনীরিয়া, মিসর।

ইজতিহাদী মাসআলাকে কেন্দ্র করে নিন্দা-ভর্ৎসনা ও ঝগড়া-বিবাদ
নিষিদ্ধ, বরং পরস্পর মুহাব্বত থাকা অপরিহার্য:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في
الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك.

“সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি ছিল। যদিও তাঁরা
নামায, হজ ও তালাক সহ অনেক মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন।”^{১০০}

অন্যত্র তিনি কিছু ইজতিহাদী মাসআলা উল্লেখ করে বলেন,

فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة، فكل منهم أقر الآخر
على اجتهاده، من كان فيها أصاب الحق فله أجران، ومن كان قد اجتهد فأخطأ
فله أجر، وخطؤه مغفور له.

“ইজতিহাদলব্ধ এ মাসআলাসমূহে সালাফ ও ইমামগণ মতানৈক্য
করেছেন। তবে একে অপরের ইজতিহাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যিনি সঠিক
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তিনি দুটি প্রতিদান পাবেন। আর যিনি ভুলের
শিকার হয়েছেন, তিনি একটি আজর পাবেন এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত।”^{১০১}

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন,

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر.

“ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে কেউ যদি কোন আলেমের মত ও
মাযহাব অনুসারে আমল করে, তার নিন্দা করা যাবে না এবং বিভক্তি সৃষ্টি
করা যাবে না।”^{১০২}

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর শাগিরদ ও লা-মাযহাবীদের অনুসরণীয়
ব্যক্তিত্ব ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে বলেন,

وَهَذَا مِنَ الْاِخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يُعَنَّفُ فِيهِ مَنْ فَعَلَهُ وَلَا مَنْ تَرَكَهُ، وَهَذَا
كَرَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرَكَهُ، وَكَانَ خِلَافَ فِي أَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ.

^{১০০} মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/২৫২।

^{১০১} প্রাণ্ড ২০/২৯২।

^{১০২} প্রাণ্ড ২০/২০৭।

“নামাযে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করা- না করা, তাশাহুদে বিভিন্ন প্রকার নিয়ে মতভেদ, আযান-ইকামতের বিভিন্ন প্রকার এসব মতভেদের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কোন পক্ষই নিন্দা ও ভৎসনার পাত্র নন।”^{১০০}

কারো কারো ধারণা, ‘মতভেদ শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং মুহাব্বতের অবসান ঘটায়’ এটা অবাস্তব ধারণা মাত্র। কারণ সাহাবায়ে কেরাম এবং ইমামগণ ফুরূযী বিধানে মতানৈক্য করেছেন। কিন্তু এ মতানৈক্য তাঁদের মাঝে শত্রুতা ও বিভক্তি সৃষ্টি করেনি।

যেমন শায়খ ইবনে বায রহ. বলেছেন,

وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان، ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق؛ لأن الأمة الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد، وقد وجد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة ابتداءً بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، ثم الإمام الشافعي رحمه الله، ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولم يحدث بينهم - رغم ذلك - شيء من الفتنة والفتنة، بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين يثني كل واحد منهم على الآخر ويقدمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلماء وإن اختلفت آرائهم في مسائل الفروع.

সারাংশ, “আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করুন! নিশ্চয় আপনারা অবগত আছেন যে, শাখাগত মাসায়েলে ফিকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে যে মতপার্থক্য তা নতুন নয়, বরং প্রাচীনকাল (সাহাবা যুগ) থেকে চলে আসছে। আর এই মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন রকম হিংসা-বিক্লেষ এবং বিভক্তি সৃষ্টি করেনি।...”^{১০৪}

ইমাম তাবারী রহ. (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন,

والخبر بالجمهور بآمين والمخافة بها صحيحان، وقد عمل بكل واحد منهما جماعة من علماء الأمة، وذلك يدل أنه مما خيروهم رسول الله في العمل بأي ذلك شاءوا، ولذلك لم ينكر بعضهم على بعض ما كان منهم في ذلك.

“আমীন জোরে ও আন্তে বলার উভয় হাদীসই সহীহ। উভয় পদ্ধতিতে ওলামায়ে কেরামের এক জামাআত আমল করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত

^{১০০} যাদুল মাআদ ১/২৬৬, মুআসাসাতুর রিসালা।

^{১০৪} মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৫/১৪৯।

হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত আমল একাধিক পদ্ধতিতে করার সুযোগ দিয়েছেন, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। এ কারণে তাঁরা এ বিষয়ে একে অপরের নিন্দা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি।”^{১০৫}

ইমাম ইবনে আদিল বার রহ. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) আহমদ ইবনে খালেদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে,

كَانَ عِنْدَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا: يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ... وَجَمَاعَةٌ لَا يَرْفَعُونَ إِلَّا فِي
الْأَحْرَامِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَمَا عَابَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى
هَؤُلَاءِ.

“আমাদের এখানে ওলামায়ে কেরামের এক দল ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে হাত উঠাতেন। আরেক দল ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ না করার হাদীস সামনে রেখে নামাযের শুরু ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না। কিন্তু প্রথম দল দ্বিতীয় দলের নিন্দা করতেন না, আর দ্বিতীয় দলও প্রথম দলকে দোষারোপ করতেন না।”^{১০৬}

রাবেতা আলমে ইসলামী এর ফিকহী বোর্ড এর সিদ্ধান্ত:

মক্কায় অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী সংগঠন “রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী” এর অঙ্গ সংগঠন “আল-মাজমাউল ফিকহী” (ফিকহী বোর্ড) এর দশম বৈঠক ২৪ শে সফর ১৪০৮ হি. শনিবার থেকে ২৮ শে সফর ১৪০৮ হি. বুধবার মোতাবেক ১৭ অক্টোবর ১৯৮৭ ইং থেকে ২১ শে অক্টোবর ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বোর্ডের “মাজাল্লাতুল মাজমায়িল ফিকহী” নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিনটির ১ বর্ষ ২য় সংখ্যায় ফিকহী বোর্ড স্বীকৃত একটি সনদ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত সনদে ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে মতভেদের ধরন ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সনদটি ইসলামী বিশ্বের বর্তমান যুগের প্রায় সব মাযহাবের বড় বড় ওলামা ও ফিকহী বোর্ডের সদস্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ম্যাগাজিনের ৫৯ পৃ. ও ২১৯ পৃ. ও তৎপরবর্তী আলোচনা নিম্নরূপ:

إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان:

أ. اختلاف في المذاهب الاعتقادية. ب. واختلاف في المذاهب الفقهية.

^{১০৫} শরহে বুখারী, ইবনে বাত্তাল (মৃ. ৪৪৯) ২/৪০০ ও নুয়ুলুল আবরার, নবাব সিদ্দীক হাসান পৃ. ৮২।

^{১০৬} আল-ইসতিযকার ৪/১০১।

فأما الأول، وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة، جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة، الذي يمثل الفكر الإسلامي، النقي السليم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة، التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ».

“মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক মতবিরোধ সাধারণত দু'ধরনের-

১. আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবিরোধ।

২. মাসআলা-মাসায়েল বা ফিকহী মাযহাব সংক্রান্ত মতবিরোধ।

প্রথমোক্ত মতবিরোধ মুসলিম বিশ্বের জন্য এক মহাবিপদ, যা মুসলমানদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে এবং মুসলিম উম্মাহকে বহুধাবিভক্ত করছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এমন মতবিরোধ না হওয়া আবশ্যিক। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকা উচিত, যা নবী যুগ ও খেলাফতে-রাশেদা যুগের নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইমলামী চিন্তার প্রতিচ্ছবি। খেলাফতে রাশেদার সুন্নাহ মূলত তাঁরই সুন্নাহ। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা-

তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরো।”

وأما الثاني: وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل، فله أسباب

علمية اقتضته، والله في ذلك حكمة بالغة. ومنها: الرحمة بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة، وثروة فقهية تشريعية، تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما، أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شئون العبادة، أم في المعاملات، وشئون الأسرة، والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية.

“দ্বিতীয় বিষয় হল, কিছু শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য, যার অনেক যুক্তিগ্রাহ্য ও শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এবং এতে আল্লাহর নিগূঢ় তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত আছে। যেমন বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং শরীয়তের উৎস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করার ক্ষেত্রে প্রশস্ত করা।

তাছাড়া এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত এবং প্রয়োগিক ফিকহ ও আইন শাস্ত্রের মূল্যবান সম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রদান করেছে। ফলে সেটি নির্ধারিত একটি শরয়ী হুকুমের আওতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোন অবস্থাতেই বের হওয়া যাবে না। বরং যখন কোন বিষয়ে কোন ইমামের মাযহাব উম্মতের জন্য সংকীর্ণতার কারণ হবে, তখন দলিলের আলোকে অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে। আর তা ইবাদত, মুআমালা, পরিবার, বিচার কিংবা অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে হতে পারে।”

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي.

فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون؛ لأن النصوص الأصلية، كثيرا ما تشمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، فلا بد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأحكام، وغرض الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الواقع، والنوازل المستجدة.

وفي هذا تختلف فهوم العلماء، وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.

ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج. فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي، الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله

بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظيمة، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية.

“অতএব দ্বিতীয় প্রকার তথা আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মাযহাবের মতপার্থক্য আমাদের দীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধিতাও নয়। এ ধরনের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। এমন কোন জাতি পাওয়া যাবে না, যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরনের ইজতিহাদী মতপার্থক্য নেই।

তাই বাস্তব সত্য হল, এ ধরনের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন শরীয়তের উৎসসমূহ (নুসূস) অনেক সময় একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে, অন্যদিকে সকল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা (নস) পাওয়া যায় না। কারণ শরীয়তের নির্দেশনা (নস) সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিত্য-নতুন সমস্যার কোন সীমা নেই। অতএব কiyাসের আশ্রয় নিয়ে হুকুমের ইল্লাত, বিধানদাতার উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের সাধারণ উদ্দেশ্যের আলোকে উদ্ভাবিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে।

এখানে এসেই মূলত: ওলামায়ে কেরামের বুঝ ও চিন্তার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং সম্ভাব্য বিষয় সমূহের কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সমাধান ও সিদ্ধান্ত আসে। অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য থাকে হক ও সত্যের অনুসন্ধান। অতএব, এক্ষেত্রে যার ইজতিহাদ সঠিক হবে সে দু’টি সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং যার ইজতিহাদ ভুল হবে, সে একটি সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর এভাবেই শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের মাধ্যম, সেটি দোষের কারণ হবে কেন? বরং এটি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ, যা মুসলিম উম্মাহের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى

بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصوّرون لهم

اختلاف المذاهب الفقهية هذا، كما لو كان اختلافًا اعتقاديًا، ليوحوا إليهم -

ظلمًا وزوراً - بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين

النوعين، وشتان ما بينهما.

ثانياً: وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها، أو بعضهم: ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها: ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس، ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً،
والحمد لله رب العالمين.

“কিছু দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলমান তরুণ বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু গোমরাহকারী লোক তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এ জাতীয় মতপার্থক্যকে আকীদার মতভেদের মত করে তুলে ধরে। এবং ইসলামী শরীয়াহর মাঝে বৈপরিত্ব দেখানোর চেষ্টা করে। অথচ এ দু’য়ের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

দ্বিতীয়ত যে শ্রেণির লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জন করার আহ্বান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে মানুষকে নতুন ইজতিহাদ ও মাযহাবের অনুসারী বানাতে চায়, তাদের কর্তব্য হল, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। এর মাধ্যমে মূলত: তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন এ জাতীয় অপ্রয়োজনীয় ও বিভক্তির দাওয়াত পরিহার করে ইসলামের শত্রুদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করা।”

সনদ ও রেজুলেশনটিতে যারা সাক্ষর করেছেন—

১. আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায, রঈস
২. ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ, নায়েবে রঈস
৩. মুহাম্মদ আশশাযিলী আননাইফার, সদস্য
৪. মুহাম্মদ আল-হাবীব ইবনুল খোজা, সদস্য
৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবায়িল, সদস্য

৬. আবুল হাসান আলী নদভী, সদস্য
৭. আবু বকর জুমী, সদস্য
৮. মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর, সদস্য
৯. সালেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান, সদস্য
১০. মুহাম্মদ মাহমুদ আসসাওয়াফ, সদস্য
১১. আব্দুল্লাহ আবদুর রহমান আল-বাসসাম, সদস্য
১২. মুস্তফা আহমদ আয-যারকা, সদস্য
১৩. মুহাম্মদ রশীদ রাগেব কাবানী, সদস্য
১৪. ড. আহমদ ফাহমী আবু সুন্নাহ, সদস্য
১৫. মুহাম্মদ সালেম ইবনে আব্দুল ওয়াদুদ, সদস্য।

আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ না করে পারছি না। তা হল, মরহুম শায়খ আলবানীও একটি মাসআলায় বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর সম্পর্কে দুটি মারফু' হাদীসকে সহীহ (পরিভাষায় হাসান) সাব্যস্ত করে বলেছেন,

والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة،

ولا داعي للتعصب والفرقة.

“সত্য কথা হচ্ছে, ছয় ও বার তাকবীর উভয় পদ্ধতিই বৈধ। যে পদ্ধতিই অনুসরণ করা হোক সুন্নাহ আদায় হয়ে যাবে। এখানে কোন পক্ষের গোঁড়ামী ও বিভেদের সুযোগ নেই।”^{১০৭}

আহ! মরহুম আলবানী সাহেব এখানে বিষয়টি যেভাবে বুঝে স্বীকার করেছেন এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, এভাবে যদি বাকিগুলো বুঝতেন, তাহলে নতুনভাবে ‘সিফাতুস সালাত’ লিখার এবং নতুন দাওয়াতের প্রয়োজন হত না। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

তাই তো হাদীস ও ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. কতইনা সুন্দর বলেছেন,

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه.

“মতানৈক্যপূর্ণ আমলের কোন এক পদ্ধতি যদি তোমার কাছে পছন্দনীয় হয়, আর তুমি যদি কাউকে অন্য পদ্ধতিতে আমল করতে দেখ, তাহলে তাকে নিষেধ করো না।”^{১০৮}

^{১০৭} সিলসিলায়ে সহীহা-৬/১২৬০-৬৪।

^{১০৮} হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম ৬/৩৬৮; আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/১৩৬।

সারকথা, মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য ও নামাযের পদ্ধতিতে মতভেদের কারণ, দ্বিতীয় প্রকার দলিল (যন্নিয়াত) থেকে হওয়া। যেমন সুন্নাহর বিভিন্নতা কিংবা বাহ্যবিরোধিতা। অর্থাৎ ইবাদতের একাধিক পদ্ধতি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগেও ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও প্রচলিত ছিল। কারণ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উভয় সুন্নাহ ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তীদের মাঝেও উভয়ের উপর আমল বিদ্যমান রয়েছে। আর এ ধারা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ কারণেই বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাযহাবকে নিন্দা করা বা মাযহাব অনুসরণকারীদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ।

সুতরাং কেউ বা কোন মাযহাবে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করলেও দোষের কিছু নেই। আবার না করলেও বলার কিছু নেই। একই হুকুম সুন্নাহ স্বীকৃত অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রেও। কেননা উভয় পক্ষে সুন্নাহ রয়েছে এবং সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তীদের আমল রয়েছে। এটাই শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদ।

তবে মতভেদের বিষয়টি এত উন্মুক্ত নয় যে, স্বেচ্ছাচারিতার অনুপ্রবেশ ঘটবে; যে কেউ মনগড়াভাবে শরীয়তের ব্যাখ্যা করতে পারবে। বরং এর সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে, যা ইমামগণ অনুসরণ করতেন। উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদের ক্ষেত্রে নিজ এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা

আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু সুন্নাহর অনুসরণ করা, তাই যে এলাকায় যে সুন্নাহ প্রচলিত এবং যে মসজিদে যে সুন্নাহ অনুসৃত, সেখানে তা-ই বহাল রাখা। ওই এলাকায়, ওই মসজিদে দ্বিতীয় সুন্নাহ ও পদ্ধতির অনুসরণের দাওয়াত দেওয়া ও আমল করা সালাফের তরীকার পরিপন্থী। কেননা এর দ্বারা এক সুন্নাহ দিয়ে অন্য সুন্নাহকে বাতিল করা হয় এবং একটিকে ‘নাহী আনিল মুনকার’ (যে কাজ করা নিষেধ) অপরটিকে ‘আমর বিল মা’রুফ’ (যা করা উচিত) এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। সর্বোপরি এতে ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। তাই সালাফ ও ইমামগণের নীতি ছিল, যেখানে স্বীকৃত সুন্নাহ ও পদ্ধতি চালু আছে তা আপন অবস্থায় বহাল রাখা, এর বিরোধিতা না করা।

ইমাম ইবনে আদিল বার রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন, আমার উস্তাদ আবু ওমর আহমদকে বললাম, আপনি নামাযের শুরু ছাড়া অন্য স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন বা হাত উঠান না কেন, যাতে আমরাও আপনার অনুসরণে হাত উঠাতাম। তিনি বললেন,

لَا أَخَالَفُ رَوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لَأَنَّ الْجَمَاعَةَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهَا
وَمُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا أُبَيِّحُ لَنَا لَيْسَتْ مِنْ شَيْمِ الْأَئِمَّةِ.

“ইবনুল কাসেম ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাফয়ে ইয়াদাইন বা হাত উঠানো শুধু নামাযের সূচনায় হবে। আমাদের এলাকার লোকজন এই বর্ণনা মোতাবেকই আমল করে থাকেন। আর যে বিষয়ে দুই পদ্ধতিই বৈধ, (যদিও উত্তম-অনুত্তম নিয়ে মতভেদ থাকে) তাতে লোকদের মাঝে প্রচলিত পদ্ধতির বিরোধিতা করা ইমামগণের নীতি ছিল না।”^{১০৯}

অনুরূপ আমাদের বাংলাদেশেও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, রাফয়ে ইয়াদাইন না করা ও জোরে আমীন না বলা ইত্যাদি। কাজেই এ সমস্ত পদ্ধতির বিরোধিতা করা উচিত নয়।

ইবনে আদিল বার রহ. আরো বলেন,

فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسؤلوك
منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر، وإن كان غيره مباحاً مرغوباً فيه.

“প্রত্যেক গোত্রের কর্তব্য হল, তাদের পূর্বসূরীদের তরীকা অনুসরণ করা। ভালো কাজের যে পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন, তাই অনুসরণ করা উচিত, যদিও অন্য পদ্ধতি অধিক পছন্দনীয় বা উত্তম হয়।”^{১১০}

সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ বিন বায রহ. বলেন,
إذا كان بين أناس لا يرفعون، ولا يجهرون بالتأمين، فالأولى أن لا يفعل تأليفاً
لقلوبهم،... وهو خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من قال: يجهر، ومنهم من قال: لا
يجهر بالتأمين،... وهو شيء مستحب، ويكون ترك أمر مستحباً، فلا يفعل مؤمن
مستحباً يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة، بل يترك المؤمن المستحب، والداعي إلى الله
عز وجل، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي ﷺ ترك هدم
الكعبة، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال: لأن قريشا حديثو عهد بكفر، ولهذا تركها
على حالها، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة.

^{১০৯} আল-ইসতিযকার ৪/১০১।

^{১১০} আল-ইসতিযকার ৪/১০২ ও আত-তামহীদ ৯/২২৩, ১/১০।

“যদি (কোন অঞ্চলে) লোকদের মাঝে রাফউল ইয়াদাইন না করা এবং আমীন জোরে না বলার প্রচলন থাকে, তবে সেখানে তাদের সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এগুলো না করাই উত্তম। এটি আহলে ইলমের মাঝে প্রসিদ্ধ মতানৈক্যপূর্ণ একটি বিষয়। তাদের কেউ আমীন জোরে বলার পক্ষে ছিলেন, আর কেউ ছিলেন আস্তে বলার পক্ষে। এটি তো একটি মুস্তাহাব বিষয়। কাজেই কেউ এটি ছেড়ে দিলে একটি মুস্তাহাব ছেড়ে দিল।

আর কোন মুমিনের জন্য এমন মুস্তাহাব কাজ করা শোভা পায় না, যার দ্বারা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট ও বিশৃঙ্খলা হতে পারে। বরং মুমিন ব্যক্তি ও দায়ী এমন মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দিবে, যা ছেড়ে দেয়াতে কোন বিশেষ উপকার থাকে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বাকে ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির উপর গড়েননি। কারণ তাতে কুরাইশের নব মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তির আশঙ্কা ছিল।”^{১১১}

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

إن الناس في صلاة الجنازة على قولين: منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. ومنهم: من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره... فإن السلف فعلوا هذا وهذا، وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم، كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وبغير قراءة.

كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها، وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح، وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين، وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة، وتارة يقرءون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرءون، وتارة يكبرون على الجنازة أربعاً وتارة خمساً وتارة سبعا، كان فيهم من يفعل هذا، وفيهم من يفعل هذا. كل هذا ثابت عن الصحابة. كما ثبت عنهم أن منهم: من كان يُوتر الإقامة، ومنهم: من كان يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي ﷺ.

“জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার বিষয়ে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। একটি হল কোনও অবস্থায় জানাযা নামাযে ফাতেহা পড়া যাবে না, যেমনটি অনেক সালাফ থেকে বর্ণিত। এটি ইমাম আবু হানীফা ও মালিক

রহ. এর মাযহাব। অপরটি হল জানাযাতে ফাতেহা পড়া হবে, যা ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসে রয়েছে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এর মাযহাব।... দু'ধরনের আমলই সালাফের মাঝে মশহুর ছিল। তাঁদের মাঝে কেউ জানাযায় ফাতেহা পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন না।

যেভাবে তাঁরা কখনও নামাযে বিসমিল্লাহ জোরে বলতেন, কখনও আস্তে। কখনও রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন, কখনও করতেন না।.. কখনও বা ইমামের পিছনে জোহর ও আসর নামাযে ফাতেহা পড়তেন, কখনও পড়তেন না। কখনও জানাযায় চার তাকবীর বলতেন, কখনও পাঁচ তাকবীর আবার কখনও বা সাত তাকবীর। তাঁদের মাঝে কেউ এটি করতেন আর কেউ অন্যটি করতেন। এগুলোর প্রত্যেকটিই সাহাবাদের থেকে প্রমাণিত। সাহাবাদের থেকে আরো প্রমাণিত যে,.. তাদের কেউ কেউ ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলতেন আর কেউ দুই বার করে বলতেন। আর উভয়টি রাসূল থেকে প্রমাণিত।”

অতঃপর তিনি বলেন,

فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة.

“সুতরাং এ সকল বিষয় যদিও একটি অপরটি থেকে উত্তম, তবুও যে ব্যক্তি অনুত্তমটি করল, সেও জায়েয কাজ করল। আর কখনও অনুত্তম কাজটি করা উত্তম হয়ে যায় কোনও বিশেষ কারণে। যেভাবে কখনও উত্তম কাজটি ছেড়ে দেয়া উত্তম হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কারণে।”^{১১২}

অন্যত্র তিনি কিছু ইজতিহাদী মাসআলা উল্লেখ করে বলেন,

ويُستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي ﷺ تغيير بناء البيت، لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه مُتَمًّا، وقال: "الخلاف شر".

وقال أيضا: ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد

إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك. ورأى أن مصلحة الاجتماع والاتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه - لما أكمل الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه وأنكر عليه، فقبل له في ذلك، فقال: - الخلاف شر؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائر المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك.

সারার্থ: “মানুষের জন্য উত্তম হলো, এ সকল মুস্তাহাব বিষয়কে বাদ দিয়ে হলেও তারা যেন একতার দিকে লক্ষ্য রাখে। কেননা ইসলামে ঐক্য-সম্প্রীতি রক্ষা করা মুস্তাহাব পালনের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের একতার দিকে লক্ষ্য করে কা’বা পুনঃনির্মাণ বর্জন করেছেন। এভাবে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ওসমান রা.-কে সফর অবস্থায় কসর না করার কারণে দোষারোপ করেছিলেন। আবার তিনি নিজেই ওসমান রা. এর পিছনে নামাযকে চার রাকাআত পূর্ণ করে এবং বলেছেন, (ইমামের) বিরোধিতা করা মন্দ কাজ।”

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, “ঐক্য-সংহতি রক্ষা করা এবং ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ‘উত্তম’টা ছেড়ে দিয়ে অনুত্তমটা করার সুযোগ রয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা’বাকে ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করেননি। কারণ কুরাইশরা তখন নতুন মুসলিম ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐক্য-সম্প্রীতিকে কা’বা সম্প্রসারণের উপর প্রাধান্য দিলেন।

এ ঘটনা এবং ইবনে মাসউদ ও ওসমান রা. এর ঘটনা থেকে ইমাম আহমদ রহ. সহ অন্য ইমামগণ মুক্তাদীদের সাথে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য অথবা (দ্বিতীয় পদ্ধতিও) সুন্নাত শিক্ষা দেয়ার জন্য উত্তম-কাজ ছেড়ে দিয়ে জায়েয-অনুত্তম কাজ করার কথা বলেছেন।”^{১১৩}

এ সমস্ত আলোচনা দ্বারা এ কথাই বুঝে আসে, মানুষের মাঝে ফিতনা বা একতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অনুত্তম দলিলের উপরেই আমল করা উত্তম। আর মানুষের মাঝে ফিতনা বা একতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকার পরেও সেই অনুত্তম দলিলকে বাদ দিয়ে উত্তম দলিল অনুযায়ী আমল করা বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে।

^{১১৩} মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/২৩৯, ২৫৪-২৫৫ ও আল-কাওয়ায়িদুন নূরানিয়া পৃ. ৪৬।

তাই যে বিষয়ে একাধিক সুন্নাহ বিদ্যমান ও স্বীকৃত, সে সকল ক্ষেত্রে যে এলাকায় যে সুন্নাহর আমল চালু আছে তা বাকি রাখা একান্ত দায়িত্ববোধের বিষয়। এক সুন্নাহ দিয়ে অন্য সুন্নাহকে বাতিল করা এবং ‘নাহি আনিল মুনকার’ এর আওতায় নিয়ে এসে মানুষকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা সুন্নাহ পরিপন্থী। ইমামগণের নীতি ছিল, যেখানে কোনও স্বীকৃত সুন্নাহ চালু আছে তা আপন অবস্থায় বহাল রাখা, যা ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

কাযী ইয়ায মালিকী রহ. তারতীবুল মাদারিক গ্রন্থে লিখেন,

رُوي أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: أخرج بالله على رجل روى حديثاً العمل على خلافه. قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث. قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم، فيقولون: ما نجهل هذا؛ ولكن مضى العمل على غيره.

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم وكان قاضياً، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلى، فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه؟! يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث.

وقال ابن المعتز: سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: لئعلم أنا على علم تركناه.

قال ابن أبي حازم: كان أبو الدرداء (?) يُسأل فيجيب، فيقال: إنه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال، فيقول: وأنا قد سمعته؛ ولكني أدركت العمل على غير ذلك.

قال ابن أبي الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يُعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه، وإن كان مخرجه من ثقة. انتهى كلام القاضي عياض.

“ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. মিস্বারে বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দোহাই! যিনি প্রচলিত আমলের বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইবনুল কাসেম ও ইবনুল ওহাব বলেছেন, ইমাম মালেকের নিকট হাদীসের চেয়ে আমল শক্তিশালী। ইমাম মালেক বলেছেন, তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক আহলে ইলম এমন ছিলেন, তারা হাদীস বর্ণনা করতেন। অন্যদের কাছ থেকে যখন তাদের কাছে (ভিন্ন) হাদীস পৌঁছত, তারা বলতেন, আমরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ নই, কিন্তু আমল তো প্রচলিত হয়েছে এর বিপরীতে।

ইমাম মালেক বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ইবনে ওমর ইবনে হাযম একজন কাযী ছিলেন, তার ভাই আব্দুল্লাহ প্রচুর হাদীস জানতেন এবং সত্যবাদীও ছিলেন। কাযী মুহাম্মদ কোনও এক বিষয়ে হাদীসের বিপরীতে ফয়সালা করলে, তাকে তার ভাই আব্দুল্লাহ এই বলে ভৎষণ করতে শুনেছি, এ বিষয়ে কি এমন হাদীস আসেনি? মুহাম্মদ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! তখন তার ভাই বলল, তাহলে এ হাদীস মোতাবেক ফয়সালা করলে না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, এ হাদীসের ওপরে মানুষের আমল কোথায়?! অর্থাৎ মদিনার ওলামাগণ এ ব্যাপারে একমত হননি। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ ব্যাপারে আমল হাদীসের চেয়ে অগ্রগণ্য।

ইবনুল মুআয্যাল বলেন, আমি শুনলাম, এক ব্যক্তি ইবনুল মাজিশুনকে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা হাদীস বর্ণনা করার পরে কেন তার উপর আমল করেন না? (অর্থাৎ যে সকল হাদীসের উপর আমল করেন না, সেগুলো বর্ণনা করেন কেন?) তিনি উত্তর দিলেন, মানুষকে এ কথা জানাবার জন্য যে, আমরা জেনে শুনে এগুলোর উপর আমল করি না।

ইবনে আবী হাযম বলেছেন, আবু দারদাকে প্রশ্ন করা হত, তিনি উত্তর দিতেন। তাকে বলা হল, আপনি যা বলেছেন, তার বিপরীতে আমাদের কাছে এমন এমন হাদীস পৌঁছেছে। তখন তিনি বললেন, আমিও শুনেছি। কিন্তু আমি আমল পেয়েছি এর বিপরীতে।

ইবনে আবী যিনাদ বলেন, ওমর ইবনে আব্দিল আযীয রহ. ফুকাহাদেরকে একত্রিত করে আমল প্রচলিত হয়েছে এমন সুনান ও বিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ধার্য করতেন। আর যে হাদীসের উপর মানুষের আমল ছিল না তা বাদ করে দিতেন। যদিও তার বর্ণনাকারী ‘ছেকাহ’ হোক না কেন।”^{১১৪}

ইবনে আবী যাইদ কাইরুওয়ানী রহ. বলেন,

^{১১৪} তারতীবুল মাদারিক, খ. ১, পৃ. ৪৫।

قال مالك: لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر بحديثين مختلفين. قال أشهب: يعني

لا يُحدَّث بما ليس عليه العمل.

“ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, মদিনাতে পরস্পর বিপরীত দুই হাদীস সম্পর্কে কোন ইমাম জানতেন না। আশহাব বলেন, অর্থাৎ যে হাদীস মুতাবেক আমল হয় না, তা বর্ণনা করা হত না।”^{১১৫}

ইবনে সাআদ তার শায়খ ওয়াকিদী থেকে বর্ণনা করেছেন, “(বাদশা) আবু জাফর মানসুর ইমাম মালেককে বললেন, আমি সংকল্প করেছি, আপনার রচিত কিতাব ‘মুআত্তা’র কিছু কপি করে মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব, এ কিতাবে যা আছে, তার ওপরেই আমল করবে, অন্য কিছুর উপর আমল করতে পারবে না। এবং অন্যান্য যত নতুন ইলম আছে, তা বর্জন করবে। কারণ আমি দেখছি মূল ইলম হল মদিনার ইলম।”

তখন ইমাম মালেক রহ. বললেন,

يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث،

ورؤوا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به. ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن رُدَّهم عما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل

أهل بلد منهم لأنفسهم، فقال: لعمري لو طأوغتني على ذلك لأمرت به.

“হে আমিরুল মু’মিনীন! এমনটা করবেন না। কারণ মানুষের কাছে আগেই অনেক বিধান পৌঁছে গেছে। তারা হাদীস শুনেছে, বর্ণনা করেছে। প্রত্যেক এলাকাবাসী সেটাই গ্রহণ করেছে এবং আমল করেছে, যেটা তাদের কাছে আগে পৌঁছেছে। এবং অন্যান্যদের মতানৈক্য ছেড়ে সেটার ওপরেই আমল করেছে। এখন তাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন। কাজেই প্রত্যেক শহরবাসী যা গ্রহণ করেছে এবং আমল করেছে, তার উপর তাদেরকে ছেড়ে দিন।

তখন মানসুর বললেন, কসম আমার জীবন মালিকের! যদি আপনি আমার কথা মেনে নিতেন, তাহলে আমি এর হুকুম করতাম।”^{১১৬}

ইমাম ইবনে আদিল বার রহ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন,

وَهَذَا غَايَةٌ فِي الْإِصْصَافِ لِمَنْ فَهِمَ.

^{১১৫} কিতাবুল জামি’ পৃ. ১৪৬।

^{১১৬} আত-তাবাকাতুল কুবরা বর্ণনা নং ৪৪০।

“এটি ইনসাফ পূর্ণ কথা, যার বুঝ আছে তার জন্য।”^{১১৭}

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালেক বললেন, আমাকে আবু জাফর মানসূর বললেন,

قد أردتُ أن أجعل هذا العلم علما واحدا، فأكتبُ به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة، فيعلمون به، فمن خالف ضربتُ عُقْبَهُ! فقلتُ له: يا أمير المؤمنين! أو غير ذلك؟ قلت: إن النبي ﷺ كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا وكان يخرج فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه الله عز وجل، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه فلم يفتح من البلاد كثيرا، ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بُدًّا من أن يبعث أصحاب محمد ﷺ معلّمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابرًا عن كابرٍ إلى يومهم هذا، فإن ذهبتُ تُحوِّلُهُم مِمَّا يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرا، ولكن أقرُّ أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك.

“আমি এই ইলমকে (মতভিন্নতা দূর করে) এক ইলম করে দিতে চাচ্ছি! আমি তা লিখে সেনা প্রধান ও বিচারকদের নিকট পাঠিয়ে দিব। তারা সকলকে জানিয়ে দিবে। এরপর যে এর বিপরীত করবে, আমি তার ঘাড়ে তলোয়ার মারব!

ইমাম মালেক রহ. তাকে বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! ... ওমর রা. এর হাতে বিভিন্ন শহর বিজিত হয়েছে, তখন তিনি বাধ্য হয়ে রাসূলের সাহাবাগণকে সে সব অঞ্চলে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাদের থেকে আজকের দিন পর্যন্ত লোকেরা ধারাবাহিকভাবে দীন শিক্ষা লাভ করেছে। এখন যদি আপনি তাদেরকে তাদের পরিচিত বিষয় থেকে অপরিচিত কোন বিষয়ের দিকে নিয়ে আসতে চান, তারা সেটাকে অস্বীকার করবে। আপনি প্রত্যেক শহরবাসীকে তাদের জানা ইলমের উপর বহাল রাখুন। আর এই ইলমকে আপনার নিজের জন্য গ্রহণ করুন!”^{১১৮}

ইমাম ইবনে আদিল বার রহ. এর বর্ণনায় এসেছে,

وروى ابن عبد البر في "الانتقاء": بسنده إلى إبراهيم بن حماد الزهري أنه قال: سمعت مالكا يقول: قال لي المهدي: يا أبا عبد الله! ضع لي كتابا أحمل الأمة عليه،

^{১১৭} জামিউ বয়ানিল ইলম ১/৫৩২।

^{১১৮} আল-জারহ ওয়াত তা'দীল ১/২৯।

فقلت له: يا أمير المؤمنين! أما هذا السُّقْعُ - وأشار إلى المغرب - فقد كَفَيْتُكَه،
وأما الشام ففيهم الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق.

“ইমাম মালেককে বলা হল, আপনি একটি কিতাব লিখেন, যাতে সবাই সে অনুযায়ী আমল করবে। ইমাম মালেক বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! এখানে তথা পশ্চিম প্রান্তে আমিই যথেষ্ট। সিরিয়াতে ইমাম আওয়ামী আছেন। আর ইরাকবাসীর কথা তো বলাবাহুল্য।”^{১১৯}

হযরত ওমর ইবনে আব্দিল আযীয রহ. ফরমান জারি করেছিলেন যে,

لَيَقْضَى كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقَهَاؤُهُمْ.

“প্রত্যেক গোত্র যেন স্থানীয় ফকীহগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলে।”^{১২০}

ইবনে আবীল আওয়াম ‘ফাযায়িলে আবী হানীফা’ ও ইবনে আব্দিল বার ‘আল-ইনতিকা’ গ্রন্থে সুফিয়ান ছাওরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,
كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ... يَأْخُذُ بِمَا صَحَّ عَنْهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُهَا
الثَّقَاتُ، وَبِالْآخِرِ مَنْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَبِمَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ، ثُمَّ شَنَعَ
عَلَيْهِ قَوْمٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَهُمْ.

“আবু হানীফা রহ. নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত সহীহ হাদীসকেই গ্রহণ করতেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ আমলকে গ্রহণ করার সাথে সাথে যে হাদীসের উপর কূফার ওলামাদের আমল ছিল, তাই তিনি গ্রহণ করতেন। এরপর কিছু লোক তাকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের এবং তাদের ক্ষমা করে দিন!”^{১২১}

অন্য বর্ণনায় হাসান ইবনে ছালেহ রহ. বলেন,

وروى الصِّمَرِيُّ في "أخبار أبي حنيفة" بالسند المتصل إلى الحسن بن صالح
- أحد الثقات الفقهاء العباد - قال: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ عَارِفًا بِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَفَقَهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، شَدِيدَ التَّابَعِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ بِلَدِهِ.

“আবু হানীফা রহ. কূফাবাসীর হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং যে হাদীসের উপর কূফার লোকদের আমল ছিল, তা তিনি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করতেন।”^{১২২}

^{১১৯} আল-ইনতিকা পৃ. ৮০।

^{১২০} সুনানে দারেমী, বর্ণনা নং ৬৫২, সনদ সহীহ।

^{১২১} ফাযাইলু আবী হানীফা পৃ. ৯৯; আল ইনতিকা পৃ. ২৬২।

^{১২২} আখবারু আবী হানীফা, ছায়মারী পৃ. ২৫; মানাকিবু আবী হানীফা, মাক্বী ১/৮৯।

শাহ ওলীউল্লাহ রহ. বলেছেন, প্রত্যেক আলেমেরই উক্ত নীতি ছিলো।

إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة، فالمختار عند كل عالم

مذهب أهل بلده وشيوخه...

“কোন মাসআলায় যদি সাহাবা ও তাবেরীনের মতভেদ থাকে, তখন প্রত্যেক আলেমের নিকট পছন্দনীয় হল, নিজ শহরের লোকদের মাযহাব এবং স্থায়ী শায়খদের মাযহাব।”^{১২৩}

প্রিয় পাঠক! এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইজতিহাদী ও মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহে সালাফ ও ইমামগণের সম্মিলিত নীতি ছিল, যে এলাকায় কোন স্বীকৃত সুন্নাহ ও পদ্ধতি চালু আছে তা আপন অবস্থায় বহাল রাখা এবং তা অনুসরণ করা। এর বিপরীত আমলের দাওয়াত না দেওয়া কিংবা সবাইকে এক মাযহাব ও পদ্ধতির অনুসারী বানানোর চেষ্টা না করা।

এ কারণেই হয়তো, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. এর মাযহাবের মাঝে বেশি মতভেদ ও মতপার্থক্য নেই। কেননা দুই জনই কূফার অধিবাসী এবং উভয়ে (শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. এর ভাষ্য মতে) নিজ শহরের লোকদের মাযহাব অনুসরণ করতেন। যেমন আবু সুফিয়ান ছালেহ ইবনে মেহরান রহ. বলেন,

مَا خَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ إِلَّا فِي خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

“সুফিয়ান ছাওরী রহ. শুধু পনেরটি মাসআলায় আবু হানীফা রহ. এর বিরোধিতা করেছেন।”^{১২৪}

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (মৃ. ২৩৪ হি.) বলেন,

أصحاب عبد الله - يعني ابن مسعود: ستة الذين يقرءون ويفتون ومن

بعدهم أربعة ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري كان يذهب مذهبه ويفتي بفتواهم.

“সুফিয়ান ছাওরী রহ. ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরিদগণের মাযহাব অনুযায়ী আমল করেন এবং ফতোয়া প্রদান করেন।”^{১২৫}

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরিদগণ, সুফিয়ান ছাওরী এবং আবু হানীফা রহ. সবাই কূফার অধিবাসী ছিলেন। তাই সকলের মাযহাব ও

^{১২৩} আল-ইনসাফ পৃ. ৩৬।

^{১২৪} তবাকাতুল মুহাদ্দিসীনা বি-আছবাহান ২/২১৮।

^{১২৫} আল-জারহ ওয়াত তা'দীল ১/৫৮।

ফতোয়া নিজ শহরের লোকদের মাযহাব অনুসরণের কারণে অধিকাংশ মাসআলায় মিল রয়েছে।

এভাবে ইমাম আহমদ রহ. এর মাযহাবও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবের সাথে অনেক মাসআলায় মিল রয়েছে। যেমন আল্লামা খুওয়ারিসমী রহ. (মৃ. ৬৬৫ হি.) ‘জামিউল মাসানীদ’ গ্রন্থে বলেন,
 إن كتب أبي حنيفة لا يخالفها أحمد إلا في عدة مسائل، أقل مما يخالف فيها الشافعي وغيره، وقد كتبت مائة وخمسة وعشرين مسألة من أصول المسائل التي وافق فيها أحمد أبا حنيفة، وخالفهما الشافعي.

“কিছু মাসআলায় আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবের সাথে আহমদ রহ. এর মাযহাবের বিরোধিতা হয়েছে, যা শাফেয়ী রহ. ও অন্যের তুলনায় অনেক কম। আমি ১২৫টি মৌলিক মাসআলা একত্রিত করেছি, যাতে আহমদ রহ. এর মাযহাব আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু শাফেয়ী রহ. উভয়ের বিরোধিতা করেছেন।”^{১২৬}

অনুরূপ শায়খ আব্দুল হক মুহাদিসে দেহলভী রহ.ও (মৃ. ১০৫২ হি.) “لمعات التقيح” এর ভূমিকায় একই কথা বলেছেন।

শায়খ যাহেদ কাউসারী রহ. (মৃ. ১৩৭১ হি.) খুওয়ারিসমী রহ. এর কথার সমর্থন করে এর দলিলস্বরূপ ‘তানীবুল খতীব’ গ্রন্থে বলেন,
 و"مغني" الموفق بن قدامة يكفيك دليلا على هذا، بل الإفصاح لابن هُبيرة الوزير الحنبلي على صغره كاف في ذلك.

“এর প্রমাণের জন্য ইবনে কুদামা রহ. এর ‘মুগনী’ কিতাবটি যথেষ্ট। বরং ইবনে হুবারা হাম্বলীর ‘আল-ইফহাহ’ ছোট কিতাবটিই যথেষ্ট।”^{১২৭}

উভয় মাযহাবের এ মিলের কারণ হচ্ছে, ইমাম আহমদ রহ. হলেন বাগদাদের অধিবাসী। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর আবাসস্থল কূফা হল বাগদাদের ১৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে। সুতরাং উভয় ইমাম নিজ নিজ শহরের লোকদের মাযহাব অনুসরণের কারণে এবং ইমামদ্বয়ের শহর কাছাকাছি হওয়ায় মতভেদ ও মতানৈক্যও অনেকটা কম হয়েছে।

উল্লেখ্য, নিজ শহরের লোকদের মাযহাব ও প্রচলিত আমল অনুসরণের বিষয়টি একেবারে উন্মুক্ত নয়, বরং শর্তযুক্ত। তা হল, উক্ত

^{১২৬} জামিউল মাসানীদ ১/৬৭।

^{১২৭} তানীবুল খতীব পৃ. ২৮১।

মাযহাব ও প্রচলিত আমলটি রাসূল বা সাহাবা কিংবা সালাফের যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসতে হবে। অন্যথায় বিদআতীরা সুযোগ নিবে।

পরিশেষে এ বিষয়ে সৌদি আরবের শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ উছাইমীন রহ. এর একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,
 فالعامة مذهبهـم مذهب علمائهم، ولهذا لو قال لنا قائل: إني أشرب الدخان؛ لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول: إنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا: لا يسوغ لك هذا؛ لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماءك، ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي،...

فالعامة يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم، وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلادهم؛ لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والتزعاج، ولو قال: أنا لا أتوضأ من لحم الإبل؛ لأنه يوجد من علماء الأمصار من يقول: لا يجب الوضوء منه، ولقلنا: لا يمكن، يجب عليك أن تتوضأ لأن هذا مذهب علماءك وأنت مقلد لهم.

“সাধারণ মানুষের জন্য আপন অঞ্চলের আলেমদের মাযহাবই মানা উচিত। কেউ যদি বলে, যখন যে ধারার আলেমকে ভালো লাগবে তার অনুসরণ করবো, এতে দোষের কী আছে? শায়খ বলেন, না, আপনার জন্য এমনটা করার সুযোগ নেই। কারণ আপনার উপর জরুরি কেবল তাকলীদ করা। আর আপনার পক্ষ হতে তাকলীদের অধিক হকদার হচ্ছেন আপনার এলাকার আলেমগণ। আপনি যদি স্থানীয় আলেমদের ছেড়ে অন্য আলেমদের তাকলীদ করেন, তাহলে ফেতনা সৃষ্টি হবে। অথচ (আপন দেশের আলেমদের ছেড়ে) অপর দেশের আলেমদের অনুসরণে আপনার কাছে শরয়ী কোনো দলিল নেই।

এজন্যই সাধারণ মানুষের উপর আপন এলাকার নির্ভরযোগ্য আলেমদের তাকলীদ করা জরুরি। আমাদের শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দীও এ-মতের জোর সমর্থক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার আলেমদের অনুসরণ করার অনুমতি নেই। কারণ এতে করে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের এলাকার কেউ যদি উটের গোশত খেয়ে বলে, আমি ইরাকের মাযহাব

অনুসারে অযু করবো না, (অথচ তার এলাকার আলেমদের মাযহাব অনুযায়ী উটের গোশত খেলে অজু করা আবশ্যিক) তাহলে আমরা তাকে বলবো, এমনটা করার সুযোগ নেই। তোমার উপর অযু ওয়াজিব। কারণ তোমার এলাকার হাম্বলী মাযহাব অনুসারী আলেমদের মত এটাই। আর তুমি তো তোমার এলাকার আলেমদের অনুসারী।”^{১২৮}

শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদ বিলুপ্ত করা কিংবা সবাইকে একই পদ্ধতির অনুসারী বানানোর চেষ্টা করা বাস্তবতার পরিপন্থী

বর্তমানে এক দল লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের মিশন বা চিন্তা-চেতনা হল, ‘সহীহ হাদীস অনুসরণ’ এর স্লোগান দিয়ে এই শরীয়ত স্বীকৃত মতভেদ বিলুপ্ত করে বিশেষত ইবাদত ও নামাযের ক্ষেত্রে সবাইকে একই নিয়ম ও পদ্ধতির অনুসারী বানাতে হবে। অর্থাৎ সবাই জোরে আমীন বলবে, রাফয়ে ইয়াদাইন করবে এবং বুকের উপর হাত বাঁধবে ইত্যাদি। তাদের এমন চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে উক্ত স্লোগানের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা চোখে আগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া ভালো মনে হচ্ছে।

১. শায়খ আলবানী বলেছেন, “সরব কিরাআত সম্পন্ন সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার বিধান রহিত।”^{১২৯}

পক্ষান্তরে আমাদের দেশের একই ঘরানার আরেকজন জনাব মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখেন, “ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার সালাতে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয।”^{১৩০}

২. আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেবসহ প্রায় আহলে হাদীস মনে করেন, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই।

অথচ একই মিশনের মরহুম শায়খ আলবানী ছয় তাকবীর সম্পর্কে দুটি মারফু’ হাদীসকে সহীহ (হাসান) সাব্যস্ত করে বলেছেন,

والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للعصب والفرقة.

“সত্য কথা হচ্ছে, ছয় ও বার তাকবীর উভয় পদ্ধতিই বৈধ। যে পদ্ধতিই অনুসরণ করা হোক সুন্নাহ আদায় হয়ে যাবে। এখানে কোন পক্ষের গোঁড়ামী ও বিভেদের সুযোগ নেই।”^{১৩১}

^{১২৮} লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ৩২/১৯, শামেলা ভার্সন।

^{১২৯} দেখুন, নবী -এর ছালাত সম্পাদনের পদ্ধতি পৃ. ৮৩, তাওহীদ পাবলিকেশন্স আগস্ট ২০১১।

^{১৩০} ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৮৮।

^{১৩১} সিলসিলায়ে সহীহা ৬/১২৬০-৬৪।

এভাবে অনেক বিষয়ে তাদের নিজেদের মতানৈক্যের ফিরিস্তি কম নয়।

তাদের মধ্যকার মতানৈক্যের কিছু বিষয় সহজে পেতে চাইলে ড. সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বারীকের দুই খণ্ডে ৮'শর অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত ১৪৩০ হি. মোতাবেক ২০০৯ ঈ. সালে প্রকাশিত নিম্নোক্ত কিতাবটি দেখুন-

الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمهم الله تعالى.

এতে তিনি এ যুগের সালাফী আলেম শায়খ বিন বায রহ., শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ উছাইমীন রহ. ও শায়খ আলবানী রহ. এর মাঝে ১৬৬টি মতভেদ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ মিসরের শায়খ সায্যিদ সাবেক রহ. (মৃ. ১৪২৫ হি.) রচিত ও আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে খুবই সমাদৃত কিতাব 'ফিকহুস সুন্নাহ' এবং শায়খ আলবানীর রচিত উক্ত কিতাবের টীকা 'তামামুল মিন্নাহ ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ' গ্রন্থদ্বয় দেখুন। উভয় শায়খ একই যুগের ও একই চিন্তা-চেতনার হওয়া সত্ত্বেও অনেক মাসআলায় মতভেদ করেছেন।^{১৩২}

এরপরও কিছু বন্ধু 'ফিকহুস সুন্নাহ' ও এ জাতীয় কিতাবকে খালেস ও ইজতিহাদমুক্ত সুন্নাহ অনুসরণের কিতাব মনে করেন। আর মাযহাবের ফিকহের কিতাবগুলোকে সুন্নাহবিহীন বা সুন্নাহর সাথে ইজতিহাদযুক্ত কিতাব মনে করেন। অথচ ফিকহের কিতাবগুলো যেভাবে ইমামগণের ইজতিহাদমুক্ত না, তদ্রূপ 'ফিকহুস সুন্নাহ' ও এ জাতীয় কিতাবগুলোও লেখকদের ইজতিহাদমুক্ত না। কেননা এগুলো যদি ইজতিহাদমুক্ত সুন্নাহর কিতাব হত, তাহলে একই ঘরানার হওয়া সত্ত্বেও শায়খ সায্যিদ সাবেক ও শায়খ আলবানীর মাঝে বা ওই সমস্ত কিতাবের লেখকদের মাঝে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ দেখা দিত না। বিস্তারিত আলোচনার এখানে সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বুঝার তাওফীক দান করুন।

লক্ষ্য করুন! যাদের চেষ্টা ও মিশন হল, “মতভেদ বিলুপ্ত করে সবাইকে একই পদ্ধতি তথা ‘সহীহ হাদীস’ এর অনুসারী বানাতে হবে” তাদের মাঝে আবার মতানৈক্য কেন? নিশ্চয় বলবেন, এমন চেষ্টা বাস্তবতার পরিপন্থী।

^{১৩২} সবিস্তারে জানতে দেখুন, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হাফিয়াহুল্লার 'উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা' পৃ. ৭৫-৭৯। আর তাদের কিছু মতানৈক্য বাংলা ভাষায় দেখতে চাইলে মাওলানা আবু হাসসান রাইয়ানের 'সালাফী আলেমদের মাঝে ইখতিলাফ' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

কাজেই যে কারণে তারা একই ভিশন ও মিশনের দাবিদার হয়েও একই পদ্ধতির অনুসারী হতে পারছে না, ঠিক একই কারণে (যদিও বাস্তবে অনেক পার্থক্য রয়েছে) সাহাবা ও সালাফের ইমাগণও একই পদ্ধতির অনুসারী হতে পারেন নাই। আল্লাহ পাক সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

আর সবাইকে একই পদ্ধতির অনুসারী করা বা হওয়ার চিন্তা-চেতনা যে ইলাহী নীতির বিরোধী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইচ্ছার পরিপন্থী এবং সাহাবা ও সালাফের কর্ম বিরোধী, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আশা করি, যে সকল বন্ধুরা এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন বা প্রান্তিকতার শিকার, তারা এটুকুতেই শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

একটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথা ও ধোঁকা:

অনেকে বলে থাকেন, আমরা নির্দিষ্ট এক মাযহাবের অনুসরণ করি আর আহলে হাদীস ও গায়রে মুকাল্লিদরা যা অনুসরণ করে, তা কখনও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাবের সাথে মিলে, আবার কোন মাসআলায় ইমাম মালেক বা আহমদ কিংবা আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবের সাথে মিলে যায়। পার্থক্য শুধু আমরা নির্দিষ্ট এক মাযহাবের সীমাবদ্ধ আর তারা সীমাবদ্ধ নয়।

এটি একটি অনভিজ্ঞতার কথা ও নেক সুরতে ধোঁকা। কেননা তাদের অনেক আমল এমন রয়েছে, যা চার মাযহাবের বিপরীত। যেমন:

১. অযু ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েয।^{১৩৩}
২. আট রাকাত তারাবীহ।^{১৩৪}
৩. ওমরী কাযা নেই।
৪. নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য নেই।
৫. জুমার সানী বা দ্বিতীয় আযান নেই। বরং সুস্পষ্ট বিদআত, কোনভাবেই তা বৈধ নয়।^{১৩৫}
৬. রুকু পেলো রাকাত পাবে না।^{১৩৬}
৭. দুই পা ছড়িয়ে এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে নামাযে দাঁড়ানো।
৮. বুকের উপর হাত বাঁধা।^{১৩৭}

^{১৩৩} নুযুলুল আবরার ১/৯; উরফুল জাদী পৃ. ১৫।

^{১৩৪} এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে দেখুন, 'বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কবলে তারাবীহর নামায'।

^{১৩৫} ফাতাওয়া আহলে হাদীস ২/১০৬।

^{১৩৬} ফাতাওয়া ইলমিয়া পৃ. ৩৭৩। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন, বান্দার লিখিত 'রুকু পেলোও রাকাত পাবে'।

^{১৩৭} অনেকে মনে করেন, বুকের উপর হাত বাঁধার কথা শাফেয়ী মাযহাবে রয়েছে। এটা ভুল তথ্য। কারণ শাফেয়ী মাযহাবের কিতাবসমূহে রয়েছে, বুকের নীচে হাত বাঁধার কথা। আর বুকের উপর হাত বাঁধার কথা

৯. তাশাহুদে অঙ্গুলি নাড়াতে থাকা।
 ১০. কাওমা ও জলসায় হাত বাঁধা। (অর্থাৎ রুকুর পরে এবং দুই সিজদার মধ্যখানে হাত বাঁধা।)
 ১১. শবে বরাত বলতে ইসলামে কিছু নেই। (তবে আলবানী ও মুবারকপুরীর নিকট শবে বরাতের হাদীস প্রমাণিত।)
 ১২. এক শব্দে তিন তালাক দিলেও এক তালাক বলা ইত্যাদি।
- এভাবে আকীদা বিষয়েও তারা চার মাযহাব ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিপরীত আকীদা পোষণ করে। যেমন:
১. আল্লাহ তাআলাকে আরশে সমাসীন বলা।
 ২. আল্লাহকে সাকার বলা।
 ৩. হায়াতুল আশ্বিয়াকে অস্বীকার করা ইত্যাদি।
- এছাড়াও আরো বিষয় রয়েছে, যেখানে তারা চার মাযহাব এবং জমহুর উম্মতের পথ ছেড়ে ভিন্ন রাস্তায় হেঁটেছেন। তবে হ্যাঁ, উল্লিখিত সব বিষয় যে সকল আহলে হাদীস ও গায়রে মুকাল্লিদ মনে করেন, তা নয়। বরং এতেও তাদের মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহ পাক সবাইকে উক্ত অজ্ঞতাপূর্ণ কথা শুনে নেক সুরতে ধোঁকা খাওয়া থেকে হেফাজত করুন।

ইজতিহাদী যোগ্যতা সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির

বিষয়, সখ ও স্বপ্নের নয়

হাদীস শাস্ত্রের প্রাণপুরুষ ইমাম যাহাবী রহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) ‘সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী রহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.) এর জীবনীতে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। “আমি হকের ইত্তিবা করি এবং ইজতিহাদ করি; কোন মাযহাবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই”।

ইবনে হাযম যাহেরীর বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

نعم، مَنْ بَلَغَ رُبَّةَ الاجْتِهَادِ، وشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ عِدَّةٌ مِنَ الْأُئِمَّةِ، لَمْ يَسُغْ لَهُ أَنْ يُقْلَدَ، كما أَنَّ الْفَقِيهَ الْمُتَدَيِّ، وَالْعَامِي الَّذِي يَحْفَظُ الْقُرْآنَ أَوْ كَثِيرًا مِنْهُ لَا يَسُوغُ لَهُ الاجْتِهَادُ أَبَدًا، فَكَيْفَ يَجْتَهِدُ، وَمَا الَّذِي يَقُولُ؟ وَعَلَامَ يَبْنِي؟ وَكَيْفَ يَطِيرُ وَلَمَّا يُرِيَّشُ؟

১১০০ হিজরী পর্যন্ত কেউ বলেনি। সর্বপ্রথম আমীর ছানআনীই (মৃ. ১১৮৩ হি.) বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন। এরপর শাওকানী, মুবারকপুরী, আজীমাবাদী ও আলবানী সাহেবরা বলেছেন।

দ্র. ‘أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء’ للدكتور ماهر ياسين فحل الهيتي. ২৭৭ পৃ.

“হ্যাঁ, এটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছেছে। আর তা জানার উপায় হল, তার এ যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক ইমাম সাক্ষ্য বা স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। তখন এমন যোগ্য আলেমের জন্য তাকলীদ করার সুযোগ নেই। যেমনিভাবে প্রাথমিক স্তরের কোন ফিকহ হাসেলকারী যে পুরো কুরআন বা এর অনেকাংশ মুখস্থ করেছে, তার জন্য কোনভাবেই ইজতিহাদ করা বৈধ নয়। সে কীভাবে ইজতিহাদ করবে, আর কী মাসআলা বলবে? কীসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করবে? সে কীভাবে উড়বে, অথচ তার কোন ডানাই গজায়নি?”^{১৩৮}

যাহাবী রহ. এর বক্তব্য আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম মালেক রহ. এর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তিনি নিজ সম্পর্কে বলেছেন,

ما أفيتُّ حتى شهد لي سبعون: أُنِّي أهلٌ لذلك.

“সত্তর জন ইমাম আমার ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার আগ পর্যন্ত আমি ফতোয়া দেইনি।”

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালেক রহ. এর সঙ্গি খলফ ইবনে ওমর বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, “আমি ফতোয়ার যোগ্য কিনা এ কথা আমার চেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব পর্যন্ত আমি কোন ফতোয়া দেইনি। আমি রবীআ ও ইয়াহয়া ইবনে সাঈদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা আমাকে ফতোয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।”

খলফ বলেন, আমি (ইমাম) মালেককে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দিল্লাহ! তারা যদি আপনাকে নিষেধ করতেন?

তিনি বললেন, “তাহলে আমি বিরত থাকতাম। কেননা কারো জন্য তার চেয়ে বিজ্ঞজন থেকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া নিজেকে কোন কাজের যোগ্য মনে করা উচিত নয়।”^{১৩৯}

এ কারণেই ড. আলী নায়েফ বিকারী **في "الاجتهاد في علم الحديث وأثره"** গ্রন্থে ইজতিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

استفراغ الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط من المؤهل له.

“স্বীকৃত যোগ্য ব্যক্তি ইসতিমবাতের মাধ্যমে আমল সংক্রান্ত বিধান বের করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করাকে ইজতিহাদ বলে।”

^{১৩৮} সিয়াকু আ'লামিন নুবালা ১৮/১৯১।

^{১৩৯} হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম ৬/৩১৬-১৭; আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫-২৬, প্রথম বর্ণনার সনদ সহীহ। আরো দেখুন, ই'লামুল মুআক্কিয়ীন ও ইমাম নববীর আদাবুল ফাতাওয়া প্রভৃতি।

অতঃপর তিনি বলেন, “স্বীকৃত যোগ্য ব্যক্তির শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, যারা ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের যোগ্যতার দাবি করে, অথচ আহলে ইলম তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়নি, তারা যেন ইজতিহাদের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যায়।”^{১৪০} অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যেন মুজতাহিদ হিসেবে বিবেচ্য না হয়।

ড. মুহাম্মদ হাসান হাইতু বড় চমৎকার কথা লিখেছেন! তিনি ‘আল-ইজতিহাদ ওয়া তবাকাতু মুজতাহিদীশ শাফিইয়া’ এর ভূমিকায় বলেন, “ইজতিহাদ শব্দটি বড় চমৎকার আকর্ষণীয় শব্দ। মানুষের বিবেক তা কামনা করে এবং মন তার দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকেই ইজতিহাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌঁছতে চায় এবং তার সাজে সজ্জিত হতে চায়।...

আমাদের সালাফগণ এই শব্দের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। তাই তাঁরা ইজতিহাদের শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছেন এবং তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করেছেন। ফলে যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ ইজতিহাদের দাবি করতেন না।... কারণ তাঁরা জানতেন, ফতোয়া দেয়ার দুঃসাহস দেখানো জাহান্নামে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখানোরই নামান্তর। যার কারণে তাঁরা মনস্কামনার অনুগামী হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে অন্যের অনুসরণকেই পছন্দ করতেন।

তবে ইজতিহাদ শব্দটি ইদানিং এতটাই আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। সাথে সাথে তার অন্তর্নিহিত মর্মকেও হারিয়ে ফেলেছে, যা ইতিপূর্বে কখনোই এভাবে হারাইনি। অথচ পূর্ববর্তীদের তুলনায় আমাদের কাছে কতটুকুই বা ইলম আছে?!...

ইজতিহাদ শব্দটি আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেওয়ার কারণে অজ্ঞ, মূর্থ ও ধোঁকাবাজ সকলেই এতে আকর্ষিত হয়ে ইজতিহাদের দাবি করে বসছে। এমনকি যার সঙ্গে শরয়ী ইলমের দূরতম সম্পর্কও নেই, সে পর্যন্ত ইজতিহাদের দাবি করতে ভুল করছে না।

আমরা কিছু মানুষকে দেখতে পাই যারা নিজেদেরকে আলেম মনে করে ইজতিহাদের দাবি করে বসেছে এবং রীতিমত আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে অপচর্চা করে হালালকে হারাম বানাচ্ছে, হারামকে হালাল বানাচ্ছে। অথচ তারা এখনও কুরআন মাজীদ পড়তেও শেখেনি!... আরবী ভাষার ব্যাকরণ তো পরের কথা আরবী ভাষার উচ্চারণটাও তাদের মুখে আসে না।

^{১৪০} আল-ইজতিহাদ ফী ইলমিল হাদীস ওয়া আসারুহু ফিল ফিকহিল ইসলামী পৃ. ২২।

অথচ এ ভাষার উপর ভিত্তি করেই কুরআন বুঝতে হয়!...^{১৪১} ফলে দ্বীনের মাপকাঠিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহর বুঝ ও ফাহম বিবর্তনের শিকার হচ্ছে। পরিণামে সুন্নাহ বিদআতে রূপান্তর হচ্ছে এবং বিদআত সুন্নাতে পরিণত হচ্ছে। ইলম মূর্খতা হয়ে যাচ্ছে আর মূর্খতা ইলমের রূপ ধারণ করছে।...

^{১৪১} প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঢাকার সাইন্স ল্যাবরেটরী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা হাসান জামীল সাহেব (হাফিয়াহুল্লাহর) কাছ থেকে আমি সাঈদ আহমদ নিজ কানে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ২০১৪ ঈ. সালের এপ্রিল মাসে পিস টিভির আলোচনা-বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য ডা. জাকির নায়েক সাহেবের দাওয়াতে আমরা কয়েকজন আলেম দুবাইতে যাই। দুবাইয়ের হোটেল ‘লোটাস’ এ একান্ত আলাপচারিতায় ডা. জাকির নায়েক সাহেবকে আমি হাসান জামিল নিজেই জিজ্ঞাসা করেছি, কারো শোনা কথা বলছি না। আমি (উর্দূতে) জিজ্ঞাসা করেছি, “আপনি কি আরবী জানেন?” হাসতে হাসতে তিনি বললেন, “আমি আরবী জানি না”। আমি তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি আরবী জানেন না, তাহলে ফতোয়া কীভাবে দেন? অথচ ফতোয়া দেওয়ার জন্য তো আরবী জানা শর্ত ও জরুরী। (সূরা তাওবা ১২২)” আবার তিনি হাসতে হাসতে বললেন, “এটা তো আলেমদের কাজ”। তখন আমি বললাম, “ঠিক বলেছেন, এটা আলেমদের কাজ। সুতরাং তা আলেমদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। আর আপনি ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ আপনার ফতোয়ার কারণে আমাদের দেশে অনেক বিশৃঙ্খলা হচ্ছে।”

অতঃপর জামীল সাহেব বললেন, “আমি জানি না, এরপর তিনি ফতোয়া দিয়েছেন কি না। তবে তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন, এটা আলেমদের কাজ। আসলে তিনি খুব ভদ্র ব্যক্তি, সজ্জন মানুষ, শরীফ মানুষ, কারীম মানুষ। আমরা তার সাপোর্টারগণ, তাকে আরও বেশি বিতর্কিত করেছি।”

আমরা হাসান জামীল সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করে আমাদেরকে জানিয়েছেন।

আসলেই জাকির নায়েক সাহেব একজন ডাক্তার, মেধাবী, তार्কিক ও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তিনি যদি তার আলোচনা ও বিতর্ক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন, যেমনটি তার গুরু ড. আহমদ দিদাত রেখেছিলেন, তাহলে তার জন্য এবং উম্মতের জন্যও অনেক কল্যাণ হত। কিন্তু তিনি অনাধিকার চর্চা করেছেন। ফলে ডাক্তারের অপারেশনের কাজ ইঞ্জিয়ার করলে যা হওয়ার কথা, তাই হচ্ছে।

আশ্চর্যবোধ হয়! একজন ব্যক্তি যেখানে ভাষা জ্ঞান ছাড়া শুধু অনুবাদ দেখে নিজেই পরিতৃপ্ত হতে পারে না, সেখানে অন্যকে পরিতৃপ্ত করার কাজ (তথা ফতোয়া দেওয়া) হাতে নিয়েছেন! আরো বেশি আশ্চর্য হই! যখন দেখি এমন অপারিতৃপ্ত ব্যক্তির ফতোয়া নিয়ে কিছু লোক নিজেরা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে এবং কিছুটা পরিতৃপ্ত আলেমদেরকও ঘায়েল করার অপচেষ্টা করছে। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।

কিছু লোক তো উসূলে ফিকহ অর্জন করতে অক্ষম হয়ে বলেই বসল, উসূলে ফিকহ বিদআত! কেউ ধারণা করে বসল, ইলমে তাজবীদ বিদআত! আর কেউ কেউ ঘোষণা করে দিল, ফিকহী কিতাবগুলো ছুড়ে ফেল! এগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয নেই।...

সীমাহীন মূর্খতা ও চপল চিন্তা এত দূর পৌঁছেছে যে, শুধু চিন্তাগত ইখতিলাফের কারণে অনেক মুসলমানকে তারা কাফের, মুলহিদ, গোমরাহ ও আহলে সুন্নাহ থেকে বহির্ভূত হওয়ার ফতোয়া দিচ্ছে!

আমি লক্ষ্য করেছি, তারা এ অন্ধকারচ্ছন্ন ইজতিহাদের মাধ্যমে মাযহাবগুলোর বিরুদ্ধে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করছে। অথচ এই চৌদ্দশ বছর যাবত মাযহাবের ওলামায়ে কেরামই ইলম-ফিকহ, কবিতা-সাহিত্য, আখলাক-চরিত্র, চিন্তা-চেতনা ও বীরত্ব-মাহত্ব্যে দুনিয়াকে ভরে দিয়েছে।...

আমরা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার দাবি করছি না। বরং বলছি, প্রথমে ইলম হাসেল কর, এরপর ইজতিহাদ কর!

কারণ সখ করে বা স্বপ্ন থাকলেই মুজতাহিদ হওয়া যায় না। বরং ইলমী যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত স্তরে পৌঁছার পরেই কেউ ইজতিহাদ করতে পারে।

পূর্বযুগের ওলামাগণ কুরআন-সুন্নাহ, আরবী ভাষা-সাহিত্য, ফিকহ ও উসূলে ফিকহে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করার পরও ইজতিহাদের দাবি করতেন না।

হাফেজে হাদীস ও মুহাদিসগণের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তাঁরা সকলেই পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুসারী ছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. থেকে নিয়ে সুনান কিতাবের রচয়িতাগণ, ইমাম হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আসাকির, ইবনুস সালাহ, ইয ইবনে আব্দুস সালাম, নববী, যাহাবী, মিয়যী, ইরাকী, ইবনে হাজার ও সুয়ূতী রহ. প্রমুখ ইমাম মাযহাবের অনুসরণ করতেন।

কিন্তু এ যুগের মূর্খ প্রোপাগান্ডার শিকার ব্যক্তিদের কী হল, তারা এই সুউচ্চ আসনের দাবি করছে, অথচ তারা এখনও কুরআন মাজীদটাও শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারে না?!... হয়তো তাদের ভেতর নববী বাণীর প্রতিফলন দেখা দিয়েছে। তা হল, «إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ»

তোমার লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছে করতে পার!”

ড. মুহাম্মদ হাসান হাইতু বড় চমৎকারভাবে তাদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। যারা শিক্ষাগ্রহণ করতে চান, তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

আলী নায়েফ বিকারী রচিত ‘আল-ইজতিহাদ ফী ইলমিল হাদীস’ গ্রন্থের শুরুতে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে ড. নূরুদ্দীন ইতার বলেন,

“আজ এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম বিশ্বে প্রবল বেগে নির্দিষ্ট কিছু প্রোপাগাণ্ডা উসকে দেয়া হচ্ছে। উসকানীদাতারা মনে করছে, তারা সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করছে এবং ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত করছে। অথচ তারা ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত করার আড়ালে ইজতিহাদ ও গবেষণার স্বাধীনতা গলা টিপে মারছে।”

শায়খ সালমান বিন ফাহদ আল-আওদাহ ‘মান ইয়ামলিকু হাক্কাল ইজতিহাদ’ ছোট্ট একটি পুস্তিকায় লিখেছেন, “ইজতিহাদের দরজা শুধু খোলা হয়নি, বরং বল প্রয়োগ করে একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এখন যোগ্য-অযোগ্য প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করতে পারে। বরং ইতিমধ্যে অনেক অযোগ্য এতে ঢুকে পরেছে এবং ইজতিহাদের দাবি করে বসেছে। আর মনে মনে ভাবছে, তারা ভুল করুক আর শুদ্ধ করুক সাওয়াব ও পুণ্য তাদের থলে ফসকে কখনোই বাইরে পড়বে না। এরাই ইলম ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলে থাকে।”

সাওয়াব ও পুণ্য যোগ্যতার শর্তে আবদ্ধ:

বুখারী-মুসলিমে হযরত আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ: فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ: فَلَهُ أَجْرٌ».

“বিচারক ও ফায়সালাকারী যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। আর যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়, তার জন্য একটি প্রতিদান।”

ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেন, “বিচারক ও ফায়সালাকারী ব্যক্তি ভুল করলে তখনই প্রতিদান পাবে, যখন সে ইজতিহাদ ও সুন্নাহ বিষয়ে আলেম হবে। আর যে এ বিষয়ে আলেম নয়, সে উক্ত হাদীসের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হবে না।”^{১৪২}

ইমাম খাত্তাবী রহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) ‘মাআলিমুস সুনান’ গ্রন্থে বলেন, إِنَّمَا يُؤْجَرُ الْمَخْطِئُ عَلَى اجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ.. وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ جَامِعًا لِّأَلَةِ الْاجْتِهَادِ، عَارِفًا بِالْأَصُولِ، وَبُجُوهِ الْقِيَاسِ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُحَلًّا لِلْاجْتِهَادِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ، وَلَا يُعْذَرُ بِالْخَطَا فِي الْحُكْمِ، بَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ الْوِزْرِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. أَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ».

“সত্য অনুসন্ধান ইজতিহাদে ভুলকারীকেও সাওয়াব দেয়া হয়, কারণ ইজতিহাদ একটি ইবাদত। তবে এটি সেই মুজতাহিদের জন্য, যিনি ইজতিহাদের শর্তাবলী পাওয়ার শর্তে পূর্ণ যোগ্য এবং উসূল ও কিয়াস সম্পর্কে বিজ্ঞ। কিন্তু যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই, কৃত্রিম মুজতাহিদ, সে ভুল করলে ক্ষমার উপযুক্ত নয়। বরং বড় ধরনের গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “বিচারক ও ফায়সালাকারী ব্যক্তি তিন প্রকার। এক প্রকার জান্নাতী, দুই প্রকার জাহান্নামী।... তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকার হল, ইলম ও যোগ্যতা ছাড়া ফায়সালাকারী ব্যক্তি।”^{১৪৩}

এছাড়াও ইবনুল মালাক হানাফী, কাযী ইবনুল আরবী মালেকী ও ইমাম নববী শাফেয়ী রহ. সহ অনেক ইমাম একই কথা বলেছেন।^{১৪৪}

পরিশেষে ইমাম বগভী শাফেয়ী (মৃ. ৫১৬ হি.) রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করে এ বিষয়ের ইতি টানছি। তিনি ‘শরহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে লিখেন, وهذا فِيمَنْ كَانَ جَامِعًا لِّأَلَةِ الْاجْتِهَادِ،... وَاجْتِهَادُ مَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْعِلْمِ: عِلْمُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِلْمُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقَاوِيلُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مِنْ إِبْجَاعِهِمْ وَاجْتِلَافِهِمْ، وَعِلْمُ اللُّغَةِ، وَعِلْمُ الْقِيَاسِ،... فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ عِلْمُ الْكِتَابِ: النَّاسِخَ، وَالْمَنْسُوخَ، وَالْمَجْمُولَ،... وَالْكَرَاهِيَّةَ، وَالتَّحْرِيمَ، وَالْإِبَاحَةَ، وَالتَّنْذِيرَ. وَيَعْرِفُ مِنَ السَّنَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَيَعْرِفُ مِنْهَا الصَّحِيحَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُسْنَدَ، وَالْمَرْسَلَ، وَيَعْرِفُ تَرْتِيبَ السَّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ، وَتَرْتِيبَ الْكِتَابِ...

^{১৪৩} মাআলিমুস সুনান ৪/১৬০।

^{১৪৪} দেখুন, শরহু মাসাবীহিস সুন্নাহ ৪/২৭৪; আল-মাসালিক ফী শরহি মুআত্তা মালেক ৬/২৪২; শরহে মুসলিম ১২/১৪।

وإذا عَرَفَ من كل نوع من هذه الأنواع مُعَظَمَهُ: فهو مجتهد،...

وإذا لم يَعْرِف نوعاً من هذه الأنواع: فسيُله التقليد، وإن كان متبحراً في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف، ولا يجوز له تقلد القضاء، ولا الترسد للفتيا. وإذا جَمَعَ هذه العلوم، وكان مُجانباً للأهواء والبدع، مُدْرِعاً بالورع، مُحْتَرِزاً عن الكبائر، غَيْرَ مُصَرِّ على الصغائر، جاز له أن يتقلد القضاء، ويتصرف في الشرع بالاجتهاد والفتوى، ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يَعْنُ له من الحوادث.

“সাওয়াব কেবল সে ব্যক্তিই পাবে, যার কাছে ইজতিহাদের শর্তাবলী পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে।

আর মুজতাহিদ হলেন, যিনি পাঁচ বিষয়ের ইলম রাখেন। যথা: ১. কুরআনের ইলম। ২. সুন্নাহর ইলম। ৩. সালাফ ইমামগণের ইজমা’ ও ইখতিলাফের ইলম। ৪. আরবী ভাষাজ্ঞান। ৫. কিয়াসের ইলম।

কুরআন থেকে নাসেখ, মানসূখ, মুজমাল... মাকরুহ, হারাম, মুবাহ ও মুস্তাহাব ইত্যাদি জানতে হবে। সুন্নাহ থেকেও উপর্যুক্ত বিষয়গুলো জানার সাথে সাথে সহীহ, যযীফ, মুসনাদ, মুরসাল এবং কুরআন ও সুন্নাহর পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয়াদিও জানতে হবে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের পরেই সে মুজতাহিদ হতে পারে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি জানল না, তার কাজ তাকলীদ করা। যদিও সে কোন এক মাযহাব সম্পর্কে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হোক না কেন! তার জন্য বিচার করা ও ফতোয়া দেওয়া কোনটাই জায়েয নয়।

যখন কোন ব্যক্তি উপর্যুক্ত ইলমগুলো হাসেল করবে এবং কুপ্রবৃত্তি ও বিদআত থেকে দূরে থাকবে, পরহেযগারী অবলম্বন করবে, কাবীরী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে এবং সগীরী গুনাহে অভ্যস্ত হবে না, তার জন্য ইজতিহাদের মাধ্যমে শরয়ী বিষয়ে বিচার করা ও ফতোয়া দেওয়া জায়েয। আর যিনি উপর্যুক্ত শর্তাবলী ও গুণাবলির অধিকারী নন, তার জন্য নিত্য-নতুন বিষয়ে মুজতাহিদের তাকলীদ করা ওয়াজিব।”^{১৪৫}

মুহাদ্দিস আর মুজতাহিদ এক নয়:

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) ‘আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ’ কিতাবে লিখেছেন,

وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها، وإنما يتفقه باستنباط معانيه، وإنعام التفكير فيه.

“জেনে রেখো, বেশি করে হাদীস লিখা বা জমা করা এবং অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা দ্বারা কেউ ফকীহ হয়ে যায় না। বরং হাদীসের অর্থ আহরণ এবং তা নিয়ে গভীর গবেষণা দ্বারাই ফকীহ হওয়া যায়।”^{১৪৬}

ইমাম রামাহুরমুযি রহ. (মৃ. ৩৬০ হি.) ‘আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল’ গ্রন্থে ও তাঁর সূত্রে খতীব বাগদাদী রহ. ‘আল-ফকীহ’ কিতাবে বর্ণনা করেছেন,

إن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة، وخلف بن سالم في جماعة يتذكرون الحديث، فسمعتهم يقولون: قال رسول الله ﷺ، وسمعت رسول الله ﷺ، ورواه فلان، وما حدث به غير فلان. فسألتهم المرأة عن الحائض تغسل الموتى، - وكانت غاسلة - فلم يجيبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور، فقبل لها: عليك بالمقبل، فالتفت إليه، وقد دنا منها، فسألته،

فقال: نعم تغسل الميت لحديث عثمان بن الأحنف، عن القاسم عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «أما إن حيضتك ليست في يدك»، ولقوها: «كنت أفرق رأس رسول الله ﷺ بالماء وأنا حائض». قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي بالماء فالميت أولى به.

فقالوا: نعم رواه فلان، ونعرفه من طريق كذا، وخاضوا في الطرق والروايات،

فقالت المرأة: «فأين كنتم إلى الآن؟!».

“জনৈক মহিলা মুহাদ্দিসগণের একটি মজলিসে উপস্থিত হলো। যেখানে (ইমামুল মুহাদ্দিসীন) ইয়াহয়া ইবনে মাদ্বীন রহ, আবু খাইসামা ও খালাফ ইবনে সালেম রহ.-সহ একদল মুহাদ্দিস হাদীস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করছিলেন। মহিলাটি তাদের এই আলোচনা শুনলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এটি অমুকে বর্ণনা করেছে, অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এটা বর্ণনা করেনি ইত্যাদি।

মহিলাটি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, হায়েযা (মাসিকাবস্থায়) মহিলা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারবে কি না? মহিলাটি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতো। মজলিসের কেউ মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। তাদের একজন অপরজনের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে (ফকীহ) আবু সাওর রহ. আগমন করলেন। মহিলাকে বলা হলো, আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করুন।

মহিলাটি (ফকীহ) আবু সাওর রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। হায়েযা মহিলা মৃত ব্যক্তির গোসল দিতে পারবে। কেননা এ ব্যাপারে ওসমান বিন আহনাফ কাসেম থেকে, তিনি হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নেই’। আরেকটি দলিল হলো, হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, ‘আমি হায়েয অবস্থায় পানি দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা ধৌত করতাম’।

সুতরাং তিনি যখন পানি দ্বারা জীবিত মানুষের মাথা ধৌত করেছেন, তাহলে মৃত ব্যক্তির গোসল প্রদান নিঃসন্দেহে বৈধ।

উত্তর শুনে মুহাদ্দিসগণ বললেন, হ্যাঁ। হাদীসটি অমুক অমুক বর্ণনা করেছেন। আমরা এই এই সনদে হাদীসটি পেয়েছি। তাঁরা হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও বর্ণনার মাঝে ডুবে গেলেন। তখন মহিলা তাদেরকে বললো, এতক্ষণ আপনারা কোথায় ছিলেন?!”^{১৪৭}

আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। “একদা (ইমাম) আবু হানীফা রহ. (বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম) আ’মাশ রহ. (মৃ. ১৪৮ হি.) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অমুক অমুক মাসআলা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, আমার বক্তব্য এই...। তখন ইমাম আ’মাশ রহ. বললেন, আপনি এ বক্তব্যের দলিল কোথায় পেলেন? ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, আপনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন -

- আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে, আবু ওয়াইল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে এবং আবু ইয়াস হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **من دل على خير كان له مثل أجر عمله.**

‘যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে পথ প্রদর্শন করলো, সেও আমলকারীর পরিমাণ সাওয়াব পাবে।’

– আপনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু সালেহ থেকে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঘরে নামায আদায় করছিলাম। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলো। এতে আমার অন্তরে খুশি অনুভূত হলো। তিনি ইরশাদ করলেন, لك أجران: أجر السر والعلانية.

‘তুমি দু’টি সাওয়াব পাবে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নামায আদায়ের সাওয়াব।’

– আপনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাকাম থেকে, তিনি আবু মিজলায থেকে, তিনি হযরত হুযাইফা রা. থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ...।

– আপনি আমাদেরকে আবু সালেহ থেকে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে মারফু’ হাদীস বর্ণনা করেছেন ...।

– আপনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুয যুবাইর থেকে, তিনি হযরত জাবের রা. থেকে মারফু সূত্রে ...।

– আপনি আমাদের নিকট ইয়াযিদ রাব্বাশী থেকে, তিনি হযরত আনাস রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন ...।

অতঃপর ইমাম আ’মাশ রহ. বললেন,

حسبك، ما حدثتك في مئة يوم حدثتني في ساعة، ما علمت أنك تعمل بهذه

الأحاديث، يا معشر الفقهاء! أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين.

“আপনার জন্য যথেষ্ট! আমি আপনাকে একশ’ দিনে যা বর্ণনা করেছি, আপনি আমাকে এক মুহূর্তে সেগুলো বর্ণনা করলেন। আমি জানতাম না আপনি এই হাদীসগুলোর উপর আমল করে থাকেন। হে ফকীহগণ! আপনারা হলেন ডাক্তার, আর আমরা হলাম ওষুধ বিক্রেতা। হে আবু হানীফা! আপনি উভয়টা গ্রহণ করে সমন্বয় করেছেন।”^{১৪৮}

^{১৪৮} মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, মোল্লা আলী কারী রহ., যা আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যার শেষে মুদ্রিত, খ. ২, পৃ. ৪৮৪। এর মূল বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনে হিব্বান রহ. ‘আস-

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) ‘তালবীসে ইবলীস’ গ্রন্থে বলেন, “বড় মুহাদ্দিস ইবনে ছায়িদ রহ. কে এক মহিলা একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলো। মাসআলা হল, একটি কূপের মধ্যে মুরগী পড়ে মারা গেছে, এখন কূপের পানির হুকুম কি? পানি পবিত্র, না অপবিত্র?

তিনি বললেন, মুরগী পড়ল কেমনে? মহিলাটি বলল, কূপ ঢাকা ছিল না।

তিনি বললেন, কূপ ঢেকে রাখলে না কেন? কূপ ঢেকে রাখলে তো কিছুই পড়তো না।

ফকীহ আবু বকর আবহারী রহ. বলেন, তখন আমি মহিলাটিকে বললাম, পানির অবস্থা যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে পানি অপবিত্র; অন্যথায় পবিত্র।”^{১৪৯}

প্রিয় পাঠক! খতীব বাগদাদী রহ. এর বক্তব্য এবং উল্লিখিত তিনটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, বড় মুহাদ্দিস বা অনেক হাদীস জানলেই কেউ ফকীহ ও মুজতাহিদ হয়ে যায় না।

তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَرُبُّ حَامِلٍ فُقِهَ غَيْرُ فُقِيهِ.

“অনেক হাদীস বর্ণনাকারী (বা মুহাদ্দিস) ফকীহ নন।”^{১৫০}

আল্লাহ তাআলা সবাইকে প্রত্যেকের যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করার তাওফীক দিন। আমীন!

নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ সম্পর্কে দুটি কথা

প্রথমত: নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল হল, চার মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন পাঁচ জন গ্রহণযোগ্য ইলমী ব্যক্তিত্বের নাম কেউ উল্লেখ করতে পারবে না, যারা নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করেননি। চাই তিনি হাদীসের ইমাম হন, বা ফিকহের অথবা তাফসীর, তারীখ, রিজাল, যে কোনও শাস্ত্রেই তিনি ইমাম হোন না কেন! তবে হ্যাঁ, মানুষের যোগ্যতার

সিকাত’ গ্রন্থে (৮/৪৬৭), ইবনে আদী রহ. ‘আল-কামিল’ গ্রন্থে (৮/২৩৮), আবু নুআইম রহ. ‘মুসনাদে আবী হানীফার মুকাদ্দামাতে’ (পৃ. ২২), রহ. সাইমারী ‘আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী’তে (পৃ. ২৬) ও খতীব বাগদাদী রহ. ‘নাঈহাতু আহলিল হাদীস’ (পৃ. ৪৫) ও ‘আল-ফকীহ’ (২/১৬৪) কিতাবদ্বয়ে। এবং যাহাবী রহ. ‘মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা’তে (পৃ. ২৯) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সাথেও ইমাম আ’মাশ রহ. এর একই ঘটনা ঘটেছে। দেখুন, ‘জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফায়লিহী’ ও ‘আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী’।

^{১৪৯} তালবীসে ইবলীস, ইবনুল জাওযী পৃ. ১১৯।

^{১৫০} তিরমিযী ২৬৫৭, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।

স্তর ভেদে তাকলীদের ধরণ ভিন্ন হতে পারে। একজন সাধারণ ব্যক্তির তাকলীদ আর মুতাবাহির আলেমের তাকলীদ কখনো এক ধরণের নয়। এজন্যই তো তাকলীদের চারটি স্তর রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার এখানে সুযোগ নেই।

কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ ব্যাখ্যা অনুসরণে নির্দিষ্ট মাযহাব মানার পদ্ধতি সঠিক ও যথার্থ প্রমাণিত হবার জন্য এই এক দলিলই যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতির অনুসরণের মাঝে মানুষের দীন ও ঈমান হেফাযতের রহস্য নিহিত।

প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খানের কিতাব ‘আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ’ থেকে পৃষ্ঠা নং সহ কিছু ইমাম ও মুহাদিসগণের অনুসরণকৃত মাযহাব তুলে ধরা হলো:

ক্র.	মুহাদিস বা ইমাম	জন্ম-মৃত্যু/মৃত্যু হি.	মাযহাব	পৃষ্ঠা নং
১	ইমাম বুখারী রহ.	১৯৪-২৫৬	শাফেয়ী	৪৩৮
২	ইমাম মুসলিম রহ.	২০৬-২৬১	শাফেয়ী	৩৫১-৩৫২
৩	ইমাম নাসাঈ রহ.	২১৪-৩০৩	শাফেয়ী	৪৫৮
৪	আবু দাউদ রহ.	২০২-২৭৫	হাম্বলী/শাফেয়ী	৪৪৮-৪৪৯
৫	ইমাম তাহাবী	-৩২১	হানাফী	২২৪
৬	খতীব তিবরীযী	-৭৪১	শাফেয়ী	২৩৩
৭	ইমাম খাত্তাবী রহ.	-৩৮৮	শাফেয়ী	২২৩
৮	মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব	-১২০৬	হাম্বলী	২৬৩
৯	ইমাম নববী	৬৩১-৬৭৬	শাফেয়ী	২২৩, ৩৬৪
১০	ইমাম বগতী	-৫১৬	শাফেয়ী	২২৩
১১	আব্দুল কাদের জিলানী	৪৭০-৫৬১	হাম্বলী	৪৬৯
১২	ইমাম ইবনে তাইমিয়া	৬৬১-৭২৮	হাম্বলী	২৬৫
১৩	ইবনুল কাযিয়াম	৬৯১-৭৫১	হাম্বলী	২৬৫
১৪	ইবনে আব্দুর বার	৩৬৮-৪৬৩	মালেকী	২২৪
১৫	আব্দুল হক দেহলভী	৯৫৯-১০৫২	হানাফী	২৫৬
১৬	বদরুদ্দীন আইনী	৭৬২-৮৫৫	হানাফী	৩৩০, ৩৪৩
১৭	ইবনে রজব রহ.	৭৩৬-৭৯৫	হাম্বলী	৩৩৩

১৮	ইমাম কাস্তালানী	-৯২৩	শাফেয়ী	৩৪১
১৯	কাযী ইবনুল আরবী	-৫৪৩	মালেকী	২২৬, ৩৪৫
২০	শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী	১১১৪-১১৭৬	হানাফী	২৫৮-২৫৯
২১	ইবনে বাত্তাল	-৪৪৯	মালেকী	৩২৩
২২	ইমাম হালাবী	-৭৪৫	হানাফী	৩২৪
২৩	শামসুদ্দীন ইবনে আবদুদ দায়েম	-৮৩১	শাফেয়ী	৩২৭
২৪	ইমাম যারকাশী	-৭৯৪	শাফেয়ী	৩৩১
২৫	কাযী মুহিব্বুদ্দীন আহমদ		হাম্বলী	৩৩২
২৬	ইমাম বুলকিনী	-৮৪২	শাফেয়ী	৩৩৪
২৭	জালালুদ্দীন বাকরী	-৮৯১	শাফেয়ী	৩৩৭
২৮	ইবনে মারযুকী	-৮৪২	মালেকী	৩৩৬
২৯	রাযীউদ্দীন সাগানী		হানাফী	৩৪২
৩০	আহমদ বিন ইসমাইল কাউরানী		হানাফী	৩৪৩
৩১	ইমাম বাযদাভী	-৪৮৩	হানাফী	৩৪৪
৩২	ইমাম নাসাফী	-৫৩৭	হানাফী	৩৪৪
৩৩	শামসুদ্দীন দালীজী		শাফেয়ী	৩৩৭
৩৪	যাইনুদ্দীন আব্বাসী		শাফেয়ী	৩৩৮
৩৫	কামালুদ্দীন বিন মূসা দামীরী	-৮০৮	শাফেয়ী	৪০১
৩৬	ইবনুল মুলাক্কিন	-৮০৪	শাফেয়ী	৪০১
৩৭	ইমাম আবুল বাকা		শাফেয়ী	৩৩৭
৩৮	যাকারিয়া আনসারী	-৯২৬	শাফেয়ী	৩৬৭
৩৯	ইবনু সাইয়েদিন নাস ইয়া'মুরী	-৭৩৪	শাফেয়ী	৩৭৬
৪০	ইমাম তূসী		শাফেয়ী	৩৬১
৪১	শিহাবুদ্দীন রমলী	-৯৫৭	শাফেয়ী	৩৪৫

(আল-হিত্তাহ ফী যিকরীস সিহাহিস সিত্তাহ, তাহকীক: আলী হাসান আল-হালাবী, প্রকাশনা: দারুল জীল, বৈরুত ও দারু আম্মার, ওমান।)

এগুলো ছাড়া আরো কিছু ইমাম ও মুহাদ্দিসের নাম নিচে উল্লেখ করা হল, যারা নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করেছেন-

ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ, ইয়াহয়া ইবনে মাজীন, ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আবু ইয়া'লা মাওসিলী, আবু বকর জাস্সাস, ইবনুত তুরকুমানী, হাফেজ মুগুলতাই, হাফেজ যায়লায়ী, ইবনুল হুমাম, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা, মোল্লা আলী কারী, মুরতাযা যাবীদী, মাহমুদ আলুসী, আব্দুল হাই লাখনভী ও আবেদ সিন্দী রহ. প্রমুখ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

মালিকী মাযহাব অবলম্বন করেছেন আবুল ওয়ালীদ বাজী, কাযী ইয়ায, মুফাসসির কুরতুবী, মুসলিমের শারেহ কুরতুবী ও যুরকানী রহ. প্রমুখ।

ইমাম ইবনে খুযায়মা, দারাকুতনী, আবু নুআইম, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, খতীব বাগদাদী, ইবনে আসাকির, ফখরুদ্দীন রাযী, ইবনুস সালাহ, ইমাম মুনযিরী, কাযী বায়যাবী, ইমাম যাহাবী, তকীউদ্দীন সুবকী, তাজুদ্দীন সুবকী, ইবনে কাছীর, ওলীউদ্দীন ইরাকী, আবু যুরআ ইরাকী, নুরুদ্দীন হায়ছামী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজার মাক্কী, সাখাভী, সুয়ূতী ও মুনাভী রহ. প্রমুখ শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেছেন।

আর আবু বকর খাল্লীল, আব্দুল গণী মাকদেসী, ইবনে কুদামা, যিয়াউদ্দীন মাকদেসী, ইবনু আদিল হাদী রহ. প্রমুখ হাম্বলী মাযহাবের মতামতকে সামনে রেখে চলতেন। এছাড়া চার মাযহাবের 'তবাকাত' গ্রন্থসমূহে আরো অনেকের নাম রয়েছে।

প্রখ্যাত সৌদি আলেম শায়খ সালেহ আল-ফাউযান লিখেছেন,

وما هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبلين، والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفياً، والإمام ابن عبد البر كان مالكياً.

“লক্ষ্য করুন! মুহাদ্দিসগণের মাঝে এঁরা হলেন একেকজন বড় বড় ইমাম। এঁরা সবাই মাযহাব অনুসরণ করতেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাযিয়ম ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম নববী ও ইবনে হাজার আসকালানী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম তাহাবী হলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম ইবনে আদিল বার হলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী।”^{১৫১}

দ্বিতীয় কথা হল, ইমামগণের নিকট নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করা কতটা গুরুত্ববহ ছিল, তার উপলব্ধি এভাবেও করা যায়। তা হল, তারাজিম ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে রয়েছে, ইসলামী উলূমের কর্ণধার অনেক ইমাম বিশেষ কারণে এক মাযহাব পরিত্যাগ করে অন্য মাযহাবের অনুসরণে দিলের প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। যেমন:

১. ইমাম তাহাবী রহ. শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী হয়েছেন।
২. ইমাম আবু সাউর রহ. হানাফী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন। ৩. ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. মালিকী মাযহাব ছেড়ে শাফেয়ী হয়েছেন। ৪. ইমাম সামআনী রহ. হানাফী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন। ৫. ইমাম আমেদী রহ. হাম্বলী মাযহাব ছেড়ে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী রহ. (মৃ. ৯১১ হি.) ‘জাযীলুল মাওয়াহিব ফী ইখতিলাফিল মাযাহিব’ পুস্তিকায় যারা অন্য মাযহাব ছেড়ে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেছেন, তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এভাবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্কালাভী রহ. (মৃ. ১৪০২ হি.) ‘লামিউদ দারারী’র মুকাদ্দিমায় অন্য মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেছেন- এমন অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও অনেক ইমামের নাম রয়েছে।

যদি বাস্তবে ভিন্ন ভিন্ন ইমাম ও মাযহাব অনুসরণ করার সুযোগ থাকত, তবে ইলমে দ্বীনের ইমামগণ তা না করে একেবারে মাযহাব পরিত্যাগ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? কেন তারা আমূল বদলে গিয়ে এক মাযহাব থেকে পাক্কা আরেক মাযহাবের অনুসারী হতে গেলেন? তাঁরা কি পারতেন না কিছু বিষয়ে শাফেয়ী, কিছু বিষয়ে হাম্বলী, আর কিছু বিষয়ে অন্য কোন মাযহাবের অনুসারী হতে? এ ক্ষেত্রে কে বা কী বাঁধ সাধল ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল? একটু ভাবার সময় হবে কী?

নাকি দুঃসাহস দেখিয়ে কেউ বলে বসবে, তারা ইজতিহাদ, তাকলীদ ও নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের ভাল-খারাপ ও বিধি-নিষেধ বুঝতে সক্ষম হননি! যদি ইসলামী উলূমের সম্মানিত ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহর মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণীয় হয়ে থাকেন, তবে তাকলীদ-ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও তাঁদের নির্দেশনা অনুকরণের ভেতরই উম্মাহর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দ্বীনের অবক্ষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে মুক্ত তাকলীদ নিষেধ করে উম্মাহর জন্য নির্দিষ্ট মাযহাবী বলয়ের সীমানা ঐকে দেয়া ইমামদের সর্বসম্মত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। আমরা তাঁদের এ সিদ্ধান্তের উপর পা রেখে নতুন কোনও ভাবনাকে প্রশ্রয় দিব

না। এবং প্রাচ্যবিদদের চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত কারো ওয়াসওয়াস কান দিয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব না।

আশ্চর্যবোধ হয়, ওই সমস্ত বন্ধুদের উপর, যারা তাকলীদ বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানাকে শিরক বলে। অথচ নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ইমাম মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তাহাবী ও বায়হাকী রহ. প্রমুখের হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে দলিল-প্রমাণ পেশ করে; নববী-খাতাবীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে; হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে ইবনে আদিল বার, ইবনুল জাওয়ী, যাহাবী, যায়লায়ী ও ইবনে হাজারের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে।

তাকলীদ করা যদি শিরক হয়, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গ সবাই মুশরিক হয়ে যায়! আবার তাঁদের কাছ থেকেই দলিল গ্রহণ করে তাকলীদ-মাযহাবকে শিরক বলে এর বিরোধিতার স্লোগান দেওয়া এবং লোকদেরকে মাযহাব অনুসরণ থেকে বিমুখের অপচেষ্টা করা?! আল্লাহ পাকই জানেন এ স্ববিরোধিতার শেষ কোথায়!!

নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ সম্পর্কে বাকি কথা দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনার ইচ্ছে রয়েছে, ইনশাআল্লাহ!

অপব্যাক্ষ্যার কিছু নমুনা:

উন্নত যুগে দীন ইসলামের প্রচার প্রসার যেভাবে এগিয়ে নিয়েছেন ধারক বাহকরা, তেমনিভাবে বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে নেই কুরআন-হাদীসের অপব্যাক্ষ্যাকারীরা। হোক তা কলমের ডগায় কিংবা সাহিত্যের পাতায়, সরাসরি বক্তৃতায় কিংবা মিডিয়ার পর্দায়।

এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন টিভিতে ইসলামিক প্রোগ্রামের নামে এবং ইন্টারনেট ও ফেসবুক ইত্যাদিতে দেদারছে চলছে কুরআন-হাদীসের তাহরীফ ও অপব্যাক্ষ্য। এমন দু'একটি অপব্যাক্ষ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যা আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবীরা করে থাকে।

প্রথম অপব্যাক্ষ্য:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

“তোমাদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান কর। যদি তোমরা ...।”^{১৫২}

আয়াতটির উক্ত অংশ উল্লেখ করে তারা বলে থাকে, যদি কোনও বিষয়ে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান নিতে

হবে। কোনও ইমাম বা মাযহাব থেকে নয়। এ আদেশ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, চাই আলেম হোক বা সাধারণ হোক।

অথচ আয়াতের এ অংশের আদেশটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য নয়; বরং মুজতাহিদগণকেই সম্বোধন করে উক্ত আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনটি ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. ‘আহকামুল কুরআন’ গ্রন্থে এবং প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব রহ. ‘তাফসীরে ফাতহুল বয়ান’ এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।^{১৫৩}

নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের ভাষ্য,

والظاهر أنه خطاب مستقل مستأنف موجه للمجتهدين.

“এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে মুজতাহিদগণকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।”

আরো একটু বিস্তারিত করে বললে এভাবে বলা যায়। বিধান সম্বলিত কুরআন-সুন্নাহ যেমন দু’ধরনের, তেমনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণের যোগ্যতার দিক থেকেও মানুষ দু’শ্রেণীর।

এক. যারা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার দলিল থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম। সুনির্দিষ্ট উসূল-নিয়ম অনুযায়ী ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন। শরীয়তের পরিভাষায় যাদেরকে ‘মুজতাহিদ’ বলা হয়।

দুই. প্রথম শ্রেণীর মত যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না। এ ধরনের মানুষের কর্তব্য হলো, মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাখ্যা ও সমাধানের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা। এ স্তরের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ আয়াতটিরই প্রথমাংশে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের, আর তোমাদের মধ্যে যারা ‘উলুল আমর’ তাঁদের।”^{১৫৪}

আয়াতটির ব্যাখ্যায় প্রায় তাফসীর গ্রন্থে রয়েছে, সাহাবী হযরত জাবের ও ইবনে আব্বাস রা. এবং তাবেয়ী মুজাহিদ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, আবুল আলিয়া, হাসান বসরী, দাহ্হাক ও আতা ইবনুস সাযিব রহ.

^{১৫৩} আহকামুল কুরআন ২/২৬৪; তাফসীরে ফাতহুল বয়ান ৩/১৫৮, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া।

^{১৫৪} সূরা নিসা ৫৯, আয়াতের শুরু অংশ।

প্রমুখের মতে ‘উলুল আমর’ শব্দটি দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী ইমাম ও মুজতাহিদগণকে বুঝানো হয়েছে।

কাজেই আয়াতটির শুরু অংশে মুসলমানদেরকে আল্লাহ, রাসূল ও ইমামগণের আনুগত্য করার আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ থেকে যদি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করতে হবে। আর অস্পষ্ট হলে ইমামদের ব্যাখ্যা মেনে তাঁদের আনুগত্য করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে, তাকলীদ।

তাহলে আয়াতের মর্ম দাঁড়াল, সাধারণ মুসলমানরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণ করে। কাজেই এখানে জ্ঞানের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে প্রথম শ্রেণী তথা মুজতাহিদগণের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যার সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে, কঠিন ও অস্পষ্ট বিধানসমূহে তাঁদের সমাধানের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ এর অনুসরণ করা।

আর উক্ত আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে,

“তোমাদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস কর।”

সুতরাং আয়াতটি থেকে একথা প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই যে, ইজতিহাদে অক্ষম ও সাধারণ ব্যক্তির বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ এর সাহায্যে সমাধান করবে। কেননা তাদের সে যোগ্যতা নেই। তাই তাদের উদ্দেশ্যে আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, মুজতাহিদ ইমামগণ যে সমাধান প্রদান করবেন সে অনুযায়ী আমল করবে। আর আয়াতের শেষাংশে মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তারা যেন এর সমাধানের লক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দ্বারস্থ হয়। এরপর নিজেদের ইজতিহাদী যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সমাধান খুঁজে বের করে।

অতএব প্রমাণিত হল, এ আয়াতের শেষাংশে জ্ঞানের প্রথম স্তর তথা মুজতাহিদগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইজতিহাদ করতে। আর প্রথমাংশে জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর তথা ইজতিহাদ করতে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে তাঁদের অনুসরণ ও তাকলীদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইজতিহাদে অক্ষম ও সাধারণ ব্যক্তির বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দ্বারস্থ হয়ে সমাধান করবে- এমন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আদেশ আয়াতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় অপব্যাখ্যা:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর একটি ঘটনা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ‘মুসনাদে আহমদে’ এবং ইমাম তাহাবী রহ. ‘শরহ মাআনিল আসারে’ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَضَلَلْتَ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا عُرْيَةُ؟ قَالَ: تَفْتِي النَّاسَ أَنَّهُمْ إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلُّوا, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجِيئَانِ مُلَبَّيْنِ بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالَانِ مُحْرَمَيْنِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِهَذَا ضَلَلْتُمْ؟ أَعَدَّتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَدَّثُونِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا أَعْلَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ.

“একদা হযরত উরওয়া রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আপনি মানুষকে পথভ্রষ্ট করছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, কীভাবে? উরওয়া বললেন, আপনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, তাওয়াফ শেষ হলে হালাল হয়ে যাবে। অথচ হযরত আবু বকর ও ওমর রা. হজ শেষে তালবিয়া পড়তেন এবং ঈদের দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন,

এ কারণে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো? আমি তোমাদেরকে রাসূল এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. এর বক্তব্য বর্ণনা করছো। তখন হযরত উরওয়া রা. বললেন, নিশ্চয় হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. রাসূল এর আমলের ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন।”^{১৫৫}

ইমাম তাবরানী রহ. উক্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

“... হযরত ইবনে আব্বাস রা. উরওয়াকে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল এর উপর তাঁর সাহাবীদেরকে প্রাধান্য দাও? হযরত উরওয়া বললেন, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল এর সুনাতের ব্যাপারে আপনার ও আমার চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন।”

উরওয়া থেকে বর্ণনাকারী ইবনে আবি মুলাইকা রহ. বলেন, “এভাবে হযরত উরওয়া ইবনে আব্বাস রা. এর সাথে বিতর্ক করলেন।”^{১৫৬}

এখানে লা-মাযহাবী ভাইয়েরা যে অপব্যাখ্যাটা করে থাকে, তা হল তারা উক্ত ঘটনা ও কথোপকথন এর শুধু প্রথমাংশ অর্থাৎ

“এ কারণে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো? আমি তোমাদের কাছে রাসূল এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. এর বক্তব্য বর্ণনা করছো।”

উল্লেখ করে মাযহাব অনুসারীদেরকে বলে, “আমরা রাসূল এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তোমরা আবু হানীফা-শাফেয়ীর বক্তব্য বর্ণনা করছো।”

অথচ ঘটনাটির শেষাংশে যে রয়েছে,

“উরওয়া রা. বললেন, নিশ্চয় হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. রাসূল এর আমলের ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন।”

তা বলে না। কেননা তখন অপব্যাক্যার সুযোগ যে আর থাকবে না। বরং তখন হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। কারণ তখন তো আমরা একথা বলার সুযোগ পাব যে,

“রাসূল এর সুন্নাহের ব্যাপারে তাঁরা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।”^{১৫৭} কেননা রাসূল এর সুন্নাহ অনুসরণে তাঁরা খুবই আগ্রহী ও দৃঢ় ছিলেন। তাঁরা হাদীস থেকে যা বুঝেছে, তাই আমাদেরকে জানিয়েছে।”

উল্লেখ্য, হযরত ইবনে আব্বাস রা. যখন রাসূল এর একটি কাজ দেখেছেন, তখন তার উপর আমল করতে বিলম্ব করা সমীচীন মনে করেননি। সাধারণ মানুষ রাসূল এর আমল ছেড়ে অন্যের কথার উপর আমল করুক, সেটাকে বিভ্রান্তিকর মনে করা তাঁর জন্য শোভনীয়। কেননা তিনি রাসূল এর থেকে এর বিপরীত আমলটি জানেন না।

এভাবে হযরত উরওয়া রা. এর বক্তব্যও যথাস্থানে সঠিক। কেননা আমরা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. এর কথার উপর আমল করে রাসূল এর সুন্নাহ থেকে বিমুখ হচ্ছি না। আমাদের সম্মুখে দু’টি বিষয় রয়েছে। একটি বিষয় হযরত ইবনে আব্বাস রা. প্রত্যক্ষ করেছেন, আরেকটি বিষয় হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন আমরা হযরত আবু বকর ও ওমর রা. এর বক্তব্যকে ইবনে

^{১৫৬} আল- মু’জামুল আওসাত, হাদীস নং ২১।

^{১৫৭} এখানে ‘অধিক জ্ঞাত’ বিশেষণের ব্যবহার সংগত নয়। কেননা তাদের ইলমের তুলনায় তোমাদের ইলমের কোন তু নাই হয় না।

আব্বাসের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দেবো। কেননা তারা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে রাসূল এর অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন।

শায়খ আওয়ামা (হাফিয়াহুল্লাহ) তাঁর মূল্যবান ও খুবই উপকারী কিতাব ‘আসারুল হাদীসিশ শারীফ ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা’তে বলেন,

“আমরা ওদেরকে একই উত্তর প্রদান করবো, যারা ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর ফিকহ পরিত্যাগ করে এর পরিবর্তে তারা বিভিন্ন নামে নিজেদের ফিকহ উদ্ভাবন করেছে। যেমন, ‘ফিকহুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ’ অথবা ‘ফিকহুস সুন্নাহ’ এজাতীয় বিভিন্ন নাম দিয়ে মানুষকে সুন্নাহ অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে থাকে।

আমরা তাদেরকে বলবো, আমরা উল্লিখিত ইমামদের পরিবর্তে তোমাদেরকে কখনও তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি না। কেননা রাসূল এর সুন্নাহের ব্যাপারে তাঁরা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।”^{১৫৮}

সারকথা, তারা উক্ত ঘটনার খণ্ডিত অংশ তথা ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য উল্লেখ করে অপব্যাক্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং ইমাম ও মাযহাবের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করে।

তৃতীয় অপব্যাক্য:

একবার এক লা-মাযহাবী ভাই আমাকে মোবাইল করে তাকলীদ-মাযহাব-সম্পর্কে দীর্ঘ সময় আলাপ করেন। তিনি আমার কাছে তাকলীদের দলিল জানতে চান। আমি তাকে لَا كُتُبَ إِلَّا الذِّكْرُ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।”^{১৫৯} আয়াতটি বলি। আমি আয়াতটি শেষ করতে না করতেই তিনি আমাকে বললেন, হুজুর! সামনে পড়েন; আয়াত তো পুরো হয় নাই। অর্থাৎ সামনে যে بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ শব্দ রয়েছে, তা সহ পড়তে হবে। কারণ এ আয়াতে দলিলসহ জিজ্ঞাসা করা ও জেনে নেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। কাজেই দলিলসহ জেনে নেওয়া ওয়াজিব। আর দলিলসহ জানলে তখন আর তাকলীদ হয় না।

উত্তর : প্রথমত: সাহাবা ও তাবয়ীগণের কর্মধারা ছিল, সাধারণরা প্রয়োজনে ইমাম ও ফকীহগণের নিকট সমাধান জিজ্ঞাসা করতেন। আর

তঁারা সাধ্যমত জবাব দিতেন। জবাবের সাথে দলিলসহ জেনে নেওয়া বা দলিল উল্লেখ করার কোনো আবশ্যিকতা ছিল না। ‘মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক’, ‘মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা’ ও ‘আল-আওসাত লি-ইবনিল মুনযির’ ইত্যাদি কিতাব খুললেই দেখতে পাবেন যে, এ গ্রন্থগুলোতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের হাজার-হাজার ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রায় ফাতাওয়াতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কেউ আপন ফতোয়ার সাথে কুরআন-হাদীস থেকে দলিল পেশ করেননি। যদি দলিলসহ জেনে নেওয়া ওয়াজিব হয়, তাহলে সাহাবা-তাবেয়ীগণ (নাউযুবিল্লাহ) ওয়াজিব তরককারী সাব্যস্ত হবেন।

দ্বিতীয়ত: আল্লামা আমিদী রহ. (মৃত্যু ৬৩১হি.) বলেন,

وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤا لهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً.

“আর ইজমার বিবরণ হলো, (ভিন্নমত পোষণকারীদের আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত) সাহাবা ও তাবেয়ী যুগে সাধারণ মানুষ মুজতাহিদগণ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করত এবং শরয়ী আহকামের ক্ষেত্রে তঁাদের অনুসরণ করত। মুজতাহিদ ফকীহগণ তাদেরকে দলিল উল্লেখ করা ছাড়াই ফতোয়া প্রদান করতেন। কেউ তাদেরকে এভাবে ফতোয়া প্রদান করা থেকে বারণও করত না, আপত্তিও তুলত না। অতএব এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সাধারণ মানুষ সর্বাবস্থায় (দলিল উল্লেখপূর্বক কিংবা তা ব্যতীতই) মুজতাহিদের অনুসরণ করবে।”^{১৬০}

উক্ত বক্তব্যটি শুধু তাঁর নয়, বরং খতীব বাগদাদী, ইবনুস সালাহ, ইমাম নববী, ইবনুল হাজেব, ইবনে কুদামা মাকদেসী, ইবনে হামদান, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, ইমাম শাতেবী, ইবনুল হুমাম ও ইবনে আমীর হাজ রহ. সহ প্রায় ইমামের সিদ্ধান্ত।^{১৬১}

তৃতীয়ত: সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতের (فاسألوا) এর সাথে ৪৪ নং আয়াতের (باليينات والزبر) এর সম্পর্ক যুক্ত করে নিজেদের দাবির অনুকূলে

^{১৬০} আল-ইহকাম লিল-আমেদী : ৪/৪৫১।

^{১৬১} ‘আল-ই-তিমাদ ফী তাওদীহিল ইকতিসাদ’ গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ সহ আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা দেওয়ার যে চেষ্টা করা হয়েছে, তা নিতান্তই অসারতা। কেননা মুফাসসিরগণ ও অনেক ইমাম তাকলীদ সংক্রান্ত আলোচনায় উক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন। (যেমন ইতিপূর্বে তাকলীদ সংক্রান্ত আলোচনাতে লক্ষ্য করেছেন বা আবার দেখে নিতে পারেন) কিন্তু তাঁরা এমন অপব্যাখ্যা করেননি। অর্থাৎ আয়াতের সাথে (بالينات والزبر) এর সম্পর্ক যুক্ত করে দেননি। আর এটা যে অপব্যাখ্যা, তা হাদীস থেকেও বুঝা যায়। কেননা একই মর্মের সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, **إِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ**।

“না জানলে কর্তব্য হল, (জ্ঞানীদেরকে) জিজ্ঞাসা করা।”^{১৬২}

উক্ত হাদীসে তো দলিলসহ জিজ্ঞাসা করা বা জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়নি। যদি তা ওয়াজিব হত, তাহলে হাদীসে উল্লেখ হত এবং সাহাবা-তাবেয়ীগণও তা আমল করতেন। কিন্তু তাঁরা তো ওয়াজিব মনে করেননি।

এছাড়া সর্বদা প্রমাণ উল্লেখ করা বা দলিল জানার আবশ্যিকতার ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো দলিলও নেই এবং সাধারণদের তো দলিল বুঝার যোগ্যতাও নেই। এরপরও জন্য দলিল জানা আবশ্যিক মনে করা একটি অবাস্তব দাবি। শরীয়ত যা আবশ্যিক করেনি তা নিজ থেকে অপরিহার্য করার নামাস্তর। বরং খতীব বাগদাদী রহ. বলেছেন, মুতায়িলা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ উক্ত দাবি করেছেন।^{১৬৩}

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিভ্রান্তকারীদের এ সমস্ত অপব্যাখ্যা শুনে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে হেফাজত করুন।

প্রিয় পাঠক! ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এ খণ্ডের জন্য এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। যদিও আরো কিছু জরুরী কথা বাকি রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওফীক শামিলে হাল হলে দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনার ইচ্ছে রইল।

^{১৬২} আবু দাউদ, হা. ৩৩৬, হাদীসটির আরো সনদ ও শাওয়াহেদ রয়েছে, তাই এটি সহীহ লিগায়রিহী।

^{১৬৩} আল-ফকীহ ওয়াল মুতাক্কিহ ২/১৩৪।

বই প্রসঙ্গে কিছু কথা

দারুল উলূম হাটহাজারীর ‘দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ’টি ইসলাম নির্মূলে আত্মসী বিভিন্ন ফিতনার উদ্ভব ও প্রভাব বৃদ্ধির কারণে এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে খোলা হয়েছে।

এ বিভাগে যুগের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে খৃস্টান, হিন্দু, শিয়া, কাদিয়ানী, বেরেলভী ও মওদুদী ইত্যাদি মতবাদের পাশাপাশি লা-মাযহাবী ও আহলে হাদীস সম্পর্কেও দরস, মুহাযারা, মুনাযারা ও সেমিনারের ব্যবস্থা রয়েছে। এবং ছাত্রদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও যোগ্যতা সমৃদ্ধ ও বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় ও ফিরকার উপর তামরীন ও অনুশীলনমূলক প্রবন্ধ লেখানো হয়ে থাকে।

এদিকে অধর্মের যিম্মায় ন্যাস্ত হয়েছে ইজতিহাদ-তাকলীদ এর মতো জটিল ও কঠিন বিষয়টি। সেই সুবাদে ১৪৩৭-৩৮ হিজরির তালেবে ইলম ভাইদের ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর তামরীন করানো হয়েছিল। উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে অনেকেই সন্দিহান ও প্রশ্নের সম্মুখীন। তাই বড়-ছোট অনেকের হুকুম ও আবদার ছিল এবং দিলেরও তামান্না ছিল এ সম্পর্কে কিছু লিখার। সব মিলিয়ে আল্লাহর ফযলে তালেবে ইলম ভাইদের তামরীনকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু হল।

তাদের প্রায় তামরীনগুলোকে নতুন করে লিখে নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ করে এখানে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জটিল ইলমী বিষয় ও বিরক্তিকর দীর্ঘ আলোচনা সাধারণত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। আর তালেবে ইলম ভাইদের হিম্মত আফযায়ীর উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দুটি বিষয় তথা ‘মাযহাব পরিবর্তন করা’ ও ‘ভিন্ন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান’ হযরতুল উস্তাদ মাওলানা মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী (দামাত বারাকাতুহুমকে) শুনানো হয়েছে। তবে সবই শুনতে পারলে ভালো হত এবং দিল পূর্ণ ইতমীনান হত।

হযরত মুহতামিম সাহেব হুজুরের নির্দেশনা ছিল ছোট বই তৈয়ার করার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে একটু বড় হয়ে গেছে। যেমন এত দীর্ঘ ভূমিকা লেখার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু পুরো লেখাটি একটা আরেকটার সাথে সম্পর্ক থাকায় এবং পিছের আলোচনা সামনের আলোচনার দাবি রাখায় একটু লম্বা হয়ে গেছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, বেশ কিছু উপকারী তথ্য-

উপাত্ত উঠে এসেছে। যেমন শরীয়তে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব এর ক্ষেত্র ও পরিধির বিস্তারিত আলোচনা, তাকলীদ ও মাযহাবের মূল ও শেষ কথা, শরীয়তে এগুলোর প্রকৃত কারণ ও বৈধতা, এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় ও বাস্তবতা, ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের তত্ত্বকথা, বিরোধীদের অবস্থা ও প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি আরো কিছু বিষয়ে শালীন ভাষায় গঠনমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের এ রচনা ও আলোচনার উদ্দেশ্য কারো প্রতি বা কোন দলের প্রতি আক্রোশবশত নয়, বরং হক ও সত্যকে প্রচার করা ও অর্পিত দায়িত্ব আদায় করা এবং বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির কবলে পড়ে দীন বিকৃত হওয়া থেকে হেফাজত করার লক্ষ্যে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এরপরও কেউ কষ্ট পেলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বীকৃত কথা, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয় এবং বইটিতে যে পরিমাণ সময় দেওয়া দরকার ছিল বিভিন্ন ঝামেলার কারণে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই ভুল হওয়াটা বা থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর এখানে ভাষা সম্পাদনার চেয়ে বিষয় সম্পাদনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই ভাষাগত ভুল বা উপস্থাপনে জটিলতা কিংবা তথ্যগত অসঙ্গতিও থাকতে পারে। যদি ক্ষমাযোগ্য হয় এড়িয়ে যাবেন, এর বিপরীত হলে সমালোচনা না করে, বরং আমাদেরকে জানিয়ে মুহসিনদের কাতারে शामिल হবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ!

এ বইটি আলোর মুখ দেখতে কিছু ভাই বিশেষত শফিকুল ইসলাম (মেখল), মাহমুদ (পটুয়াখালী) ও ইশতিয়াক সিদ্দিকী মেহনত ও সহযোগিতা করেছে। আমি কিছু দিয়ে তাদেরকে খুশি করা সম্ভব নয়, বরং যার দেওয়ায় সবাই খুশি হয় ও মন ভরে যায়, দুআ করি তিনি যেন নিজ শান অনুযায়ী তাদেরকে দান করেন, তাদেরকে মওত পর্যন্ত দ্বীনের খিদমাতে লাগিয়ে রাখেন এবং সুন্দর ও বরকতময় জীবন দান করেন।... আমীন!

হে আল্লাহ! আমাদের এ মেহনতকে এখলাছের সাথে কবুল করুন এবং বইটিকে মাকবুলে আম দান করুন। আমীন!

বান্দা সাঈদ আহমদ
দারুল উলূম হাটহাজারী
৯/৭/৩৯হি.

তাকলীদ পরিচিতি

প্রশ্ন :- তাকলীদ অর্থ কী?

উত্তর :- তাকলীদ অর্থ, গ্রহণ ও অনুসরণ। পরিভাষায়, দলিল-প্রমাণ চাওয়া ব্যতীত কোনো ইমামের জ্ঞান ও সততার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁর ব্যাখ্যা মতে কুরআন-হাদীস অনুসরণ করার নাম তাকলীদ।^{১৬৪}

অর্থাৎ তাকলীদ কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করার একটি মাধ্যম। কুরআন-সুন্নাহতে কোনো জটিলতা থাকলে ইমামের শরণাপন্ন হয়ে তার নিরসন ও ব্যাখ্যা খোঁজা এবং সে অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করাই তাকলীদের সহজ-সরল ব্যাখ্যা। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণই তাকলীদের মুখ্য বিষয়। এ বাস্তবতাটি সুস্পষ্টভাবে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

تقليد کی تفسیر یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارشادات پر عمل کرتے ہیں

اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہ بیان کی ہے۔

“তাকলীদের ব্যাখ্যা এই যে, আমরা ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও নির্দেশনাসমূহ ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করি।”^{১৬৫}

মূলত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহী ব্যাখ্যা ও সমাধান হাদীসেরই তাফসীর। তাইতো ইমাম ইবনুল মোবারক রহ. (মৃ. ১৮১ হি.) বলেছেন,

لا تقولوا رأي أبي حنيفة، بل قولوا تفسير الحديث.

“তোমরা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর (ফিকহী ব্যাখ্যাকে) ‘রায়’ বলো না; বরং বলো, ‘হাদীসের ব্যাখ্যা’।”^{১৬৬}

সুতরাং বুঝা গেল, তাকলীদের মূল হলো- কুরআন-সুন্নাহরই অনুসরণ করা। আর তা এভাবে যে, কোনো ইমামের ইল্ম ও আমলের উপর সু-

^{১৬৪} আত-তা'রীফাত, জুরজানী ৪৭; মু'জামু মাকালীদিল উলুম, সুয়ুতী ৬৭; ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কি আখেরী ফায়সালা ৪৫ ও ৪৮।

^{১৬৫} আশরাফুল জাওয়াব, থানভী ১৬১-৬২।

^{১৬৬} ফায়ায়েলে আবী হানীফা পৃ. ১০১।

ধারণা ও আস্থা-বিশ্বাস রেখে দলিলের উপর নির্ভর না করে তাঁর ব্যাখ্যা মতে আমল করা। যেভাবে দেশের নাগরিকরা আইন ও সংবিধান মেনে চলেন উকিল-বিচারপতিদের ব্যাখ্যা মতে।

এই অর্থে বর্তমান ‘আহলে হাদীস’ ভাইয়েরাও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর তাকলীদ ও অনুসরণ করেন। কারণ তিনি নিজের ফাতাওয়া ও রেসালাতে (যেমন ‘রেসালায়ে ম্যাযালেম’এ) দলিলবিহীন মাসআলা উল্লেখ করেছেন। এরপরও তারা তাঁর তাকলীদ ও অনুসরণ করেন।^{১৬৭}

প্রশ্ন :- তাকলীদ কি দলিলবিহীন অনুসরণের নাম?

উত্তর :- না, তাকলীদ হলো- দলিলসহ দলিলের তলববিহীন অনুসরণ। কারণ তাকলীদকৃত বিষয়টি মুজতাহিদ ইমামের কাছে বিস্তারিত দলিলসহ আছে। কিন্তু মুকাল্লিদরা ইমামের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে দলিল চাওয়া ব্যতীত ও দলিল না জেনেই কিংবা দলিলের উপর নির্ভর না করে তাঁর অনুসরণ করেন। যেভাবে রোগীরা ডাক্তারের কথা প্রমাণ চাওয়া ব্যতীত তার অভিজ্ঞতা ও কল্যাণকামীতার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে মেনে চলেন।

সারকথা, একটি হলো- দলিল না থাকার কারণে দলিলবিহীন অনুসরণ। আরেকটি হলো- দলিল আছে, তবে দলিল জানার উপর নির্ভর না করে দলিলের তলববিহীন অনুসরণ। তাকলীদ হলো দ্বিতীয়টির নাম।

প্রশ্ন :- তাকলীদ কি ‘অন্ধ বিশ্বাস’-এর নাম?

উত্তর :- কখনো না, বরং তাকলীদ হলো- ‘স্বচ্ছ বিশ্বাস’এর নাম এবং অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা গ্রহণের নাম। যেভাবে কোনো রোগী একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াটা ‘অন্ধ বিশ্বাস’এর ভিত্তিতে না হয়ে ‘স্বচ্ছ বিশ্বাস’এর ভিত্তিতে হয়। এবং ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করাটা মেডিকেল সাইন্স সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঠিক তদ্রূপ একজন মুকাল্লিদ কোনো ইমামের শরণাপন্ন হওয়া ও মাযহাব অনুসরণ করাটা ‘অন্ধ বিশ্বাস’এর ভিত্তিতে না হয়ে ‘স্বচ্ছ বিশ্বাস’এর ভিত্তিতে হয়। এবং ইমামের ব্যাখ্যা গ্রহণ করাটা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়।

প্রশ্ন :- তাকলীদের অর্থ তো গরু-ছাগল, কুকুর ও চতুষ্পদ জন্তুর গলায় শেকল লাগানো, লাগাম পরানো ও রশি লাগানো ইত্যাদি। এটি তো মানুষের জন্য লজ্জাকর বিষয়?

উত্তর :- তাকলীদ শব্দটি ‘কিলাদাহ’ শব্দ থেকে নির্গত। ‘কিলাদাহ’ শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে, যার ভিত্তিতে তাকলীদ শব্দটিও একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কিলাদাহ’ শব্দটি চতুস্পদ জম্বুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে অর্থ হয়- গলায় শেকল লাগানো, লাগাম পরানো বা রশি লাগানো ইত্যাদি। আর মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার হলে, তখন অর্থ হয় গলার মালা বা হার।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ ‘লিসানুল আরব’এ রয়েছে-

القلادة: ما جعل في العنق يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تُهْدَى ونحوها، وقلدت المرأة فتقلدت هي.

“কিলাদাহ বলা হয়, যা গলায় পরা হয়। তা মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর জন্যও ব্যবহার হয়। (মানুষের ক্ষেত্রে তা গলার মালা বা হার। যেমন বলা হয়,) আমি মহিলাটিকে হার পরালাম, আর সে পরে নিল।”^{১৬৮}

আল্লামা মুরতাযা যাবীদী রহ. ‘তাজুল আরুস’ অভিধানগ্রন্থে লিখেন,
قَلَدْتُهَا قِلَادَةً بِالْكَسْرِ وَقِلَادًا: جَعَلْتُهَا فِي عُنُقِهَا فَتَقَلَّدَتْ، وَمِنْهُ التَّقْلِيدُ فِي الدِّينِ.

“আমি মহিলাটির গলায় হার পরালাম, আর সে পরে নিল। অতঃপর বলেন, ‘এই অর্থেই বলা হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে তাকলীদ’।”

একজন মুকাল্লিদ যেহেতু স্বীয় ইমামের ইলম ও খোদাভীতির উপর নির্ভর করে তাঁর মতামত কে নিজের গলায় মালা বানিয়ে নেন, তাই তাদের ক্ষেত্রে তাকলীদ শব্দ ব্যবহার করা হয়।^{১৬৯}

হাদিসের আলোকেও বিষয়টি প্রমাণিত। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, استعارت من أسماء قلادة.

“তিনি আসমা রা. থেকে একটি হার ধার নিয়েছিলেন।”^{১৭০}

অন্য বর্ণনায় হযরত আয়েশা রা. বলেন, انسلت قلادة من عنقي فوقعت.

“আমার গলা থেকে হার ছিড়ে পড়ে যায়।”^{১৭১}

তাছাড়া এই বিষয়ে ‘বুখারী শরীফে’ দুটি অধ্যায় রয়েছে-

باب القلائد والسُّخَابِ لِلنِّسَاءِ يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ، باب استعارة القلائد.

^{১৬৮} লিসানুল আরব ৭/৪৬৮; আস-সূরাহ ১৪৩।

^{১৬৯} আরও দেখুন, লিসানুল আরব ৭/৪৬৫; আল-মুফরাদাত পৃ. ৭২; আল মু’জামুল ওয়াহীত পৃ. ৮১।

^{১৭০} বুখারী ১/৫৩২; মুসলিম ১/১৬০।

^{১৭১} মুসনাদে আহমদ ৬/২৭২।

তথায় ইমাম বুখারী রহ. এমন হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা ‘কিলাদাহ’ অর্থ হার বুঝা যায়।

সুতরাং জানা গেল, মানুষের ক্ষেত্রে গলায় শেকল লাগানো, লাগাম পরানো বা রশি লাগানো ইত্যাদি অর্থ নেওয়া যাবে না। কেননা তাকলীদের এই অর্থ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই এমন অর্থ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকটু প্রচন্দ একে বিভ্রান্তি ছড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এসব অবাস্তব ও অবাস্তুর বিষয় অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্ন :- তাকলীদ ও ইত্তিবার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি?

উত্তর :- প্রিয় পাঠক! তাকলীদ ও ইত্তিবার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

* শাস্তিক অর্থে দুটি সমার্থবোধক শব্দ। ইত্তিবা অর্থ অনুসরণ ও অনুকরণ, তাকলীদ অর্থও অনুসরণ ও অনুকরণ।

* পরিভাষার দিক থেকেও তাকলীদ ও ইত্তিবা এক ও অভিন্ন। কারণ পরিভাষাবিদ ও উসূলে ফিকহের অনেক ইমাম তাকলীদের সংজ্ঞা ‘ইত্তিবা’ শব্দের মাধ্যমে করেছেন।

কাযী মুহাম্মদ আ’লা খানভী রহ. ‘কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুন’ (পৃ. ১১৭৮) গ্রন্থে বলেছেন, التقلید: اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل.

“তাকলীদ হলো, অন্যের কথা ও কাজে ইত্তিবা করা।”

অনুরূপ প্রথিতযশা ওলামায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর স্পষ্ট উক্তি সমূহ দ্বারাও বুঝা যায়, তাকলীদ ও ইত্তিবা একই বিষয়; তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লামা রশীদ আহমদ গাজুহী রহ. বলেন, اتباع اور تقلید کے معنی واحد ہیں۔

“তাকলীদ ও ইত্তিবা সমার্থবোধক শব্দ।”^{১৭২}

এমনকি বর্তমান আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবীদের বিখ্যাত আলেম মাওলানা নযীর হুসাইন দেহলভী রহ. বলেন, তাকলীদের পারিভাষিক অর্থ হলো, অজানা অবস্থায় কোনো আহলে ইলমের কথা গ্রহণ করা এবং সে মুতাবেক আমল করা। আর পারিভাষিক অর্থে মুজতাহিদগণের ইত্তিবাকে তাকলীদ বলা হয়। তিনি আরো লিখেছেন,

^{১৭২} সাবীলুর রাশাদ পৃ. (তালীফাতে রশীদিয়া মধ্য) ৫১৯; আরও দেখুন, আল্লামা সরফরায খান সাফদার রহ.-এর আল-কালামুল মুফীদ, পৃ. ৩১-৩২।

اور غزالی اور آمدی اور ابن الحاجب نے کہا ہے کہ رجوع کرنا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع اور مفتی اور گواہوں کی طرف اگر تقلید قرار دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اور مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہنا مجوز ہے۔

“ইমাম গাযালী, আমেদী ও ইবনুল হাজেব রহ. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইজমা, মুফতি ও সাক্ষীদের প্রতি তাকলীদ শব্দের সম্বোধন করতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং প্রমাণিত হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ এবং মুজতাহিদগণের ইত্তিবাকে তাকলীদ বলা বৈধ।”^{১৭৩}

প্রশ্ন :- কোনো কোনো লা-মাযহাবী ভাই বলে থাকেন, তাকলীদ ও ইত্তিবার মাঝে পার্থক্য আছে। তা হলো, তাকলীদ নাজায়েয আর ইত্তিবা জায়েয। কেননা তাকলীদ হলো, দলিলবিহীন অনুসরণ বা অন্ধ অনুকরণ; আর ইত্তিবা হলো, দলিলসহ বা দলিল জেনে অনুসরণ। বাস্তবতা কী?

উত্তর :- এমন ব্যাখ্যা নব আবিষ্কৃত। কুরআন-সুন্নাহয় এর কোনো দলিল নেই এবং এর কোনো সমর্থনও নেই। বরং কুরআনে দলিলবিহীন অনুসরণের ক্ষেত্রেও ‘ইত্তিবা’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ.

“তুমি তাদের পথ অনুসরণ করো, যারা আমার অভিমুখী হয়েছে।”^{১৭৪}

উক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহমুখী ব্যক্তিদের তাকলীদ বা ইত্তিবা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই আয়াতের আলোকে বলেন,

وَالْأُمَّةُ مُنِيَّةٌ إِلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهَا.

“উম্মত (এর মধ্যে যারা) আল্লাহমুখী, তাদের পথ বা মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব।”^{১৭৫}

এভাবে পবিত্র কুরআনে অন্ধ অনুকরণের ক্ষেত্রেও ‘ইত্তিবা’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا *

^{১৭৩} মি’আরে হক পৃ. ৬৬-৬৭ সূত্রে আল-কালামুল মুফীদ পৃ. ৩০-৩১।

^{১৭৪} সূরা লুকমান ১৫।

^{১৭৫} মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৯/১৭৮।

“অনুসূত্রা যখন নিজেদের অনুসরণকারীদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে এবং তারা সকলে নিজেদের চোখের সামনে আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের পারস্পরিক সব রকম সম্পর্ক হিন্ন হয়ে যাবে। আর অনুসারীরা বলবে, হায়! একবার যদি (দুনিয়ায়) আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত! তবে আমরাও তাদের সঙ্গে এভাবেই সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতাম, যেমন তারা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছে।”^{১৭৬}

পক্ষান্তরে দলিলভিত্তিক অনুরসণের ক্ষেত্রেও তাকলীদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এমনকি একজন মুজতাহিদের অন্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাকলীদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير، قلته تقليدا لعمر. وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدا لعثمان. وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم، ثم قال: وإنما قلت بقول زيد، وعنه قلنا أكثر الفرائض. وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدا لعطاء.

“ইমাম শাফেয়ী রহ. তাকলীদে ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি একস্থানে বলেন, আমি এ হুকুম গ্রহণ করেছি ওমর রা. এর তাকলীদ করে। অন্য মাসআলায় বলেন, আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ওসমান রা. এর তাকলীদে। আরেক মাসআলায় বলেছেন, যায়েদ রা. এর অনুসরণে। অপর এক মাসআলায় বলেন, আতা রহ. এর তাকলীদ করে বলেছি।”^{১৭৭}

সুতরাং “তাকলীদ হলো, দলিলবিহীন অনুসরণ বা অন্ধ অনুকরণ; আর ইত্তিবা হলো, দলিলসহ বা দলিল জেনে অনুসরণ”- এমন পার্থক্যের কোনো দলিল কুরআন-সুন্নাহয় নেই। বরং উক্ত পার্থক্য আবু আদিল্লাহ বসরী নামক এক ব্যক্তি ও ইবনুল কায়্যিম রহ. এর তাকলীদ (অর্থাৎ অন্ধ অনুসরণ) করে বলা হয়েছে।

আশ্চর্য্যবোধ হয়! যেই তাকলীদকে নাজায়েয বলার জন্য ইত্তিবা থেকে পার্থক্য করা হচ্ছে, সেই পার্থক্যটাই আবার বলা হচ্ছে (কুরআন-সুন্নাহর ইত্তিবা না করে, বরং) অন্যের ‘নাজায়েয তাকলীদ’ করে।

^{১৭৬} সূরা-বাকারা, আয়াত- ১৬৬-১৬৭; আল-লামাযহাবিয়া পৃ. ৬৯-৭০।

^{১৭৭} ই’লামুল মুআক্কিয়ীন ২/৪৫০, দারুল হাদীস কায়রো। আরও সবিস্তারে জানতে দেখুন, আল-ইতিমাদ ফী তাওদীহিল ইকতিসাদ।

প্রিয় পাঠক! দ্বীনের সহীহ বুঝ অর্জনের জন্য বিষয়টি ভালোভাবে বোধগম্য হওয়া দরকার। কারণ যারা তাকলীদ করে তাদেরকে তাকলীদ করার কারণে ‘মুশরিক’ বলাসহ বিভিন্ন অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। অথচ যদি বিষয়টি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে দুনিয়া জুড়ে কেউ তাকলীদ তথা অন্যের অনুসরণ ব্যতীত চলতে পারে না। হোক দ্বীনের বিষয়ে বা পার্থিব বিষয়ে। অতএব কেউ যদি নিজের তাকলীদ তথা অন্যের অনুসরণের নাম ‘ইত্তিবা’ আখ্যা দেয় তারপরেও এটা তাকলীদই হবে। চাই যে নামই দেয়া হোক না কেন। ফলে অন্যের অপবাদ নিজের ঘাড়েই আসবে।

তাই এসব প্রোপাগাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন :- কোনো কোনো লা-মাযহাবী ভাই বলেন, তারা যে অন্যের অনুসরণ করেন তা তাকলীদ নয়। কেননা তারা দলিলসহ জেনে অনুসরণ করেন। আর কুরআনেও দলিলসহ জেনে নেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, **فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (৬৩) بِالْبَيِّنَاتِ** “অতএব তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর দলিলসহ।”^{১৭৮} কাজেই দলিলসহ জেনে নেওয়া ওয়াজিব।

উত্তর : এ সম্পর্কে ভূমিকার শেষে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার সারকথা হল, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কর্মধারা ছিল, সাধারণরা প্রয়োজনে ফকীহগণের নিকট সমাধান জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সাধ্যমত জবাব দিতেন। জবাবের সাথে প্রমাণ উল্লেখ করার কোনো আবশ্যিকতা ছিল না। ‘মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক’ ও ‘মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা’ ইত্যাদি কিতাব খুললেই দেখতে পাবেন যে, এ গ্রন্থগুলোতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের হাজার-হাজার ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রায় ফাতাওয়াতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কেউ আপন ফতোয়ার সাথে কুরআন-হাদীস থেকে দলিল পেশ করেননি। যদি দলিলসহ জেনে নেওয়া ওয়াজিব হয়, তাহলে সাহাবা-তাবেয়ীগণ (নাউযুবিল্লাহ) ওয়াজিব তরককারী সাব্যস্ত হবেন।

আল্লামা আমিদি রহ. (মৃত্যু ৬৩১হি.) বলেন,

“...সাহাবা ও তাবেয়ী যুগে সাধারণ মানুষ মুজতাহিদগণ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করত এবং শরয়ী আহকামের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ

করত। মুজতাহিদ ফকীহগণ তাদেরকে দলিল উল্লেখ করা ছাড়াই ফতোয়া প্রদান করতেন। কেউ তাদেরকে এভাবে ফতোয়া প্রদান করা থেকে বারণও করত না, আপত্তিও তুলত না। অতএব এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সাধারণ মানুষ সর্বাবস্থায় (দলিল উল্লেখপূর্বক কিংবা তা ব্যতীতই) মুজতাহিদের অনুসরণ করবে।”^{১৭৯}

আর সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতের (فَسأَلُوا) এর সাথে ৪৪ নং আয়াতের (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبْرِ) এর সম্পর্ক যুক্ত করে নিজেদের দাবির অনুকূলে ব্যাখ্যা দেওয়ার যে চেষ্টা করা হয়েছে, তা নিতান্তই অসারতা। কেননা মুফাসসিরগণ ও অনেক ইমাম তাকলীদ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ৪৩ নং আয়াতের সাথে ৪৪ নং আয়াতের সম্পর্ক যুক্ত করে দেননি। তাছাড়া এটা যে অগ্রহণযোগ্য, তা হাদীস থেকেও বুঝা যায়। কেননা একই মর্মের সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, **إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ**।

“যে জানে না, তার উচিত (জ্ঞানীদেরকে) জিজ্ঞাসা করা।”^{১৮০}

উক্ত হাদীসে তো দলিলসহ জিজ্ঞাসা করা বা জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়নি। যদি দলিলসহ জেনে নেওয়া ওয়াজিব হত, তাহলে অবশ্যই হাদীসে উল্লেখ হত এবং সাহাবা-তাবেয়ীগণও তা আমল করতেন। কিন্তু তাঁরা এটাকে ওয়াজিব মনে করেননি।

প্রশ্ন :- একজন বড় আলেমের তাকলীদ ও সাধারণের তাকলীদ কি একই ধরনের, নাকি এর কোনো স্তর রয়েছে?

উত্তর :- হ্যাঁ, তাকলীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আর তাকলীদের স্তর ও শ্রেণী তারতম্যের বিষয়টি অনুধাবনের ব্যর্থতাই তাকলীদ বিরোধীদের অনেক অভিযোগ ও সমালোচনার উৎস। জেনে রাখা দরকার, সবার তাকলীদ একই ধরনের নয়। যেমন সাধারণ মানুষের তাকলীদ আর ‘মুতাবাহির আলেম’ এর তাকলীদ এক নয়। এভাবে স্তরভেদে ‘মুজতাহিদ ফিল মাযহাব’ ও ‘মুজতাহিদ ফিল মাসাইল’ এর তাকলীদ সমমানের নয়। বিস্তারিত বিবরণ ‘উসূলুল ইফতা’ ও ‘উসূলুল ফিকহ’ বিষয়ক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুসারে তাকলীদের স্তর চারটি।

^{১৭৯} আল-ইহকাম লিল-আমেদী ৪/৪৫১।

^{১৮০} সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৩৬।

১. সর্বসাধারণের তাকলীদ ।
২. মুতাবাহ্‌হীর ও প্রজ্ঞাবান আলেমের তাকলীদ ।
৩. মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ ।
৪. মুজতাহিদে মুতলক বা পূর্ণ মুজতাহিদের তাকলীদ ।

সর্বসাধারণের তাকলীদটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত ।

১. আরবী ভাষাজ্ঞান বঞ্চিত এবং কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ।
২. আরবী ভাষাজ্ঞানের অধিকারী কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর প্রথাগত যাবতীয় ইলম অর্জন করেনি ।

৩. কুরআন-সুন্নাহর প্রাথমিক ও নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সনদধারী । তবে মূলনীতি শাস্ত্র তথা উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিকহ ইত্যাদির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নেই ।

তাকলীদের ক্ষেত্রে এরা সকলেই অভিন্ন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত । এদের জন্য নির্ভেজাল তাকলীদ ফরয । কারণ এদের মাঝে ইজতেহাদের যোগ্যতা নেই । ইমাম ইবনে আব্দিল বার রহ., খতিব বাগদাদী রহ., ইবনুল কায্যিম রহ. ও শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ.সহ অনেক আলেম বলেছেন, এদের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব ও প্রশংসনীয় । যার বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় করা হয়েছে এবং কিছু বিবরণ ‘ইজতিহাদ-তাকলীদের প্রামাণিকতা’ বিষয়ক আলোচনায় আসবে ।

মুতাবাহ্‌হীর ও প্রজ্ঞাবান আলেমের তাকলীদ:

মুতাবাহ্‌হীর আলিম বলা হয়, যে পরিপক্ব ও অগাধ ইলমের অধিকারী, কিন্তু ইজতেহাদের স্তরে পৌঁছেনি । তাঁর তাকলীদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, তিনি জেনে-গুনে তাকলীদ করবেন । অর্থাৎ মাযহাবের কোনো বিষয় যদি সহীহ হাদীসের বিপরীত মনে করেন এবং তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য দলিল থাকে, তাহলে নিজ মাযহাব ছেড়ে দিয়ে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করবেন । তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে । এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসবে ।

মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ:

তিনি কোনো পূর্ণ মুজতাহিদের অনুগত থেকে সে আলোকে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবা চরিত থেকে সরাসরি আহকাম বের করতে সক্ষম । অর্থাৎ খুঁটিনাটি মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত সত্ত্বেও মূলনীতির প্রেক্ষিতে

তিনি পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের মুকাল্লিদ বিবেচিত হবেন। আর এমন ব্যক্তিবর্গ সব মাযহাবেই আছেন।^{১৮১}

মুজতাহিদে মুতলাক বা পূর্ণ মুজতাহিদের তাকলীদ:

পূর্ণ মুজতাহিদ বলা হয়, যিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণ করে আহকাম ও মাসায়েল আহরণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী। এ স্তরে রয়েছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. সহ অন্য মুজতাহিদগণ। মূলনীতি প্রণয়ন ও আহকাম আহরণের ক্ষেত্রে এরা স্বতন্ত্র ও পূর্ণ মুজতাহিদের মর্যাদাধিকারী হলেও একপর্যায়ে তাদেরকেও তাকলীদের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পেলে কিয়াস করার পরিবর্তে তারা সাহাবা ও তাবেয়ীগণের তাকলীদ করেন। যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সাহাবী বা তাবেয়ীর কোনো সিদ্ধান্ত খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে অনন্যোপায় হয়েই তাঁরা নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেন। ‘তিন কল্যাণ’ যুগে এ ধরনের তাকলীদের ভুরি ভুরি নজির খুঁজে পাওয়া যায়।^{১৮২}

তাকলীদের এই চতুর্থ স্তরটি অনেক ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেননি। যেমন ইমাম যারকাশী রহ. ‘আল-বাহরুল মুহিতে’ ও শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. ‘আল-ইনসাফে’ উল্লেখ করেননি।

মাহমুদুল হাসান

^{১৮১} ইরশাদুল মুহতাদীন ১৬।

^{১৮২} সুন্নাহে দারেমী ১/৫৫ ও ৪৫, বুখারী ১ম খণ্ডের কিতাবুল ইতিসাম ও ফাতহুল বারী ১৩/২১০ দ্রষ্টব্য।

ইজতিহাদ পরিচিতি

প্রশ্ন :- ইজতিহাদের শাদিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

উত্তর :- শাদিক অর্থে ইজতিহাদ হলো, চেষ্টা করা, গবেষণা করা ও শক্তি ব্যয় করা ইত্যাদি।^{১৮৩}

শরয়ী পরিভাষায় কারো কারো মতে ইজতিহাদ হলো, শরীয়তের যে সকল আমলী বিধানাবলীর মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট/পরিষ্কার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না, সেগুলোর ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে যথাসাধ্য গবেষণার পর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।^{১৮৪}

উল্লেখ্য, উক্ত তারীফ মতে ইজতিহাদের পরিধি খুবই সীমিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন :- ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর :- এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম গাযালী রহ. ‘আল মুস্তাসফা’ (পৃ. ৪৬৭) গ্রন্থে বলেন, “কতিপয় লোক মনে করেন কিয়াস মানেই ইজতিহাদ, এটা ভুল ধারণা। বরং দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কারণ ইজতিহাদ হলো, বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে হুকুম বের করা। আর কিয়াস হলো, বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে হুকুম বের করার পদ্ধতি সমূহের একটি।”

তাছাড়া পার্থক্যের আরেকটি প্রমাণ হলো, উসূলুল ফিক্‌হের অধিকাংশ কিতাবাদিতে উভয়টাকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন :- আমরা জানি ইমাম ইবনে সীরীন রহ.সহ অনেকেই বলেছেন, أول من قاس إبليس (সর্ব প্রথম কিয়াস করেছে শয়তান) তাহলে ইমামগণ কি শয়তানের অনুসারী?

উত্তর :- এর উত্তর বুঝতে হলে আমাদের কিয়াসের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে হবে। কিয়াস দুই প্রকার:

এক. কিয়াসে শয়তানী (শয়তান কর্তৃক কিয়াস) অর্থাৎ শরীয়তের কোনো বিষয়ে স্পষ্ট বা অকাট্য প্রমাণাদি থাকার পরও তাতে কিয়াস করা।

^{১৮৩} লিসানুল আরব: ২/২৪৯।

^{১৮৪} ইকদুল জীদ পৃ. ২০, উসূলুল জাসাস ৪/১১, আল-মুস্তাসফা পৃ. ৪৬৭।

দুই. কিয়াসে রহমানী অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত রহমতের দ্বারা শরীয়তের কোনো অস্পষ্ট বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের কিয়াস। সুতরাং প্রশ্লোক্ত বাক্যের দ্বারা প্রথম প্রকারের কিয়াস উদ্দেশ্য, যা হারাম। আর ইমামগণের কিয়াস দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারই উদ্দেশ্য। তাই এ বাক্য ব্যবহার করে কোনো মুজতাহিদ ইমামের ছিদ্রাশেষণ করা কোনো মুসলমানের উচিত নয়।^{১৮৫}

প্রশ্ন :- কুরআন-সুন্নাহ থাকতে ইজতিহাদ-তাকলীদের প্রয়োজন কী?

উত্তর :- কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করার জন্য ইসলামী শরীয়তে ইজতিহাদ ও তাকলীদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা যদি ইজতিহাদ ও তাকলীদের ধারাবাহিকতা সাহাবাদের যামানা থেকে আজ অবধি চালু না থাকত, তাহলে মুসলিম উম্মাহ আজ কুরআন-সুন্নাহর উপর সহীহ তরীকায় আমল করতে আদৌ সক্ষম হত না।

কারণ, আল্লাহ তাআলা ২৩ বছরে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তাতে ৬২৩৬ আয়াতের মধ্য হতে শুধু ৫০০ আয়াত আহকাম সংক্রান্ত। (এমনই বর্ণিত আছে ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, ইবনে কুদামা, ইবনুল আরাবী রহ. থেকে, আর এটাই প্রসিদ্ধ মত।) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক হাদীস হতে মাত্র ৩/৪ হাজার হাদীস আহকাম সংক্রান্ত। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)

সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যত সমস্যা আসবে সব কিছুর সমাধান কুরআন-সুন্নাহর এই ৫০০ আয়াত এবং ৩/৪ হাজার হাদীসের মধ্যে নিহিত। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, কুরআন-সুন্নাহর মাঝে মানুষের খুঁটিনাটি সকল সমস্যার সমাধান সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়নি, বরং মৌলিক আকীদা ও মৌলিক আমলী সংক্রান্ত বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাকি সমস্যা ও মাসায়েলের সমাধানের জন্য এমন কিছু নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর আলোকে মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদ ইমামগণ কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হবেন।

বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত নীতিমালাসমূহ থেকে উদাহরণস্বরূপ একটি উল্লেখ করছি। তা হলো, ফিক্‌হের কিতাবসমূহে একটি মূলনীতি উল্লেখ রয়েছে, *الضرورة تبيح*

المحظورات “প্রয়োজনে অবৈধ বিষয় বৈধ হয়ে যায়।” এই মূলনীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত থেকে-

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

“কোনো ব্যক্তি যদি চরম অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে (ফলে হারাম বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং সে (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করে, তার কোনো গুনাহ নেই।”^{১৮৬}

উপরোক্ত আয়াতকে মুজতাহিদগণ মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন মাসআলার সমাধান দিয়েছেন।

এমনিভাবে ফিকহের যত মূলনীতি রয়েছে এর প্রত্যেকটিই কুরআন-সুন্নাহ থেকেই সংগৃহীত। নিজেদের মনগড়া বানানো নয়। আর এভাবে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে মাসআলার হুকুম বের করাকেই ইজতিহাদ বলা হয় এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের মুজতাহিদগণের অনুসরণ করার নামই তাকলীদ।

সুতরাং আমরা নির্দিধায় বলতে পারি যে, ইজতিহাদ ও তাকলীদই মূলত কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের একমাত্র পথ এবং এটাই ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’-এর তরীকা। যার উপর সাহাবা-তাবেয়ীনদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমল করে আসছেন। আর এটাই সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি।

প্রশ্ন :- ইজতিহাদ-তাকলীদ কোথায় বৈধ? এবং কী কারণে মানুষ ইজতিহাদ-তাকলীদ করতে বাধ্য?

উত্তর :- কারও হয়তো এই ধারণা হতে পারে যে, শরীয়তের সব বিষয়েই ইজতিহাদ-তাকলীদ করা যায়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা শরয়ী বিধি-বিধানের বড় একটি একটি অংশ হলো মুহকাম, যা অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এগুলোতে ইজতিহাদ ও তাকলীদ করা সম্পূর্ণ হারাম।

আর একটা অংশ হচ্ছে এমন, যেগুলো মুহকাম নয় এবং স্পষ্ট দলিল-দ্বারা প্রমাণিতও নয়।^{১৮৭} তাই এসব বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ করেন আর অক্ষমরা তাঁদের অনুসরণ করেন।

^{১৮৬} সূরা বাকারা ১৭৩।

^{১৮৭} মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিয়াহুল্লাহ-এর ‘ইলমী খুতুবা’-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে, এর পরিমাণ হচ্ছে ২০%।

এ সম্পর্কে ভূমিকাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার সারাংশ হল, ইজতিহাদ-তাকলীদ বৈধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত:-

এক. ঈমান ও মৌলিক আকীদা সংক্রান্ত কোন বিষয় হতে পারবে না।

দুই. আখলাক ও আমল এর সাথে সম্পৃক্ত যে সকল বিধান সর্বজনবিদিত ও বোধগম্য- এতে ইজতিহাদ-তাকলীদ চলবে না।

তিন. মাসআলাটি কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী- এমন হওয়া। যথা : নামাযে আমীন আস্তে বলার পক্ষে যেমন দলিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে জোরে বলার পক্ষেও।

চার. অথবা মাসআলাটির দলিলের অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট এবং সুনির্ধারিত না হওয়া। অর্থাৎ বিধানটিতে একাধিক অর্থবহ শব্দ থাকা বা একাধিক মর্ম ও ব্যাখ্যার সুযোগ থাকা। যেমন : পবিত্র কুরআনে “নির্দিষ্ট আইয়ামে (দিনসমূহে) কুরবানীর পশু যবেহ করতে বলা হয়েছে।”^{১৮৮}

উল্লিখিত আয়াতে ‘আইয়াম’ শব্দটির অর্থ অভিধানে রাত ছাড়া শুধু দিন অর্থও রয়েছে, আবার রাতসহ দিন অর্থও এসেছে। যদি প্রথম অর্থ হয়, তাহলে পশু রাত্রে যবেহ করা বৈধ হবে না; দ্বিতীয় অর্থে হলে রাতেও বৈধ হবে। কিন্তু উভয় অর্থের কোনো একটা নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই আয়াতে কোন্ অর্থ উদ্দেশ্য তা সুস্পষ্ট নয়।

চার. মাসআলাটির দলিল মানসূস বা কুরআন-সুন্নাহতে স্পষ্ট/পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকা। যেমন : পানিতে মশা পড়লে পানি অপবিত্র হবে কি না? ইনজেকশন দিলে রোযা নষ্ট হবে কি না?

উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো, যেমনিভাবে মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে ইজতিহাদ-তাকলীদ অবৈধ, তদ্রূপ আমল সংক্রান্ত কোনো বিধান যদি কুরআন-সুন্নাহয় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ হয়ে বিরোধপূর্ণ না হয় এবং অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়, তাহলে এমন (মুহকাম) বিধানের ক্ষেত্রেও ইজতিহাদ-তাকলীদের কোনো সুযোগ নেই।

এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন খতীব বাগদাদী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) ‘আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাঝ্জিহ’ (২/১৩২) গ্রন্থে ও আব্দুল গণী নাবলুসী হানাফী রহ. (মৃ. ১১৪৪ হি.) ‘খুলাসাতুত তাহকীক’ (পৃ. ৪) গ্রন্থে। আর হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. এ বিষয়টিকে বিস্তারিত ও স্পষ্ট করে ‘আল ইকতিসাদ’ (পৃ. ৬৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

খতীব বাগদাদী ও আবদুল গণী নাবলুসী রহ. বলেন, আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধান দু'ধরণের।

এক. 'জরুরিয়াতে দীন' বা দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিধান। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়া। এভাবে সমকামিতা, ব্যভিচার, মদপান, হত্যা ও চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি হারাম হওয়া। এ জাতীয় বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয় বা অন্য কারও তাকলীদ করা জায়েয নেই। খতীব বাগদাদী রহ. এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, এগুলো সবাই বুঝতে সক্ষম। কাজেই এতে তাকলীদ নিরর্থক।

দুই. সহজে যা বোধগম্য নয় এবং সবাই বুঝতে সক্ষমও নয়। এ জাতীয় মাসায়েলের ক্ষেত্রেই শুধু তাকলীদের প্রয়োজন হয়।

আরো সুস্পষ্ট করে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, কুরআন-সুন্নাহয় পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত বিধান তিন প্রকার। প্রথমত: বিরোধপূর্ণ বিধান। দ্বিতীয়ত: দ্ব্যর্থবোধক বিধান। তৃতীয়: সবার জন্য বোধগম্য বিধান। প্রথম ক্ষেত্রে সমস্বয় সাধন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণের জন্য ইমামদের ইজতিহাদ বা গবেষণা প্রয়োজন। এবং সাধারণের কর্তব্য হলো, তাঁদের তাকলীদ বা অনুসরণ। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়টিই আমরা নাজায়েয বলি।

অন্য জায়গায় তিনি কুরআন-সুন্নাহয় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই-এমন বিধান সম্পর্কে বলেন, এ ক্ষেত্রে ইমামের জন্য কিয়াস করে এর হুকুম বের করা বৈধ এবং সাধারণের জন্য তা অনুসরণ করাও বৈধ।^{১৮৯}

মোটকথা, ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব মানা বৈধ হওয়ার জন্য বিধানটি আমল সংক্রান্ত হয়ে বিরোধপূর্ণ বা একাধিক অর্থবোধক কিংবা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, এ তিন প্রকার থেকে কোনো একটি হতে হবে। এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও মাযহাব কোনোটাই বৈধ নয়।

উক্ত আলোচনা থেকে একথাও পরিষ্কার হলো যে, বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীস দুই ধরণের। এক. কিছু আয়াত ও হাদীস এতটাই সহজ ও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ শিক্ষিত মানুষও তা থেকে বিধান বুঝতে পারে। দুই. কিছু আয়াত ও হাদীস এমন আছে যা সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও পরস্পর বিরোধী। যেগুলোতে ইজতিহাদ করা ছাড়া উপায় নেই। আর এমন স্থান তিনটি। তদ্রূপ বুঝা গেল, মানুষও দু'শ্রেণীর। এক. যারা কুরআন-সুন্নাহর

স্পষ্ট-অস্পষ্ট উভয় প্রকার দলিল থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম। দুই. প্রথম শ্রেণীর মতো যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না।

প্রশ্ন :- আমরা জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই হলেন শরীয়তপ্রণেতা। আর মুজতাহিদ ইমামগণকে মানলে তো তারাও শরীয়তপ্রণেতা হয়ে যান, এটা কি শিরক নয়?

উত্তর :- ইমামগণের কথা মতে আমল করা আর তাঁদেরকে শরীয়তপ্রণেতা মানা এক জিনিস নয়। কারণ শরীয়তপ্রণেতা ও বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর ইমামগণ হলেন কুরআন-সুন্নাহর অস্পষ্ট বিধানাবলীর ব্যাখ্যাকার। আহকামের সুস্পষ্ট ভাষ্যকার। সঠিক মর্মার্থের প্রকাশকারী মাত্র।

অর্থাৎ মুজতাহিদগণ কুরআন-সুন্নাহ স্বীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে বিরোধপূর্ণ আয়াত ও হাদীস সম্বলিত বিধানের মাঝে সমন্বয় সাধনকারী, দ্ব্যর্থবোধক বিধানের মাঝে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণকারী এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, এমন বিধানাবলীর স্পষ্ট করে প্রকাশকারী। তাই কোনো মুজতাহিদের কথা মতে আমল করা মানে কুরআন-সুন্নাহর উপরোক্ত বিধানাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা ও তাফসীর মেনে চলা।

বিষয়টি সহজে অনুধাবন করার জন্য দুটি উদাহরণ পেশ করছি:-

এক. কোনো ব্যক্তি কূপ খনন করে মাটির অতল গহ্বর থেকে পানি তুলে আনার কারণে কেউ তাকে পানি সৃষ্টিকারী বলে না। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত পানি পূর্ব থেকেই মাটির নিচে ছিল। তবে কূপ খননের কারণে এখন তা প্রকাশ পেয়েছে। ঠিক একই অবস্থা মুজতাহিদগণের ক্ষেত্রে। তাঁরাও অস্পষ্ট হুকুমসমূহ চূড়ান্ত গবেষণা করে জনসম্মুখে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কূপ খননকারীকে যেমন পানি সৃষ্টিকারী বলাটা বোকামি ও মূর্খতা, তদ্রূপ ইমামগণকে শরীয়তপ্রণেতা বলাটাও বোকামি-মূর্খতা। সাথে সাথে কূপ থেকে পানি সংগ্রহকারীদের যেমন মুশরিক বলা যায় না, তদ্রূপ মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারীদেরকেও মুশরিক বলা যাবে না; বরং যে মুশরিক বলবে এই শিরকের অপবাদ তার উপর বর্তাবে।

দুই. ‘তাকলীদ কী শরয়ী হাইছিয়াত’ গ্রন্থে রয়েছে, প্রতিটি দেশ সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। আর এগুলো তৈরী করেছেন সংবিধান প্রণেতারা। তবে এর ব্যাখ্যাদাতা হলেন, উকিল ও বিচারকগণ। এ ক্ষেত্রে যেমন কোনো বিচারক বা উকিল-আইনজীবিকে সংবিধান প্রণয়নকারী বলা হয় না, বরং তাদেরকে ব্যাখ্যাকার বলা হয়। তদ্রূপভাবে

ইমামগণকেও শরীয়তপ্রণেতা বলা যাবে না, বরং ‘কুরআন-সুন্নাহ’ নামক সংবিধানের ব্যাখ্যাকার বলতে হবে। সুতরাং ইমামগণকে শরীয়তপ্রণেতার আসনে বসিয়ে শিরক ও মুশরিক বলার কোনো সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, ইমামগণের তাকলীদ বা মাযহাব মানার আরেকটি ক্ষেত্র হলো, কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট-অস্পষ্ট সব ধরনের বিধানে যেসব করণীয় ও বর্জনীয় রয়েছে সেগুলোর স্তরসমূহ জেনে আমল করা। অর্থাৎ কোন্টি ফরয, কোন্টি ওয়াজিব, সুন্নাত-মুস্তাহাব; অনুরূপ কোন্টি হারাম, মাকরুহ, অনুত্তম ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ কিছু স্থানে সহজে বুঝা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকলীদ বা মাযহাবের মাধ্যমেই জানতে হয়। কেননা এ সমস্ত বিবরণ কুরআন-সুন্নাহর উল্লেখ নেই, যা কারও অজানা নয়।

প্রশ্ন :- মুজতাহিদ ইমামগণকে না মেনে আমরা নিজেরা ইজতিহাদ করে আমল করলে সমস্যা কোথায়?

উত্তর :- ইজতিহাদ-তাকলীদ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিষয়টি আমল সংক্রান্ত হয়ে বিরোধপূর্ণ বা একাধিক অর্থবোধক কিংবা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, এ তিন প্রকারের একটি হতে হবে।

আর উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে আমল করতে গেলে সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে সমস্বয় সাধন ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে কিয়াস করে হুকুম বের করতে হবে। আর এ সমস্ত কাজ সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে আমরা যারা সম্ভব মনে করি, তারা সমাধানের জন্য দুটি পন্থা অনুসরণ করতে পারি। নিজেদের জ্ঞান-প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী যামানার মহান পূর্বসূরীগণের জ্ঞান-প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাঁদের সিদ্ধান্তের অনুসরণ। ইনসাফের দৃষ্টিতে আমাদের দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা এই যে, প্রথম পন্থাটি অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল ও বিপদসঙ্কুল। তাছাড়া ইজতিহাদের যোগ্যতা ও সনদ থাকার শর্ত তো আছেই। কারণ ডাক্তারের জন্য ডাক্তারী যোগ্যতা ও সার্টিফিকেট তো লাগবেই।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পন্থাটি হলো, নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত। কেননা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও স্মৃতিশক্তি, ন্যায় ও ধার্মিকতা এবং তাকওয়া ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য ও নিঃস্বতা এতই প্রকট যে, তাঁদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাওয়াও এক নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া কিছু নয়। এছাড়া তাঁরা ছিলেন কুরআন অবতরণ ও সুন্নাহ বাস্তবায়নের সময় ও

পরিবেশের নিকটতম প্রতিবেশি। এ নৈকট্যের সুবাদে কুরআন-সুন্নাহর মর্ম অনুধাবন ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ তাঁদের জন্য ছিল সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করাই নিরাপদ ও যুক্তিসম্মত। আর এটাই হলো, তাকলীদ বা মাযহাব মানার মূলকথা।

সারকথা, কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে অন্য কাউকে শরীয়তের বিধান প্রণয়নের অধিকার দিয়ে তার স্বতন্ত্র আনুগত্য তাকলীদের উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহ হতে প্রাপ্ত এ তিন ধরনের জটিলতার ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, বিজ্ঞ ইমামের সিদ্ধান্ত ও তাঁর দেখানো পথে কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণই হলো তাকলীদের নির্ভেজাল উদ্দেশ্য।

তাছাড়া কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলীর সুবিন্যস্ত ও একস্থানে সংকলিত রূপ তাকলীদ-মাযহাবেরই অবদান। অর্থাৎ জন্মের আযান থেকে নিয়ে মৃতব্যক্তির সম্পদ বণ্টন পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মাসআলা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে পরিপাটি ও সহজলভ্য করে একস্থানে মাযহাবের ফিকহী গ্রন্থসমূহেই রয়েছে। যদি মাযহাব মানা না হয়, তবে নামাযের তাকবীর থেকে নিয়ে সালাম পর্যন্ত মাসআলাসমূহ হাদীসের এক দু'টি কিতাব নয়, দশ-বিশ কিতাবেও পাওয়া যাবে না। হজ্জ-যাকাতসহ প্রায় বিষয়ে একই কথা। তাহলে চিন্তা করুন! ইমামগণ কত কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং কত বড় উপকার করেছেন।

তাই বলা যায়, মাযহাব ও তার ফিকহের গ্রন্থসমূহ হলো— কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলীর স্তরসমূহের বিবরণসহ সুবিন্যস্ত ও একস্থানে সংকলিত এবং তিন জটিল ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সমষ্টির নাম। কাজেই অমুজতাহিদ ব্যক্তি জন্য কোনো ইমামের তাকলীদ বা মাযহাব মানার ভেতরেই সফলতা রয়েছে। অন্যথায় সমূহ বিপদের সম্ভবনার দ্বার খুলে যাবে।

সালাহ উদ্দীন

ইজতিহাদের শর্ত ও মুজতাহিদের উসূল

প্রশ্ন :- ইজতিহাদ করার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

উত্তর :- মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরাম ইজতিহাদ করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো নির্ধারণ করেছেন।

১নং শর্ত :- আহকাম (বিধি-বিধান) সংক্রান্ত আয়াতসমূহের পূর্ণ অবগতি থাকা আবশ্যিক।^{১৯০}

আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে আয়াত সংখ্যা পাঁচশ।^{১৯১}

২নং শর্ত :- আহকাম সংক্রান্ত সকল হাদিসের জ্ঞান থাকতে হবে।^{১৯২}

তার সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট মতামত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, পাঁচশত হাদীস।^{১৯৩} কাযী ইবনুল আরবী রহ. বলেন, তিন হাজার হাদীস; ইমাম আহমদ রহ. বলেন, পাঁচলক্ষ হাদীস।^{১৯৪}

৩নং শর্ত :- সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ইজতিহাদকারী পূর্বেকার ইমামদের সর্বস্বীকৃত ও বিতর্কিত মাসায়েলের (ইজমায়ী ও ইখতিলাফী মাসাইল) পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। যাতে করে সে ইজমার পরিপন্থী ফতোয়া প্রদান না করে বসে।^{১৯৫}

৪নং শর্ত :- শরীয়তসম্মত কিয়াস উপস্থাপন করার পদ্ধতি জানতে হবে, বুদ্ধিভিত্তিক কিয়াস যথেষ্ট নয়। আর তা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত পদ্ধতি পারদর্শী ফকীহদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।^{১৯৬}

৫নং শর্ত :- উলূমুল কুরআন বিষয়ে পারদর্শিতা থাকতে হবে। বিশেষত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকে

^{১৯০} আল-মুস্তাসফা ২/৪৬৮; আল-বাহরুল মুহিত ৬/১৯১।

^{১৯১} আল-মুস্তাসফা ২/৪৬৮।

^{১৯২} আল-মুস্তাসফা ২/৪৬৯।

^{১৯৩} মানাকিবুশ শাফেয়ী ১/৫১৯।

^{১৯৪} আল-বাহরুল মুহিত ৬/২০০, সবিস্তারে জানতে দেখুন, উস্তাদে মুহতারাম সাঈদ আহমদ সাহেবের 'দুরুসুন ফী আয়াতিল আহকাম ও আহাদীসিহা'।

^{১৯৫} উসূলুল জাস্‌সাস ২/৩৬৮; ইরশাদুল ফুহুল পৃ. ২৫১; আল-মুস্তাসফা ২/৪৭০।

^{১৯৬} আল-বাহরুল মুহিত ৬/২০১

বর্ণিত তাফসীর, আসবাবে নুযূল, নাসেখ-মানসূখ ও আম-খাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা জরুরী।

আলী রা. এক বিচারককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে অবহিত আছো? সে জবাবে বলল, না। আলী রা. বললেন, তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ এবং অন্যকেও ধ্বংস করেছ।^{১৯৭}

৬নং শর্ত :- উলূমুল হাদীস বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যিক। উসূলুল হাদীসের পরিভাষা ও ইলমু আসমাউর রিজাল এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।^{১৯৮}

৭নং শর্ত :- আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে। নাহব, সরফ, বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আরবী ভাষার রীতি ও উপস্থাপনা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি থাকা জরুরি। কেননা কুরআন-সুন্নাহ, যা ইজতিহাদের মূল সূত্র তা আরবী ভাষায় বর্ণিত।^{১৯৯}

সুতরাং যারা উর্দু-বাংলা কিংবা অন্য কোনো ভাষায় পবিত্র কুরআন ও বুখারী শরীফের অনুবাদ দেখে মুজতাহিদ সেজে যান, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ডা. জাকির নায়েক সাহেব যেহেতু আরবীই জানেন না, বরং শুদ্ধ করে কুরআনই তেলাওয়াত করতে পারেন না, তাঁকে কীভাবে আমাদের বন্ধুরা মুজতাহিদ হিসেবে মান্য করছেন?!

৮নং শর্ত :- ইজতিহাদ যেহেতু গভীর চিন্তা ও মেধার সারনির্যাস, তাই মুজতাহিদকে উচ্চ পর্যায়ের মেধা ও সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী হতে হবে। পাশাপাশি তাকে খোদাতীরা ও পরহেযগার হতে হবে। যাতে তার ইজতিহাদ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়।^{২০০}

উপরোক্ত শর্তগুলো ইমাম শাফেয়ী রহ. সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বলেছেন,
لا يحل لأحد يُفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه،
ومُحكمه ومتشابهه، وتأويله وتبريله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم
يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ﷺ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من
الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج

^{১৯৭} ইরশাদুল ফুহুল পৃ. ২৫০; আল-বাহরুল মুহীত ৬/২০৩।

^{১৯৮} আল-বাহরুল মুহীত ৬/২০২; ইরশাদুল ফুহুল পৃ. ২৫১।

^{১৯৯} ইরশাদুল ফুহুল পৃ. ২৫১; আল-বাহরুল মুহীত ৬/২০২; আল-মুস্তাসফা ২/৪৭১।

^{২০০} আল-বাহরুল মুহীত ৬/২০৪।

إليه للعلم والقرآن، وَيَسْتَعْمَل - مع هذا - الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مُشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحةٌ بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم في العلم ولا يفتي.

“আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কারও জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেয়া বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কুরআনের নাসেখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, তা’বীল-তানযীল সম্পর্কে অবগত না হবে। এছাড়া আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, আয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া। অর্থাৎ হাদীসের নাসেখ-মানসূখসহ কুরআনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অর্জন করেছে, হাদীসের ক্ষেত্রেও সেগুলো অর্জন করা।

আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। আরবী কবিতার উপর দক্ষ হওয়া। পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় সব ইলম হাসিল করা। এগুলো অর্জনের সাথে-সাথে সে ন্যায়পরায়ণ ও স্বল্পভাষী হবে। এবং শহরবাসীর অবস্থা, তাদের রীতি-নীতি ও মতানৈক্যের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ইলম অর্জন করবে। এগুলো অর্জন করলে কেবল সে ফতোয়া দিতে পারবে এবং হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে ফায়সালা দিতে পারবে। এভাবে তার মাঝে স্বভাবগত একটি যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

সে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন না করে, তবে তার জন্য ইলমী কোনো বিষয়ে আলোচনা করা কিংবা ফতোয়া দেয়া বৈধ নয়।”^{২০১}

কুরআন তো সহজ, ইজতিহাদের জন্য এত শর্ত কেন?

প্রশ্ন :- আল্লাহ পাক তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

“বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি।” তাহলে সকলে ইজতিহাদ করতে পারবে না কেন?

উত্তর :- সকলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে শরীয়তের হুকুম-আহকাম ইজতিহাদের মাধ্যমে বের করতে পারবে না; বরং ইজতিহাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আর কুরআনকে যে সহজ বলা হয়েছে, তা হলো উপদেশ গ্রহণ করা হিসেবে। কেননা তার থেকে শরীয়তের হুকুম বের করা সবার জন্য সহজ নয়। অর্থাৎ কুরআনের মাঝে দুই প্রকারের আলোচনা রয়েছে।

এক. কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা, যা সহজ ব্যাপার। যেটা আল্লাহ পাক বলেছেন আলোচিত আয়াতে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং কে আছে উপদেশ গ্রহণ করবে?”^{২০২}

এখানে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে لِلذِّكْرِ (তথা উপদেশ গ্রহণের জন্য) শব্দ চয়ন করে সহজতার কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতঃপর “সুতরাং কে আছে উপদেশ গ্রহণ করবে” এ কথা বলে আল্লাহ পাক বিভ্রান্তির সুযোগ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন।

দুই. কুরআন থেকে শরীয়তের হুকুম ইজতিহাদের মাধ্যমে বের করা। সেটা খুবই কঠিন ব্যাপার, তার জন্য নির্দিষ্ট লোক রয়েছে।

যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى

أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“তাদের কাছে যখন কোনো সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতিকর, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্যানুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত।”^{২০৩}

মদীনা মুনাওয়ারায় এক শ্রেণীর লোক সঠিকভাবে না জেনেই গুজব ছড়িয়ে দিত। যার দ্বারা সমাজের অনেক ক্ষতি হতো। এ আয়াতে নিষেধ

^{২০২} সূরা কামার ১৭।

^{২০৩} সূরা নিসা ৮৩।

করে দেওয়া হয়েছে, যেন সঠিকভাবে না জেনেই কেউ কোনো গুজবে বিশ্বাস না করে এবং তা অন্যদের কাছে না পৌঁছায়।^{২০৪}

যারা না জেনে গুজব ছড়াত, তারা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এ ব্যাপারে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে যদি বিষয়টা ন্যস্ত করত, তাহলে যেটা প্রচারের উপযোগী সেটা প্রচার করত এবং যেটা প্রচারের উপযোগী না, সেটা প্রচার করত না। তাহলে সমাজে আর কোনো গুজব থাকত না।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক **يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ** বলেছেন, এখানে **من** অব্যয়টি “তাবয়ীয” এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (তাবয়ীজ অর্থ হলো ‘কিছু’) তাই এখানে অর্থ হবে “কিছু লোক”। সুতরাং বুঝা গেলো, তথ্যানুসন্ধানকারী সবাই নয়।

যুদ্ধের মতো দৃশ্যমান বিষয়ে যদি এমন হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়তের হুকুম অনুসন্ধান করে বের করা কত কঠিন ব্যাপার সেটা সহজে অনুমেয়। সুতরাং কুরআন থেকে শরীয়তের হুকুম বের করা সহজ বিষয় নয়। কুরআন যেহেতু উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ, ইজতিহাদের জন্য নয়, তাই সবাই মুজতাহিদ হতে পারে না।^{২০৫}

প্রশ্ন :- মুজতাহিদের ইস্তিম্বাত (কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা উদঘাটন) করার উসূল বা নীতিমালা কয়টি ও কী কী?

উত্তর :- উসূলে ইস্তিম্বাত বা গবেষণার মূলনীতি দুই প্রকার।

এক. মুত্তাফাক আলাইহি (সর্বজন স্বীকৃত) উসূল। তা হল চারটি যথা : ক. কুরআন। খ. সুন্নাহ। গ. ইজমা’। ঘ. কিয়াস।

দুই. মুখতালাফফীহ্ উসূল (মুজতাহিদের স্বতন্ত্র মূলনীতি)। প্রত্যেক মুজতাহিদের কিছু স্বতন্ত্র গবেষণামূলক মূলনীতি রয়েছে, যে অনুসারে কুরআন-সুন্নাহ হতে সমস্যার সমাধান বের করে থাকেন। যেমন : ইমাম আবু হানীফা রহ. এর স্বতন্ত্র কিছু মূলনীতি রয়েছে :

ক. কোনো খবরে ওয়াহেদ (একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস) যদি কাওয়ায়েদে কুল্লিয়ার (মূলনীতির) বিপরীত হয়, তাহলে কাওয়ায়েদ কুল্লিয়াকে গ্রহণ করা হবে।

^{২০৪} তাওযীহুল কুরআন, আল্লামা ডকী ওসমানী, সূরা নিসা ৮৩।

^{২০৫} ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কা আখেরী ফয়সালা, পৃ. ২৯-৩০।

খ. খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো, সুন্নাতে মাশহুরের (প্রসিদ্ধ বর্ণনা) বিরোধী না হতে হবে।

গ. ছিকাহ (বিশ্বস্ত) বা নির্ভরযোগ্য রাবীর মুরসাল রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হবে, যদি তার থেকে শক্তিশালী বর্ণনার বিরোধী না হয়।

এছাড়াও বেশ কিছু স্বতন্ত্র মূলনীতি রয়েছে।^{২০৬}

এমন মূলনীতি প্রত্যেক মুজতাহিদেরই রয়েছে।

প্রশ্ন :- দুই হাদীসের মধ্যকার তাআরুফ (মতবিরোধ) নিরসনের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের উসূল কী?

উত্তর :- ক. হানাফী আলেমগণ দু'হাদীস বা আয়াতের মাঝে তাআরুফ (মতবিরোধ) নিরসনের ক্ষেত্রে নাসখকে (রহিতকরণ) গ্রহণ করেন, যদি তার ইতিহাস জানা যায়। তারপর তারজীহ (প্রাধান্যতা)-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন যদি দু'টার যেকোনো একটার প্রাধান্যতা প্রমাণিত হয়। তারপর যথাসম্ভব দু'টার মাঝে সমন্বয় করেন। এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে দু'টার কোনোটাকে গ্রহণ করেন না।^{২০৭}

প্রশ্ন :- ইজতিহাদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর :- ইজতিহাদ দুই প্রকার।

এক. মৌলিক বিষয়ে ইজতিহাদ করা।

দুই. শাখাগত বিষয়ে ইজতিহাদ করা।

মৌলিক বিষয়ে ইজতিহাদ হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে মূলনীতি প্রণয়ন করা। এ প্রকার ইজতিহাদের দরজা যদিও বন্ধ হয়নি, তবে এমন মুজতাহিদ পাওয়া দুষ্কর। কেননা চার ইমামের পরে যারাই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, তাদের সে মূলনীতি সমাদৃত হয়নি।

তবে শাখাগত বিষয়ে ইজতিহাদ এখনও বাকি আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বাকি থাকবে।^{২০৮} অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে মুজতাহিদের ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত অনুপস্থিত, সেখানে 'মুজতাহিদ-ফিল মাযহাব' মুজতাহিদ নির্ধারিত উসূল ও মূলনীতির আলোকে কুরআন-সুন্নাহ হতে সিদ্ধান্ত আহরণ করবেন। এ ধারা সর্বদা ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

^{২০৬} বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'ফিকহ আহলিল ইরাক' এর টীকা পৃ. ৩৬-৩৮।

^{২০৭} আত-তালবীহ ২/২২৮; ফাতহুল গাফফার ২/১০৯; কাফউল আসার পৃ. ৬৬; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৩৮-১৩৯। উল্লেখ্য, এটি একটি মত, অন্যদের মত এর থেকে ভিন্ন।

^{২০৮} আল-ইনসাফ পৃ. ৭৪-৭৫; আশরাফুল জাওয়াব পৃ. ৩০৪-৩০৫।

প্রশ্ন :- ইজতিহাদের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করলে ক্ষতি কী?

উত্তর :- এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইজতিহাদ একটি দূরদর্শিতামূলক বিষয় এবং খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ কাজ যে কেউ করতে সক্ষম নয়, বরং সে ব্যক্তিই করতে পারবে, যার মাঝে উল্লিখিত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকবে। কারণ যেভাবে সবাই ডাক্তারি করতে পারে না, বরং মেডিকেল সাইন্স স্বীকৃত শর্তসমূহ ও এক্ষেত্রে স্বীকৃত যোগ্যতা যার মাঝে পাওয়া যাবে, সেই ডাক্তারি করতে পারে। শরীয়তের বিষয়টাও এমন। কিন্তু ডাক্তারির বিষয়টা সবার বুঝে আসে, যেহেতু এর সাথে বাঁচা-মরার সম্পর্ক। আর শরীয়তের বিষয়টা সকলের বুঝে আসে না, যেহেতু এর সাথে ঈমান-আমলের সম্পর্ক!

এছাড়া সকলের যদি জন্য ইজতিহাদ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে এমন ব্যক্তিও ইজতিহাদের দাবি করে বসবে, যার নূন্যতম দ্বীনি জ্ঞান নেই। কেবল কয়েকটি হাদীসের অর্থ শিখেই মনে করবে যে, আমি তো অনেক জানি। তখন প্রবৃত্তির অনুসরণ বেড়ে যাবে, তখন যে হাদীস নিজের মতের পক্ষে হবে, সেটি গ্রহণ করবে এবং যেটা বিরোধী হবে সেটা প্রত্যাখ্যান করবে।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

“প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহর রাস্তা হতে দূরে সরিয়ে নিবে।”^{২০৯}

শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো, বান্দাকে মুকাল্লাফ (শরীয়ত অনুগত) বানানো। কিন্তু ইজতিহাদকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করার মাঝে সেটা আর বাকি থাকে না।

ইয়াসিন

ইজতিহাদ-তাকলীদের ইতিহাস ও প্রকারভেদ

প্রশ্ন :- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইজতিহাদের প্রমাণ আছে কি?

উত্তর :- হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইজতিহাদ ছিল। স্বয়ং তিনি নিজেও ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও করতেন। এই বিষয়টি আমরা শরয়ী প্রমাণাদির মাধ্যমে আলোকপাত করবো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ যখন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতো, তিনি তার সমাধান ওহীর মাধ্যমে, আবার কখনো ইজতিহাদের মাধ্যমেও দিতেন। তবে ইজতিহাদী ফায়সালায় ভুল হলে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ঘটনাটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের সাথে মাশওয়ারা করলেন। তাদের মধ্যে কিছু সাহাবী রায় দিলেন, কোনোও ধরনের শাস্তি বা মুক্তিপণ ব্যতীত ক্ষমা করে দেয়ার পক্ষে; আর কিছু সাহাবী রায় দিলেন, তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় রায়ের মাঝামাঝি তৃতীয় আরেকটি ফায়সালা দিলেন। তা হচ্ছে, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে। এ ফায়সালাটি যেহেতু ইজতিহাদভিত্তিক ছিল, আর ইজতিহাদের মধ্যে কখনো ভুল হতে পারে, তাই এখানে উক্ত ফায়সালাটি আল্লাহ তাআলার মানশা মোতাবেক না হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْشِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“কোনো নবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, যমীনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করা না হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়) ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদী থাকবে। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর। আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য)

আখেরাত (এর কল্যাণ) চান। আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।”^{২১০}

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম দূরে কোথাও সফরে গেলে, ইজতিহাদের প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরাও ইজতিহাদ করতেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ۖ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ أَنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَيَمُمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ۖ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو! صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

“হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল এর সফরে শীতের এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমার এ আশঙ্কা হলো যে, যদি আমি গোসল করি, তাহলে হয়তো আমি মারা যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ইমামতি করি। সাথীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, হে আমর! তুমি নাপাকি অবস্থায় লোকদের ইমামতি করেছ?

তখন আমি গোসল না করার কারণ উল্লেখ করে বললাম, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে দয়াশীল’। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। এছাড়া কিছু বলেননি।”^{২১১}

এ হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে আমর ইবনুল আস রা. ইজতিহাদ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। আর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে সম্মতিও দিয়েছেন।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, রাসূলের যুগে সাহাবায়ে কেরামও ইজতিহাদ করতেন। এ ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে।

^{২১০} সূরা আনফাল ৮, ৬৭।

^{২১১} আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৪।

প্রশ্ন :- সাহাবায়ে কেলাম রা. ও তাবেয়ীনদের যুগে ইজতিহাদের কোনো প্রমাণ আছে?

উত্তর :- হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেলাম রা. যেসকল মাসআলার সমাধান কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে পেতেন না, ফকীহ সাহাবীগণ তার জন্য ইজতিহাদ করে সমাধান বের করতেন। এভাবে ফকীহ তাবেয়ীগণও ইজতিহাদ করে সমাধান দিতেন। অনেক ফকীহ তাবেয়ী তো সাহাবাদের উপস্থিতিতেই ইজতিহাদ করে ফতোয়া দিতেন।

নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

নমুনা এক :

عن سالم، عن عبد الله بن عمر؛ أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل، إلى أجل. فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر. فكره ذلك ابن عمر، وفي عنه.

“সালিম রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কিছু মেয়াদী পাওনা আছে। এখন পাওনাদার তার প্রাপ্য থেকে আংশিক এই শর্তে ক্ষমা করে দিতে চাচ্ছে যে, অবশিষ্ট ঋণটা তাকে পূর্বনির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আদায় করে দিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. তা অপছন্দ করলেন এবং নিষেধ করে দিলেন।”^{২১২}

এখানে বর্ণিত মাসআলায় কোনো মারফু’ হাদীস না থাকায় ইবনে ওমর রা. ইজতিহাদ বা কিয়াসের ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়েছেন।

নমুনা দুই :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বিচার ও ফায়সালা সম্পর্কিত মূলনীতি সম্পর্কে বলেন,

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، ... قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ».

“আজকের পর যদি কারও কোনো বিষয়ে ফায়সালা করতে হয়, তাহলে সে যেন কিতাবুল্লাহর আলোকে ফায়সালা করে। অতঃপর তার সামনে যদি এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত হয় যার সমাধান কুরআনে নেই, তাহলে সে যেন আল্লাহর নবীর ফায়সালা মুতাবেক ফায়সালা করে। অতঃপর যদি এমন কোনো সমস্যা আসে যার সমাধান কুরআনেও নেই, হাদীসেও নেই; তাহলে সে যেন সালিহীন (সৎ লোকদের) মতানুসারে ফায়সালা করে। আর যদি এমন সমস্যা উপস্থিত হয়, যার সমাধানের জন্য কুরআন, হাদীস ও সালিহীনের ফায়সালায় কোনো নমুনা নেই, তাহলে ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিবে।”^{২১৩}

উল্লিখিত হাদীসটিতে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ফায়সালার চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। ১ম. কুরআনুল কারীম, ২য়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ, ৩য়. সালিহীনের ফায়সালাসমূহ, ৪র্থ. ইজতিহাদ ও কিয়াস।

এভাবে তাবেয়ীনের যুগ থেকে যেহেতু নতুন নতুন বিষয় সংঘটিত হতে লাগলো, তখন নতুন অস্পষ্ট বিষয়াবলীর সমাধান দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আর ফকীহ তাবেয়ীগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে এগুলোর ফায়সালা দিতে লাগলেন।

ঐ সকল তাবেয়ীদের মাঝে ফুকাহায়ে সাবআ’ (৭ জন প্রসিদ্ধ ফকীহ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যারা মদীনার অধিবাসী ছিলেন। এছাড়াও কূফাতে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্যগণ এবং ইয়ামানে হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা. এর শাগরিদগণ বিদ্যমান ছিলেন।

এখানে শুধু কয়েকটি উপমা তুলে ধরা হয়েছে। অন্যথায় হাদীস ও আসারের গ্রন্থাবলীতে এ জাতীয় অনেক ঘটনা রয়েছে।

প্রশ্ন :- তাকলীদ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর :- তাকলীদ দুই প্রকার।

এক. তাকলীদে মুতলাক।

দুই. তাকলীদে মুকায়্যাদ।

১ম প্রকারের ব্যাখ্যা: সুনির্দিষ্ট কোনো মুজতাহিদ ইমাম বা মাযহাবের অনুসরণ না করে একাধিক ইমামের অনুসরণ করা। এটাকে ‘তাকলীদে আম’ বা ‘তাকলীদে গাইরে শাখসী’ও বলে।

২য় প্রকারের ব্যাখ্যা: সুনির্দিষ্ট কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা। সকল মাসআলায় কেবল তাঁরই মত অনুসরণ করা। অথবা বিশেষ মাযহাবের অনুসরণ করা। যেমন কেউ হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করলো বা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করলো।

প্রশ্ন :- নববী যুগে উভয় প্রকার তাকলীদ কি বিদ্যমান ছিল?

উত্তর :- হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাকলীদে মুতলাক ও মুকায়্যাদ, উভয়েরই প্রচলন ছিল। নববী যুগে তাকলীদে মুকায়্যাদের উদাহরণ,

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয বিন জাবাল রা.-কে ইয়েমেন পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেন, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তুমি কীভাবে করবে? মু'আয রা. আরয করলেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে ফায়সালা করবো। নবীজী প্রশ্ন করলেন, এতে কোনো সমাধান খুঁজে না পেলো? মু'আয রা. বললেন, তাহলে সুন্নাহর আলোকে ফায়সালা করবো। নবীজী আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোনো সমাধান না পেলো তখন? মু'আয রা. বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো এবং এতে চেষ্টায় ত্রুটি করবো না। তখন নবীজী তাঁর সাহাবীর বুকে নিজ হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন।”^{২১৪}

আরেকটি উদাহরণ: মুসনাদে আহমদে হযরত সাহল ইবনে মুয়ায রা. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন,

عن النبي ﷺ أن امرأة أخته، فقالت: يا رسول الله، انطلق زوجي غازيا، وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى، وبفعله كله فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع.

“এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী যুদ্ধে গিয়েছেন, আমি তার নামায অনুসরণ করতাম। এবং প্রত্যেক কাজেই তার অনুসরণ করতাম। অতএব আমাকে এমন আমল সম্পর্কে অবহিত করুন, যার দ্বারা আমি তার (স্বামীর) মর্যাদা লাভ করতে পারি, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত।”^{২১৫}

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নববী যুগে তাকলীদ ছিল, এবং তার অনুমোদনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্বীকৃত ছিল। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে তার স্বামীর তাকলীদ করতে নিষেধ করেননি।

প্রশ্ন :- সাহাবায়ে কিরামের যুগেও কি উভয় প্রকার তাকলীদের প্রচলন ছিল?

উত্তর :- সাহাবায়ে কেলাম রা.-এর যামানাতেও তাকলীদে মুতলাক ও মুকায়্যাদ, উভয়টিই প্রচলিত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ,

عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضلّ رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدى.

“সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হজ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন মক্কার রাস্তায় একটি জঙ্গলে পৌঁছলো তাদের উটগুলো হারিয়ে গেলো। আর (নবম তারিখ হজ হয়ে গেলো। অতঃপর দশম তারিখ) যবেহের দিন হযরত ওমর রা. এর কাছে আসলেন এবং এ সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত ওমর রা. বললেন, ওমরাহ আদায়কারী যা করে তুমিও তাই করো। তারপর ইহরাম খুলে ফেলবে, অতঃপর আগামী বছর যখন হজের সময় হবে, তখন হজ আদায় করে নিও। এবং যে প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা সহজ হয়, তা দ্বারা কুরবানী করে নিও।”^{২১৬}

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে, যে সকল সাহাবায়ে কেলাম রা. ইজতিহাদের যোগ্য ছিলেন না, তারা মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবাদের

^{২১৫} মুসনাদে আহমদ ১৫৬৩৩।

^{২১৬} মুয়াত্তা মালেক ১৪২৮।

তাকলীদ করতেন। কেননা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ও হযরত ওমর রা. উভয়েই সাহাবী এবং আবু আইয়ুব আনসারী হযরত ওমর রা. এর কাছে দলিল চাওয়া ব্যতীত মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছেন।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬০-২৩৪ হি.) বলেন,

لم يكن في أصحاب رسول الله ﷺ من له صجة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه
ويسلكون طريقته إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس.
فأصحاب عبد الله بن مسعود الذين يفتون بفتواه ويقرؤون بقراءته علقمة بن
قيس والأسود بن يزيد ومسروق....

وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه عطاء وطاوس
ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن جبیر فأعلم هؤلاء سعيد بن جبیر
وأثبتهم فيه.

وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه
ومنهم من لم يلقه اثنا عشر رجلاً سعيد بن المسيب.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণের মাঝে তিনজন সাহাবী এমন ছিলেন, যাদের শাগরিদ তাদের মাযহাব অনুসরণ করতেন, তাদের মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন, এবং তাদের তরীকা অনুসরণ করতেন। তাঁরা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও য়ায়েদ ইবনে সাবিত রা.।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর অনুসারীদের মধ্যে আলকামা রহ., আসওয়াদ রহ. ও মাসরুক রহ. ... প্রমুখ তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন এবং তাঁর কিরাত অনুযায়ী মানুষকে কুরআন শিখাতেন।

তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর যে সকল শাগরিদ তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং তাঁর তরীকা অবলম্বন করতেন, তারা হলেন, হযরত আতা, তাউস, মুজাহিদ, জাবের ইবনে য়ায়েদ ও ইকরিমা রহ. প্রমুখ।

এভাবে য়ায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর শাগরিদরা তাঁর নিকট জ্ঞানার্জন করতেন বা তাঁর ইলমের চর্চা করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন আর কেউ কেউ তাঁর সাক্ষাত লাভ করেননি, যার সংখ্যা বারজন।”^{২১৭}

প্রশ্ন :- তাবেয়ীদের যুগেও কি উভয় প্রকারের তাকলীদের প্রচলন ছিল?

উত্তর :- হ্যাঁ, তাবেয়ীদের যুগেও উভয় প্রকার তাকলীদের প্রচলন ছিল। নিম্নে আমরা তাদের কিছু আমল উল্লেখ করবো এবং তাতে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, তাদের যুগে উভয় প্রকার তাকলীদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

সুনানে আবী দাউদে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ الْبَسْرَ وَحَدَهُ، وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

“হযরত জাবের ইবনে যায়েদ ও হযরত ইকরিমা রহ. উভয়ে শুধু অর্ধপাকা খেজুর (বেচা-কেনা) অপছন্দ করতেন। এ ফতোয়াটি তারা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে গ্রহণ করেছেন।”^{২১৮}

এ হাদীসটিতে শুধু হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ফতোয়া উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে কোনো দলিল চাওয়া হয়নি। আর এটাই তাকলীদ। এমনিভাবে আরও বহু হাদীস ও আসার রয়েছে হাদীসের কিতাবসমূহে। বিস্তারিত জানার জন্য আসারের কিতাবসমূহ যথা : ‘মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক’, ‘মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা’, ‘শরহু মাআনিল আসার’ ও ‘মুআত্তা’ ইত্যাদি কিতাবের শরণাপন্ন হতে পারি।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন।
আমিন!

মুঈনুদ্দীন

তাকলীদ-ইজতেহাদের প্রামাণিকতা

প্রশ্ন :- কুরআন থেকে তাকলীদ বৈধতার প্রমাণ দিন?

উত্তর :-

প্রথম প্রমাণ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা ‘উলুল আমর’ তাদেরও।”^{২১৯}

আয়াতটির ব্যাখ্যায় প্রায় তাফসীর গ্রন্থে রয়েছে, সাহাবী হযরত জাবের রা. ও ইবনে আব্বাস রা. এবং তাবেয়ী মুজাহিদ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, আবুল আলিয়া, হাসান বসরী, দাহ্হাক ও আতা ইবনুস সায়িব রহ. প্রমুখের মতে ‘উলুল আমর’ শব্দটি দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী ইমাম ও মুজতাহিদগণকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই এ আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ, রাসূল ও ইমামগণের আনুগত্য করার আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ থেকে যদি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করতে হবে। আর অস্পষ্ট হলে ইমামদের ব্যাখ্যা মেনে তাঁদের আনুগত্য করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে, তাকলীদ।

উল্লেখ্য, ‘উলুল আমর’ এর তাফসীরে কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা মুসলমান বিচারক উদ্দেশ্য। আর কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফুকাহায়ে কেরাম। ইমাম আবু বকর জাসসাস ও আল্লামা ইবনুল কায্যিম রহ. বলেন, এ দুই তাফসীরের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং দুটোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয়ে বিচারক এর অনুসরণ করবে আর শরয়ী মাসআলাতে ফুকাহাদের অনুসরণ করবে। আর এই অনুসরণ এর পারিভাষিক নামই হচ্ছে তাকলীদ।^{২২০}

দ্বিতীয় প্রমাণ :

فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

^{২১৯} সূরা নিসা ৫৯।

^{২২০} আহকামুল কুরআন ইমাম জাসসাস, ২/২৫৬; ইলামুল মুআক্কিযীন।

“তোমাদের জানা না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।”^{২২১}

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা জানে না, তাদেরকে বিজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাকেই তাকলীদ বলে।

এ আয়াতদ্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকাতে রয়েছে।

তৃতীয় প্রমাণ :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে পড়ে না, যেন ফিরে এসে স্বজাতিকে তারা সতর্ক করতে পারে।”^{২২২}

উক্ত আয়াতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা এক জামাত এমন হওয়া চাই, যারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দিবে। যাতে এ জামাআত ঐ সমস্ত লোকদের শরয়ী বিধি-বিধান বাতলে দেয়, যারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য ফারোগ হতে পারেন না।

অতএব এ আয়াত দ্বারা বিশেষ জামাআতের জন্য আবশ্যিক হয় যে, তারা অন্যদের শরয়ী আহকাম বলে দিবে। আর অন্যরা তাদের বাতলে দেওয়া আহকামের উপর আমল করে আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকবে। আর এটা তাকলীদ নয় কি?

প্রশ্ন :- হাদীস থেকে তাকলীদ বৈধতার প্রমাণ পেশ করুন।

উত্তর :-

প্রথম প্রমাণ :

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

“বান্দাদের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন না। বরং ওলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নিয়ে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন। এমনকি একজন আলিমও যখন থাকবে না, মানুষ তখন

জাহেল-মূর্খকেই পথপ্রদর্শকের মর্যাদা দিয়ে বসবে। আর তারা জিজ্ঞাসাকৃত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরও গোমরাহ করবে।”^{২২৩}

এ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় ফতোয়ার কাজ ওলামাদের জন্য বলা হয়েছে। যার সারকথা হলো, মানুষ তাদের থেকে শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তার হুকুম বলে দিবেন এবং মানুষও তার ওপর আমল করবে। আর এটাকেই তো তাকলীদ বলে।

দ্বিতীয় প্রমাণ :

قال رسول الله ﷺ: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه.

“ইলম ব্যতীত কাউকে ফতোয়া দেওয়া হলে, তার গুনাহ ফতোয়া দাতার ঘাড়েই চাপবে।”^{২২৪}

এ হাদীসও তাকলীদ বৈধ হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে। কারণ তাকলীদ যদি বৈধ নাই হয়, তাহলে সব গুনাহ ফতোয়া দাতার ঘাড়েই কেন চাপবে? ফতোয়া তলবকারীর ওপরও তো কিছু গুনাহ হওয়ার কথা ছিল।

তৃতীয় প্রমাণ :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

“প্রত্যেক যুগে সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকেরাই কুরআন-হাদীস ও দ্বীনের ধারক বাহক হবে। তারা সীমালংঘনকারীদের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি, পথচ্যুতদের মিথ্যাচার বা বিকৃতি এবং মূর্খদের অপব্যখ্যা বা ছাড়াছাড়ি থেকে দীনকে হেফাজত করবে।”^{২২৫}

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সমস্ত ব্যক্তি কুরআন-হাদীস এর মাধ্যমে সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই আহলে ইলমদের দায়ীত্ব হলো, সঠিক বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া। আর অন্যদের দায়ীত্ব হলো, কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আহলে ইলমের শরণাপন্ন হবে। আর এটাকেই তো তাকলীদ বলে।

^{২২৩} বুখারী শরীফ হা. ১০০।

^{২২৪} আবু দাউদ ৩৬৫৭।

^{২২৫} মিশকাত ১/৩৬, হাদীস নং-১০০।

প্রশ্ন :- আসারে সাহাবা তথা সাহাবীদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তাকলীদের বৈধতা পেশ করুন।

উত্তর :-

প্রথম প্রমাণ :

عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية، فقال: «يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن، فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني له واليا وقاسما.

“ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রা. জাবিয়া নামক স্থানে বক্তব্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাও সে উবাই ইবনে কা’আব রা. এর কাছে যাবে। যে মিরাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাও সে য়ায়েদ বিন ছাবিত রা. এর কাছে যাবে। এবং যে ফিকহের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাও সে মু’আয ইবনে জাবাল রা. এর কাছে যাবে। আর যে মালের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাও সে আমার কাছে আসবে। তা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে মালের গভর্নর ও বণ্টনকারী বানিয়েছেন।”^{২২৬}

উক্ত খুতবায় ওমর রা. এ নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তাফসীর, মিরাহ্, ফিকহ বিষয়ে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করে জেনে নিবে। এখানে তাঁদের থেকে দলিলসহ জানার কথা বলা হয়নি। আর এটাকেই তো তাকলীদ বলে।

দ্বিতীয় প্রমাণ :

“হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হজের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং মক্কার রাস্তায় নাযিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে আরোহণের উষ্ট্রীগুলো হারিয়ে ফেললেন। তিনি নাহরের দিন (দশ-ই জিলহজ) হযরত ওমর রা. এর কাছে পৌঁছলেন। এবং তাকে এ ঘটনা বললেন। ওমর রা. বললেন, তুমি সে সমস্ত কাজ পুরা করো, যা ওমরা পালনকারী পালন করে থাকে (তথা তাওয়াফ, সা’ঈ)। এরপর তোমার ইহরাম খুলে ফেলবে। আর আগামী বছর যখন হজের সময় আসবে তখন হজ করবে এবং যে কুরবানী সহজসাধ্য হয়, তা জবাই করবে।”^{২২৭}

^{২২৬} আল-মুজামুল আওসাত, হাদীস নং- ৩৭৮৩।

^{২২৭} মুআত্তা মালেক, হাদীস নং-১৪২৮।

এখানে আবু আইয়ুব আনসারী রা. মাসআলার দলিল জিজ্ঞাসা করেননি। বরং তিনি ওমর রা. এর উপর আস্থা রেখে তার বর্ণনাকৃত মাসআলার উপর আমল করেছেন। আর এটাই হলো তাকলীদ।

তৃতীয় প্রমাণ :

عن مصعب بن سعد، قال: «كان أبي إذا صلى في المسجد تجوز وأتم الركوع والسجود، وإذا صلى في البيت أطل الركوع والسجود والصلاة، قلت: يا أبتاه إذا صليت في المسجد جوزت، وإذا خلوت في البيت أطلت. قال: يا بني إنا أئمة يقتدى بنا.

“মুসআ’ব ইবনে সা’দ রহ. বলেন, আমার পিতা যখন মসজিদে নামায পড়তেন তখন সংক্ষেপে রুকু-সেজদা করতেন। আর যখন বাসায় নামায পড়তেন তখন রুকু-সিজদা ও নামাযের অন্যান্য রুকন লম্বা করে আদায় করতেন। আমি বললাম, আব্বাজান! মসজিদে নামায পড়লে সংক্ষেপে, আর বাসায় নামায পড়লে লম্বা করে নামায পড়েন কেন?

হযরত সা’দ রা. উত্তর দিলেন, হে ছেলে! আমরা মানুষদের ইমাম। মানুষ আমাদের অনুসরণ করে। (অর্থাৎ মানুষ আমাদের লম্বা নামায পড়তে দেখলে এটাকে জরুরী মনে করে নিবে এবং সর্বত্র তার পাবন্দি শুরু করবে।)”^{২২৮}

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের সময় তাকলীদ শুধু জিজ্ঞাসা করে তার উপর আস্থা রেখে আমল করা- এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সাহাবাগণের আমল দেখেও অনেকে তাকলীদ করতেন।

প্রশ্ন :- ইজতিহাদ কি বৈধ, বৈধ হলে তার প্রমাণ পেশ করুন?

উত্তর :- হ্যাঁ, ইজতিহাদ বৈধ। বৈধতার কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো।

প্রথম প্রমাণ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু’আয বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেন, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তুমি কীভাবে করবে? হযরত মু’আয রা. আরয করলেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে ফায়সালা করবো। নবীজী প্রশ্ন করলেন, সেখানে কোনো সমাধান খুঁজে না পেলো? হযরত মু’আয বললেন, তাহলে সুন্নাহর আলোকে তার ফায়সালা করবো। নবীজী আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোনো

সমাধান না পেলে তখন? হযরত মু'আয বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো। এবং এতে চেষ্টার দ্রুতি করবো না। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে নিজ হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক তার রাসূলের দূত কে রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন।^{২২৯}

এটি ইজতিহাদ বিষয়ক মৌলিক হাদীস। এখানে ইজতিহাদের নীতিমালাসহ ব্যক্তি তাকলীদ আলোচিত হয়েছে, যা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় প্রমাণ :

“হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল এর সফরে শীতের এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমার এ আশঙ্কা হলো যে, যদি আমি গোসল করি, তাহলে হয়তো আমি মারা যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ইমামতি করি। সাথীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, হে আমর! তুমি নাপাকি অবস্থায় লোকদের ইমামতি করেছ?”

তখন আমি গোসল না করার কারণ উল্লেখ করে বললাম, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে দয়াশীল’। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। এছাড়া কিছু বলেননি।^{২৩০}

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে ইজতিহাদের বৈধতা বুঝে আসছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিজ্ঞাসার ফলে হযরত আমর ইবনুল আস রা. ইজতিহাদ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে সংমতিও দিয়েছেন।

তৃতীয় প্রমাণ :

عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: «أصبت» فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني «أصبت».

^{২২৯} আবু দাউদ ৩৫৯২।

^{২৩০} আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৪।

“হযরত তারিক রা. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তির গোসলের প্রয়োজন হলো। সে গোসল করতে না পারায় নামায পড়া থেকে বিরত থাকলো। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে অবগত করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঠিকই করেছ।

তদ্রূপ আরেক ব্যক্তিরও গোসলের প্রয়োজন হলে সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলো। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একই জবাব দেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে বলেছিলেন। (অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছ)”^{২৩১}

এই হাদীস থেকেও ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা উক্ত সমস্যার সমাধানে যদি কোনো কুরআনের আয়াত ও রাসূলের ইরশাদ তাদের কাছে থাকত, তাহলে আমল করার পর প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। এর দ্বারা বুঝা যায়, দু’জন সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ ভিত্তিক আমল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবগত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা সমর্থন করেছেন। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ দেখে খণ্ডন না করে চূপ থাকা বা সমর্থন জানানো শরয়ী দলিল হিসেবে গণ্য।

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

তাকলীদের যৌক্তিকতা ও গায়রে মুকাল্লিদীদের অনুসরণীয় ইমামদের দৃষ্টিতে তাকলীদ

প্রশ্ন :- শরীয়তের ইজতিহাদী মাসআলায় তাকলীদ জরুরী হওয়ার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর :- কুরআন-হাদীসের অস্পষ্ট এবং জটিলতাপূর্ণ বিধানাবলীর ক্ষেত্রে সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুটি পথ ও পন্থা রয়েছে।

এক. আমরা নিজেরাই স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনার উপর ভর করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিব এবং সে মোতাবেক আমল করব।

দুই. নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে কুরআন-হাদীস থেকে গবেষণালব্ধ পূর্ববর্তী বিজ্ঞ মনীষীদের সিদ্ধান্ত মুতাবেক আমল করব।

কেননা তারা কুরআন নাযিল হওয়ার পবিত্র যুগের নিকটবর্তী। আর সে নৈকট্যের সুবাদে কুরআন-হাদীসের বাস্তব মর্ম উপলব্ধি করা তাদের জন্য যতটা সহজ ছিল, কালের দীর্ঘ ব্যবধানের পর বর্তমানে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

সুতরাং ইনসাফ ও যুক্তির দাবি এটাই যে, স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের উপর নির্ভর না করা, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষিত শ্রেষ্ঠযুগের যোগ্য মনীষীদের দেওয়া সিদ্ধান্তকে মেনে সে মোতাবেক আমল করা। আর এরই নাম তাকলীদ।

আহলে হাদীস ভায়েরাও তাকলীদ করে!

যার ভিতর বিন্দু পরিমাণ ইনসাফ আছে, সেও স্বীকার করবে, আহলে হাদীস আলেমরা তাদের জনসাধারণকে দিয়ে তাদের তাকলীদ করায়। কুরআন-হাদীস থেকে একজন নিরক্ষর সাধারণ আহলে হাদীস, কিংবা সাধারণ শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি প্রতিদিনের অসংখ্য দীনী মাসআলার একটিও তো নিজে নিজে বের করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে আমল করে কীভাবে? ইমামগণের মতসমূহ থেকে অগ্রগণ্য মত বাছাই করার সামর্থ্য কি তার আছে? তাহলে সে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ কীভাবে করে? অর্থাৎ সে তার পছন্দের কোনো আহলে হাদীস আলেমের কথা মতো আমল করে। ‘শায়খ’ হয়তো অনুগ্রহ করে একটি দলিল ও তার তরজমা বলে দেন। কিন্তু সে নিজে দলিল বুঝেই না, তরজমাটা সঠিক কিনা তাও জানে

না! তাহলে বলুন, মাযহাব না মানার কী অর্থ? তাকলীদকে শিরক বলার কী মানে?

চিন্তা করুন পাঠক! পূর্বেকার মহান ইমামগণের সিদ্ধান্ত— যা হাজার বছর যাবত লাখো আলেম-ওলামার যাচাই বাছাইয়ে উত্তীর্ণ, তাঁদের অনুসরণ ভালো, নাকি এই যমানার আহলে হাদীস আলেমদের কথা অনুসরণ করা ভালো? যাদের ফতোয়া অন্যরা তো দূরের কথা, বরং তাদের ঘরানার শায়খরাই একে অপরের বিরোধিতা করে থাকেন।

কাজেই আমরা যেভাবে তাকলীদ করি, আহলে হাদীস ভাইয়েরাও তাকলীদ করে। তবে দুই তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা হল, আমরা সালাফ ও পূর্ববর্তীদের তাকলীদ করি, যা হাজার বছর যাবত লাখো আলেম-ওলামার আমল ও যাচাই বাছাইয়ে উত্তীর্ণ। আর তারা এ যুগের কারো তাকলীদ করে। দুই তাকলীদের মধ্যে কোনটা শ্রেয়, তা বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম। আর আমাদের তাকলীদ এত ঘৃণ্য হলে তাদের তাকলীদ এত উপাদেয় কেন?

প্রশ্ন :- তাকলীদ করা ছাড়া কি হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব?

উত্তর :- কোনো হাদীসের উপর আমল করার পূর্বেই আমাদের জেনে নিতে হবে সেই হাদীসটির মান কি?

আর এই ক্ষেত্রে আমরা মুহাদিসগণের মুখাপেক্ষী। তাঁরা উসূলে হাদীসের ভিত্তিতে যেই হাদীসটিকে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন, তা আমরা গ্রহণ করব।

আর যেই হাদীসগুলো তাঁদের ইজতিহাদের বিচারে গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে আমরা ছেড়ে দিব। আর এরই নাম তাকলীদ।

সুতরাং বুঝা গেল, হাদীস অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রেও আমরা মুহাদিসীনদের তাকলীদ করে থাকি।

যেমন ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে চার হাজার (তাকরার বিহীন) সহীহ হাদীস এনেছেন। এবং এগুলোর উপর ইমাম বুখারী রহ. সহীহ হওয়ার যেই হুকুম দিয়েছেন, তা একান্তই তাঁর ইজতিহাদপ্রসূত। আর তার উপর আস্থা থাকার দরুন হাদীসের তাসহীহ-তায়রীফ বা শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ক্ষেত্রে তাঁর তাকলীদ করা হয়। কিন্তু আফসোস করতে হয় বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদ ও লা-মাযহাবী ভাইদের দেখে, তারা কথায় কথায় শ্লোগান দেয়, ‘কুরআন-হাদীস আঁকড়ে ধরি, তাকলীদকে বর্জন করি’। এমনকি তাদের অনেকে তাকলীদকে শিরক পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করে

না। তাদের নিকট প্রশ্ন রইল, আপনারা হাদীসের তাসহীহ-তায়রীফের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী, মুসলিমসহ আইম্মায়ে মুহাদিসীনদের তাকলীদ মেনে নিয়ে কীভাবে আবার তাকলীদকে শিরক বলেন?!

সুতরাং আপনারা মুহাদিসীনদের মুকাল্লিদ, নাকি মুকাল্লিদ না- তা আপনাদের পরিষ্কার করা দরকার। যদি বলেন, আপনারা তাঁদের মুকাল্লিদ, তাহলে তো আপনারা নিজেদের কথায় নিজেরাই মুশরিক সাব্যস্ত হলেন। আর যদি বলেন, তাঁদের তাকলীদ করেন না, তাহলে তো আপনারা অসত্য কথা বলছেন। কারণ বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের হাদীস ও বর্ণনাগুলোকে সহীহ বলে মেনে নেওয়ার মাঝে কি তাঁদের তাকলীদ করা হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে।

বাস্তবতা হলো, তারা নিজেরা ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের তাকলীদ করে, আর অন্যদের বেলায় তাকলীদকে শিরক আখ্যা দেয়। আল্লাহ পাক সকলকে এদের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন এবং তাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

প্রশ্ন :- তাকলীদের ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদীনদের অনুসরণীয় ও নির্ভরযোগ্য ওলামাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর :- তাকলীদের ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদীনদের অনুসরণীয় ও নির্ভরযোগ্য কয়েকজন আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও তাকলীদ:

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাকলীদ জায়েয হওয়ার পক্ষে এতো উক্তি করেছেন যে, তা যদি একত্রিত করা হয় তাহলে একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। নিম্নে তাঁর দুটি উক্তি উল্লেখ করছি।

والذي عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في

الجملة... وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.

“অধিকাংশ উম্মতের মতামত হলো, ইজতিহাদ করাও জায়েয এবং তাকলীদ করাও জায়েয।... যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে (শর্তানুযায়ী) সক্ষম, তার জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ। আর যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে অক্ষম, তার জন্য তাকলীদ করা বৈধ।”^{২৩২}

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন,

“যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম জানতে অক্ষম, সে যদি এ ক্ষেত্রে দীনদার কোনো আলেম (মুজতাহিদ) এর অনুসরণ করে এবং তার পক্ষে এটা জানা সম্ভব না হয় যে, অন্য ইমামের উক্তি তাঁর অনুসরণীয় ইমামের উক্তির চেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তবুও সে প্রশংসার যোগ্য এবং সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। এই তাকলীদেব্দের জন্য তাকে তিরস্কার করা যাবে না এবং (আখেরাতেও) সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না।”^{২৩৩}

আল্লামা ইবনুল কাযিয়্যম রহ. ও তাকলীদ:

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর শাগরিদ ইবনুল কাযিয়্যম রহ.-এর মতে তাকলীদ কারো জন্য জায়েয; আর কারো জন্য ওয়াজিব। তিনি বলেন,
وَأَمَّا تَقْلِيدٌ مِنْ بَذْلِ جُهِدِهِ فِي اتِّبَاعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَخَفِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَقُلْدٌ فِيهِ مِنْهُ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهَذَا مُحْمُودٌ غَيْرُ مَذْمُومٍ، وَمَأْجُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، كَمَا سَأَيُّ بَيَانِهِ عِنْدَ ذِكْرِ التَّقْلِيدِ الْوَاجِبِ وَالسَّائِغِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তের অনুসরণে একনিষ্ঠ, কিন্তু কিছু মাসআলা সে নিজে নিজে বের করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার চেয়ে বড় কোনো আলেমের তাকলীদ করবে, এটা প্রশংসাযোগ্য; নিন্দিত কোনো বিষয় নয়। বরং সে এর জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে, গোনাহগার হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তাকলীদে ওয়াজিব ও তাকলীদে জায়েয এর অধীনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।”^{২৩৪}

শাহ ওলীউল্লাহ রহ. ও তাকলীদ:

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. এর দৃষ্টিতে সাধারণ মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব। তিনি বলেন,

فَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ جَاهِلٌ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ أَوْ فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالَمٌ شَافِعِيٍّ وَلَا مَالِكِيٍّ وَلَا حَنْبَلِيٍّ، وَلَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْلُدَ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَحْرَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَذْهَبِهِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْلَعُ رِبْقَةَ الشَّرِيعَةِ وَيَبْقَى سَدَى مَهْمَلًا.

“ভারত উপমহাদেশের কোনো জায়গায় বা মা-ওয়ারাউন-নাহর এর কোনো অঞ্চলে যদি শাফেয়ী, মালেকী, কিংবা হাম্বলী (মাযহাবের) কোনো মুফতি-মুজতাহিদ না থাকে এবং তথায় তাদের কিতাবাদিরও প্রচলন না থাকে, তবে (উক্ত অঞ্চলসমূহের) সাধারণ মুসলমানদের জন্য হানাফী মাযহাব মতে আমল করা ওয়াজিব। হানাফী মাযহাবের তাকলীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা তার জন্য হারাম। কেননা এ অবস্থায় হানাফী মাযহাব পরিহার করা মানেই শরীয়তের বন্ধন ছিড়ে মনচাহী জীবনযাপনে মত্ত হওয়া।”^{২৩৫}

তিনি আরো বলেন,

إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز

تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، ...

“তদানিন্তন কাল থেকে আজ পর্যন্ত উক্ত সঙ্কলিত চার মাযহাবের তাকলীদ বৈধ হওয়ার উপর ইজমা’ সংগঠিত হয়েছে। আর এতে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে, যা লুকায়িত নয়। ...^{২৩৬}

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ও তাকলীদ:

বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদরা তাকলীদ করা যাবে না মর্মে আরব ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহ. এর উক্তিও দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। অথচ তিনি নিজে, তাঁর ছেলে ও তাঁর সিলসিলার অন্য আলেমগণ সকলেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (অর্থাৎ তাকলীদ করেছেন)। যেমন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহ. তাঁর উপর উত্থাপিত কিছু অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেন,

فمنها: قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول: إن الناس من

ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني

أقول: إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر

البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق، وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله

صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها

ميزاباً من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر

^{২৩৫} আল-ইনসাফ পৃ. ৭৯।

^{২৩৬} হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/৩৫০, কাদীমী কুতুব খানা করাচি ও আল-ইনসাফ পৃ. ৯৭।

زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.
جوابي عن هذه المسائل، أن أقول: سبحانه هذا بهتان عظيم!

“সে সব অভিযোগের মধ্য থেকে কয়েকটি এই, আমি নাকি বলি :-

এক. চার মাযহাবের কিতাবসমূহ বাতিল।

দুই. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা ভিত্তিহীন কথার উপর আমল করে আসছে।

তিন. আমি মুজতাহিদ হওয়ার দাবিদার। আমি তাকলীদ করি না। এ সকল অভিযোগের জবাবে আমি শুধু এটুকুই বলব, এ সবই আমার উপর অপবাদ বৈ কিছুই নয়।^{২৩৭}

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহ. এর ছেলে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, যিনি তার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তিনি বলেন,

ونحن أيضا في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.

“ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর তাকলীদ করি। আর যে ব্যক্তি চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোনো একটির তাকলীদ করে আমরা তার উপর কোনো অভিযোগ করি না। তবে আমরা (চার মাযহাব ছাড়া) অন্য কোনো মাযহাব সমর্থন করি না। কারণ অন্য মাযহাব সংকলিত ও সংরক্ষিত নয়।... বরং আমরা লোকদেরকে চার ইমামের কোনো এক ইমামের মাযহাব মানতে বাধ্য করি।”^{২৩৮}

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালাহ উসাইমীন রহ. ও তাকলীদ:

বর্তমান লা-মাযহাবীরা দাবি করে যে, শায়খ মুহাম্মদ বিন সালাহ উসাইমীন রহ.-ও তাদের অন্যতম মান্যবর স্বীকৃত ব্যক্তি। তাই এ বিষয়ে

তাঁর মতামত পেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি। শায়খ উসাইমীন রহ. তাকলীদে দু'টি প্রকার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

الأول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد.

“তাকলীদে একটি প্রকার হলো, তাকলীদকারী এমন সাধারণ লোক-যে নিজে (কুরআন-সুন্নাহ থেকে) হুকুম উদঘাটন করতে পারে না, তার জন্য ফরয হলো তাকলীদ করা।”^{২৩৯}

তিনি আরো বলেন,

“সাধারণ মানুষের জন্য আপন অঞ্চলের আলেমদের মাযহাবই মানা উচিত। কেউ যদি বলে, যখন যে ধারার আলেমকে ভালো লাগবে তার অনুসরণ করবো, এতে দোষের কী আছে? শায়খ বলেন, না, আপনার জন্য এমনটা করার সুযোগ নেই। কারণ আপনার উপর জরুরি কেবল তাকলীদ করা। আপনার পক্ষ হতে তাকলীদে অধিক হকদার হচ্ছেন আপনার এলাকার আলেমগণ। আপনি যদি আপন আলেমদের ছেড়ে অপর আলেমদের তাকলীদ করেন, তাহলে ফেতনা সৃষ্টি হবে। অথচ (আপন দেশের আলেমদের ছেড়ে) অপর দেশের আলেমদের অনুসরণে আপনার কাছে শরয়ী কোনো দলিল নেই।

এজন্যই সাধারণ মানুষের উপর আপন এলাকার নির্ভরযোগ্য আলেমদের তাকলীদ করা জরুরি। আমাদের শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দীও এ-মতের জোর সমর্থক। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার আলেমদের অনুসরণ করার অনুমতি নেই। কারণ এতে করে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের এলাকার কেউ যদি উটের গোশত খেয়ে বলে যে, আমি ইরাকের মাযহাব অনুসারে অযু করবো না, (অথচ তার এলাকার আলেমদের মাযহাব অনুযায়ী উটের গোশত খেলে অজু করা আবশ্যিক) তাহলে আমরা তাকে বলবো, এমনটা করার সুযোগ নেই। তোমার উপর অযু ওয়াজিব। কারণ তোমার এলাকার হাম্বলী মাযহাব অনুসারী আলেমদের মত এটাই। আর তুমি তো তোমার এলাকার আলেমদের অনুসারী!”^{২৪০}

^{২৩৯} আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৭।

^{২৪০} লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ৩২/১৯, শামেলা।

নবাব সিদ্দিক হাসান খান ও তাকলীদ:

নবাব সিদ্দিক হাসান খান রহ. বলেন,

فقد نبتت في هذا الزمان فرقة ذات سمعة ورياء تدعي لأنفسها علم الحديث والقرآن والعمل بهما على العلات في كل شأن مع أنها ليست في شيء من أهل العلم والعمل والعرفان لجهلها عن العلوم الآلية التي لا بد منها لطالب الحديث في تكميل هذا الشأن ...

“সাম্প্রতিককালে লৌকিকতা ও সুখ্যাতিপ্রিয় একটি দলের উদ্ভব হয়েছে, যাদের মাঝে সর্বপ্রকার দোষত্রুটি আর পূর্ণ দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানী ও তদানুযায়ী আমলকারীরূপে দাবি করে থাকে। অথচ ইলম-আমলের সাথে এদের কোনো দূরতম সম্পর্ক নেই। কারণ, তাদের উলূমে আলিয়া তথা কুরআন হাদীস বুঝার মাধ্যম পর্যায়ে ইলম সম্পর্কেও ধারণা নেই। অথচ তা একজন তালিবে হাদীসের অত্যাবশ্যকীয়। এমনভাবে উলূমে আ-লিয়া তথা সুন্নাহর সহযোগী ইলম যথা ইলমুস সরফ, ইলমুন নাহব, ইলমুল লুগাহ, ইলমুল মাআনী, ইলমুল বাদী, সম্পর্কেও জানা নেই। অন্যান্য ইলমের কথা বাদই দেওয়া হলো। এবং তারা ওলামাদের সাদৃশ্যতা ও মুত্তাকীদের পোশাকে নিজেদেরকে পরিবেশন করে থাকে।”^{২৪১}

মাওলানা হুসাইন বাটালবী ও তাকলীদ:

ভারতবর্ষে গাইরে মুকাল্লিদীনদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী রহ. যিনি ‘উকিলে আহলে হাদীস’ হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পদনায় প্রকাশিত ‘ইশায়াতুস সুন্নাহ’ পত্রিকায় তিনি লিখেন,

“পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যারা ইলম না থাকা সত্ত্বেও মুজতাহিদ বনে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে তাকলীদ পরিহার করে, পরিশেষে তারা ইসলামকেই বিদায় সম্ভাষণ জানায়। মুরতাদ ও ফাসেক হওয়ার বহু কারণ পৃথিবীতে রয়েছে। কিন্তু দীনদার মানুষের বে-দীন হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ইলম না থাকা সত্ত্বেও তাকলীদ পরিহার করা। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের যেসব ইলমহীন বা স্বল্প ইলমের অধিকারী লোক তাকলীদ পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেয়, তাদের উচিত নিজেদের শেষ পরিণাম

সম্পর্কে ভীত হওয়া। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা দিন দিন মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে।”^{২৪২}

মাওলানা ছদরুদ্দীন ও তাকলীদ:

নবাব ছিদ্দিক হাসান খানের শিক্ষক এবং গাইরে মুকাল্লিদীনদের অন্যতম আলেম মুফতি ছদরুদ্দীন বলেন,

“চার মাযহাব থেকে একটি নির্দিষ্ট মাযহাব নির্ধারণ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত। শুধু সাধারণ লোক না, বরং ইজতিহাদ ও গবেষণায় অক্ষম আলেমগণের জন্যও মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব। বিশেষত মাযহাব চতুষ্টয় উম্মতের সুপ্রসিদ্ধ মুজতাহিদগণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, সুবিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। সুতরাং যে কেউ মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটির বাস্তবতা অস্বীকার করবে অথবা বিদআত বা ভ্রষ্ট ইত্যাদি বলে হঠকারিতা করবে, তারাই বাস্তবে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী হিসেবে গণ্য হবে।”^{২৪৩}

মুহতারাম পাঠক! এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে গাইরে মুকাল্লিদীনদের নিকট অনুসরণীয় ও নির্ভরযোগ্য কতিপয় ওলামায়ে কেরামের মতামত থেকে জানতে পেরেছি যে, তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ মুসলিমদের জন্য তাকলীদ করা আবশ্যিক।

আনোয়ার হোসাইন

^{২৪২} ইশাআতুস সুন্নাহ, খ- ১১, সংখ্যা ২, ১৯৮৮ ইং- সূত্রে নবীজীর নামায পৃ. ৮৬।

^{২৪৩} তাম্বীহুদদালীন, পৃ. ৪৫।

ইজতিহাদ তাকলীদে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি

প্রশ্ন :- কোন ইমামের বক্তব্য ও ফতোয়া কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হলেও সেই ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব?

উত্তর :- তাকলীদকে অস্বীকার করা যেমন নিন্দনীয়, ঠিক তেমনই কোন ইমামের তাকলীদ করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ততা এবং গোঁড়ামী করাও নিন্দাযোগ্য। কারণ কোনও ইমামের তাকলীদ এজন্য করা হয় না যে, তিনি শরীয়তপ্রণেতা ও আইন প্রণয়নকারী। বরং ব্যাখ্যাকারী রূপে তার তাকলীদ করা হয়। ইমাম তো কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্যে বর্ণনাকারী। কাজেই ইমামের তাকলীদ ততক্ষণ পর্যন্ত করা হবে, যতক্ষণ তিনি আইন প্রণেতা না হয়ে ব্যাখ্যাকারী থাকবেন। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন মত তার থেকে প্রকাশ না পাবে। যদি কোন ইমাম থেকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন মতামত পাওয়া যায়, তখন আমাদের করণীয় কী? সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

প্রিয় পাঠক! বিষয়টি আমরা শর্তসহ ভালোভাবে লক্ষ্য করি।

কোন গভীর দৃষ্টির অধিকারী, প্রখর মেধাবী, মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী ও খোদাভীরু আলেমের নিকট যদি কোন ইমামের মত বা মাযহাব কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী মনে হয়, অথবা এমন বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে কোন সাধারণ ব্যক্তির কাছেও যদি বিষয়টি স্পষ্ট হয়, এবং তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাকওয়া ও সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সচেতন হন, তাহলে দুই অবস্থা হতে পারে।

এক. ইমামের মতটা জায়েয-নাজায়েয এর ক্ষেত্রে হবে। অর্থাৎ ইমামের রায়টি কুরআন-সুন্নাহের আলোকে একটি না জায়েয কাজ। এবং ইমামের মত অনুযায়ী আমল করলে কোন ওয়াজিব তরক হয় কিংবা কোন নাজায়েয কাজে লিপ্ত হতে হয়; আর সেই ইমামের মতের বিপরীতে যদি সুন্নাহ থেকে সহীহ ও সুস্পষ্ট (সরীহ) দলিল থাকে, এবং ইমামের পক্ষে কিয়াস ছাড়া কোন দলিল না থাকে, তাহলে নির্দিধায় সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এখানে সেই ইমামের মত অনুযায়ী আমল করা ও তার তাকলীদ করা কোনভাবেই বৈধ নয়।

দুই. সেই ইমামের মতটি উত্তম-অনুত্তম এর ক্ষেত্রে হবে। অর্থাৎ সেই ইমামের মাযহাব বা মতটি অপ্রণিধানযোগ্য ও অনুত্তম এবং তার বিপরীতটি উত্তম ও প্রণিধানযোগ্য। যদি এমন হয়, তাহলে দেখতে হবে সেই ইমামের অনুত্তম মত অনুযায়ী আমল না করলে মানুষের মাঝে ফিৎনা বা একতা বিনষ্ট হয় কি না? যদি ফিৎনা বা একতা বিনষ্ট হয়, তাহলে সেই অনুত্তমের উপর আমল করা এবং মানুষের মাঝে ফিৎনাকে দমন করে একতাবদ্ধ থাকাই উত্তম।

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও উত্তম কাজকেও মানুষের মাঝে ফিৎনা হওয়ার আশঙ্কায় বর্জন করেছেন।

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَمْ تَرَيَ أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ لَا حَدَّثَانُ قَوْمَكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ».

“আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান না! তোমার কওম যখন কা’বা নির্মাণ করেছিল তখন ইব্রাহীম আ. এর নির্মিত ভিত্তি অপেক্ষা ছোট করে নির্মাণ করেছিল? তখন আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনি তা ইব্রাহীম আ. এর নির্মিত ভিত্তির উপরে পুনঃনির্মাণ করছেন না কেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমার কওম কুফর থেকে ফিরে আসার সময় দীর্ঘদিন হত, তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম।”^{২৪৪}

এভাবে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.ও ফিৎনার আশঙ্কায় উত্তম কাজ বর্জন করেছেন।

عن عبد الله صلى أربعاء، قال: فقيلى له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاء، قال: الخلاف شر.

“আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. মুসাফির অবস্থায় চার রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তাঁকে বলা হয়, আপনি ওসমান রা.-কে (সফরে)

নামায চার রাকাত পূর্ণ আদায় করার কারণে দোষারোপ করেছিলেন এখন আপনিও চার রাকাত পূর্ণ আদায় করলেন তখন ইবনে মাসউদ রা. বললেন, (ইমামের) বিরোধিতা করা মন্দ কাজ।”^{২৪৫}

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. (জন্ম ৬৬১, মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন,
وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ بِتَرْكِ هَذِهِ الْمُسْتَحْبَاتِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ التَّأْلِيفِ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ فِعْلِ مِثْلِ هَذَا، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ تَغْيِيرَ بِنَاءِ الْبَيْتِ، لَمَّا فِي إِبْقَائِهِ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ، وَكَمَا أَنْكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ عَلَى عَثْمَانَ ﷺ إِتِمَامَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَهُ مُتِمًّا، وَقَالَ: "الْخِلَافُ شَرٌّ".
وقال أيضا: ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد إبراهيم...

সারার্থ: “মানুষের জন্য উত্তম হলো, মুস্তাহাব বিষয়কে বাদ দিয়ে হলেও তারা যেন একতার দিকে লক্ষ্য রাখে। কেননা ইসলাম ধর্মে একতার বিষয় মুস্তাহাব বিষয় পালনের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা’বার নির্মাণকে বর্জন করেছেন মানুষের একতার দিকে লক্ষ্য করে। কেননা একতার বিষয় কা’বার নির্মাণ থেকে বড়।

এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সফর অবস্থায় নিজ মতের বিপরীতে ওসমান রা. এর পিছনে নামাযকে চার রাকাত পূর্ণ করেছেন এবং বলেছেন, (ইমামের) বিরোধিতা করা মন্দ কাজ।”^{২৪৬}

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) বলেন, আমি আমার উস্তাদ আবু ওমর আহমদকে বললাম, আপনি নামাযের শুরু ছাড়া অন্য স্থানে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ বা হাত উঠান না কেন, যাতে আমরাও আপনার অনুসরণে হাত উঠাতাম। তিনি বললেন,

قال: لا أخالف رواية ابن القاسم؛ لأن الجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفة

الجماعة فيما قد أبيح لنا: ليست من شيم الأئمة.

“ইবনুল কাসিম ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ বা হাত উঠানো শুধু নামাযের সূচনায় হবে। আমাদের এলাকার

^{২৪৫} আবু দাউদ, হাদীস নং ১৯৬০; আল-ইকতিসাদ ফীত তাকলীদ ওয়াল ইজতিহাদ, পৃ. ৮৪-৮৬।

^{২৪৬} মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/২৩৯ ও ২৫৪-২৫৫, দারুল ওফা।

লোকজন এই বর্ণনা অনুযায়ীই আমল করে থাকেন। আর যে বিষয়ে দুই পদ্ধতিই বৈধ, (যদিও উত্তম-অনুত্তম নিয়ে মতভেদ থাকে) তাতে লোকদের মাঝে প্রচলিত পদ্ধতির বিরোধিতা করা ইমামগণের নীতি ছিল না।”

উল্লেখ্য, আমাদের বাংলাদেশেও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ না করা ও ‘জোরে আমীন’ না বলা ইত্যাদি। কাজেই এ সমস্ত পদ্ধতির বিরোধিতা করা উচিত নয়।

ইবনে আব্দুল বার রহ. আরও বলেন,

فكل قوم ينبغي لهم امثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسؤلوك

منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر، وإن كان غيره مباحاً مرغوباً فيه.

“প্রত্যেক গোত্রের করণীয় হলো, তাদের পূর্বসূরীরা ভালো কাজের যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিলেন তাই অনুসরণ করা, যদিও অন্য কোনো পদ্ধতি অধিক পছন্দনীয় বা উত্তম হয়।”^{২৪৭}

সুতরাং প্রমাণিত হল, মানুষের মাঝে ফিৎনা বা একতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অনুত্তম ও অপ্রণিধানযোগ্য দলিলের উপরেই আমল করা উত্তম। কারণ মানুষের মাঝে ফিৎনা বা একতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকার পরেও সেই অনুত্তম ও অপ্রণিধানযোগ্য দলিলকে বাদ দিয়ে উত্তম ও প্রণিধানযোগ্য দলিল অনুযায়ী আমল করা বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে।

তাই যে বিষয়ে একাধিক সুন্নাহ বিদ্যমান ও স্বীকৃত, সে সকল ক্ষেত্রে যে এলাকায় যে সুন্নাহর আমল আছে তা বাকি রাখা। এক সুন্নাহ দিয়ে অন্য সুন্নাহকে বাতিল করা এবং ‘নাহি আনিল মুনকার’ এর আওতায় নিয়ে মানুষকে বিরত রাখা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। ইমামগণের নীতি ছিল, যেখানে স্বীকৃত সুন্নাহ চালু আছে তা আপন অবস্থায় বহাল রাখা, যা ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

ভূমিকাতে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, বিষয়টা যদি নাজায়েয পর্যায়ে হয়, তাহলে মানুষের মাঝে ফিৎনার আশঙ্কা থাকলেও তা মেনে আমল করা যাবে না।^{২৪৮}

আব্দুল মান্নান

^{২৪৭} আল-ইসতিযকার ৪/১০২; আত-তামহীদ ৯/২২৩ ও ১/১০।

^{২৪৮} আল-ইকতিসাদ পৃ. ৮৬।

চতুর্থ শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন :- চতুর্থ শতাব্দীর পরে কি ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে? হলে তার প্রমাণ কী?

উত্তর :- প্রথমত:

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. এর ‘আল-ইনসাফ’ গ্রন্থে রয়েছে,
 الاجتهاد نُوْعَانِ: مُسْتَقْلِلٌ، وَقَدْ فَقَدَ مِنْ رَأْسِ الْأَرْبَعِمَائَةِ فَلَمْ يُمَكَّنْ وَجُودُهُ.
 وَهُوَ بَاقٍ إِلَى أَنْ تَأْتِيَ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى، وَلَا يَجُوزُ انْقِطَاعُهُ شَرْعًا؛
 لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

“ইজতিহাদ দুই প্রকার। এক. স্বতন্ত্র ইজতিহাদ, (যিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণ করে আহকাম ও মাসায়েল আহরণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী) যা চতুর্থ শতাব্দীর পর বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

দুই. যুক্ত ইজতিহাদ (যিনি নীতি ও মূলনীতির ব্যাপারে পূর্ণ মুজতাহিদের অনুগত থেকে সে আলোকে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবী চরিত থেকে সরাসরি আহকাম ও বিধান আহরণে সক্ষম) সেটা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। এটা বন্ধ হওয়া শরীয়তসম্মত নয়। কেননা সেটা হলো ফরযে কিফায়া।”^{২৪৯}

দ্বিতীয়ত: ইজতিহাদ (তথা প্রথম প্রকার ইজতিহাদ) এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে- এটা বলা হয় অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষতার মাধ্যমে। অর্থাৎ যেভাবে এখন আর ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. এর মতো মুহাদ্দিস জন্ম নিচ্ছেন না, তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মত মুজতাহিদও জন্মগ্রহণ করছেন না। কিছু দলিল কুরআন-সুন্নাহ থেকে বলা হয়। আবার কিছু দলিল অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষতার মাধ্যমে বলা হয়। কিন্তু আশ্চর্যবোধ হয়, মুহাদ্দিসের বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়; আর মুজতাহিদের বিষয়টি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়।^{২৫০}

^{২৪৯} আল-ইনসাফ, পৃ. ৭৪, মাকতাবা দারুন নাফায়েস।

^{২৫০} দেখুন, ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কা আখেরী ফয়সালা পৃ. ২৩-২৬; আল-ইকতিসাদ পৃ. ৬৩-৬৪।

সারকথা, মুজতাহিদে মুতলাকের (তথা প্রথম প্রকার ইজতিহাদ) জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রয়োজন, তা চতুর্থ শতাব্দীর পর কারও মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি কিংবা হলেও সবার কাছে সমাদৃত হয়নি। তাই বলা যায়, কেমন যেন এই দরজাটি বন্ধ। তবে যুক্ত ইজতিহাদের দরজা এখনোও খোলা, কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে।

প্রশ্ন :- এখন কি কোনো মুজতাহিদ জন্ম নিতে পারে?

উত্তর :- আল্লাহ পাক চাইলে এখনও মুজতাহিদ জন্ম নিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ দিন হয়েছে, মুজতাহিদের দেখা মিলছে না। যেমন এক সময় ঈসা আ. পিতা ছাড়া আল্লাহ পাকের কুদরতে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় হয়েছে, পিতা ছাড়া আর কেউ জন্ম নিচ্ছে না। আল্লাহ পাকের কুদরত, তখন যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে, বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি। ঠিক মুজতাহিদগণের বিষয়টিও এরকম।^{২৫১}

প্রশ্ন :- আমাদের আর মুজতাহিদগণের মাঝে কি কোনো রূপ পার্থক্য আছে? কুরআন সুন্নাহ তো সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে?

উত্তর :- আমাদের মাঝে আর মুজতাহিদগণের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, যদিও কুরআন সুন্নাহ সে যুগেও ছিল এ যুগেও আছে। কিন্তু আবশ্যিক হলো, কুরআন-সুন্নাহ এর সাথে সাথে ইজতিহাদ করার তীক্ষ্ণ বুঝ থাকতে হবে। তার সাথে তাকওয়া, পরহেযগারী, খোদাভিরতা, সততা, ইখলাস ইত্যাদি থাকতে হবে।^{২৫২}

উপমাংস্বরূপ বুঝে, যেমন একজন লোক তার গ্রাম থেকে কখনও বের হয়নি। কিন্তু খুবই তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী যা সামনে আসে সবই বুঝে ফেলে এবং কোনো দিন সে কোনো প্রকার ধোঁকায় পড়ে না।

পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি সে পুরো দেশ ভ্রমণ করে, তার 'আউট নলেজ' অনেক বেশি। কিন্তু তীক্ষ্ণ জ্ঞান খুবই কম, প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবতাকে সে পুরোপুরি বুঝে না, মাঝে মাঝে ধোঁকায় পড়ে যায়। যদিও এই ব্যক্তির 'আউট নলেজ' অনেক বেশি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে। তারপরও সে প্রথম ব্যক্তির উর্ধ্ব নয়।

ঠিক মুজতাহিদগণ হলেন প্রথম ব্যক্তির ন্যায়। তাদের কাছে আসল ইজতিহাদের জ্ঞান ছিল। এখন যদিও আধুনিক যুগ প্রায় গ্রন্থই কম্পিউটারে

^{২৫১} ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কা আখেরী ফায়সালা, পৃ. ৩০।

^{২৫২} প্রাপ্ত পৃ. ৩১।

পাওয়া যায়। কিন্তু ইজতিহাদ করার তীক্ষ্ণ জ্ঞান তো আর কম্পিউটারে পাওয়া যায় না।^{২৫৩}

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ ... فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.

“(হাদীস ও সুন্নাহর) এ সমস্ত গ্রন্থ সংকলনের পূর্বে যারা (ইমাম) ছিলেন, তাঁরা পরবর্তীদের চেয়ে হাদীস ও সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত ছিলেন ...। তাঁদের গ্রন্থ তো ছিল তাঁদের সিনা ও অন্তর, যাতে এ সমস্ত গ্রন্থের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক অনেক গুণ বেশি পরিমাণে সংরক্ষিত ছিল। এ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত ব্যক্তির কোনো সন্দেহ হতে পারে না।”^{২৫৪}

যারা মনে করেন, পরবর্তী আলেমরা পূর্ববর্তী আলেমগণের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তাদেরকে লক্ষ্য করে ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

أَهْلُ الْعِلْمِ كَانَ الْأَوَّلُ فَأَلَّوْلُ أَعْلَمَ، وَهَؤُلَاءِ الْآخِرُ فَأَلَّخِرُ عِنْدَهُمْ أَعْلَمُ.

মা’মার রহ. বলেন, আলেমগণের মধ্যে যিনি যত আগের তিনি তুলনামূলক অধিক জ্ঞানী। অথচ এরা মনে করে, যিনি যত পরের তিনি তত জ্ঞানী!^{২৫৫}

আব্দুল মান্নান

^{২৫৩} আরও দেখুন, ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কা আখেরী ফায়সালা, পৃ. ৪৭।

^{২৫৪} রফউল মালাম আন আইস্মাতিল আ’লাম, পৃ. ১৮।

^{২৫৫} জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন, বুখারী পৃ. ১০৭।

বিশ্বব্যাপী মাযহাব অনুসারীদের অবস্থান ও পরিসংখ্যান

প্রশ্ন :- সারাবিশ্বে মাযহাব অনুসরণকারীদের সংখ্যা কত এবং কোন মাযহাবের অনুসারী কী পরিমাণ ?

উত্তর :- একথা সর্বজন বিদিত যে, বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমানের মধ্যে হাতেগোনা কিছু মুসলমান ছাড়া বাকি সকলেই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী অর্থাৎ মুকাল্লিদ ।

‘ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম’ থেকে এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট আমরা তুলে ধরছি। আজ থেকে শত বছরেরও পূর্বে সারাবিশ্বের মুসলমানদের উপর একটা জরিপ চালানো হয়েছিল। (বর্তমানের কোনো জরিপ আমাদের নিকট না থাকায় ধারণা দেয়ার জন্য আমরা পূর্বের রিপোর্টই পেশ করছি) উক্ত জরিপ থেকে জানা যায়, কোন মাযহাবের অনুসারী কতজন। ব্যাপক জরিপের পর ‘ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম’ এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যা লন্ডন থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তার হিসাব অনুযায়ী :

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী : ৩০ লাখ ।

মালেকী মাযহাবের অনুসারী : ৪ কোটি ।

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী : ১০ কোটি ।

হানাফী মাযহাবের অনুসারী : ৩৪ কোটি ।

লা-মাযহাবী, শীয়া ও কাদিয়ানীসহ অন্যান্য মাত্র দেড় কোটি ।

উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা থেকেই অনুমান করা যায়, অতীত ও বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে মাযহাব অনুসারীদের সংখ্যা বেশি ।

প্রশ্ন :- হানাফী মাযহাবের অনুসারী বেশি হওয়ার কারণ কী?

উত্তর :- এর বহু কারণ হতে পারে, তন্মধ্যে একটি হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. ৪০ জন মুহাদ্দিস ও ফকীহ শাগরিদ নিয়ে ‘ফতোয়াবোর্ড’ গঠন করেন। ১২০ হিজরী থেকে তাদেরকে নিয়ে পরামর্শ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্ব ও সতর্কতাপূর্বক ইজতিহাদী মাসায়েলের উৎকর্ষ সাধন ও লিখনী কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন। এভাবে ত্রিশ বছর যাবৎ এ বৃহৎ পূণ্যময় কাজের আঞ্জাম দিতে থাকেন। ইমাম আযম আবু

হানীফার উল্লিখিত কমিটির বিষয়টি ইমাম তাহাবী রহ. (মৃ. ৩২১ হি.) আসাদ ইবনু ফুরাতের (মৃ. ৩১৩ হি.) সনদে মুত্তাসিলান বর্ণনা করেছেন।^{২৫৬}

অপরদিকে তাঁর শাগরিদগণ বিশেষত ইমাম মুহাম্মদ রহ. সেসব সমাধানকৃত মাসআলাসমূহকে কিতাবাকারে লিখে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে প্রচার প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। তাই মুসলিম জাহানের অধিকাংশ রাষ্ট্রের মুসলমানগণ দ্বিনি মাসায়েল ও শরয়ী আহকাম হানাফী মাযহাবের কিতাবাদির মাধ্যমেই পেয়েছেন। এ কারণে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এছাড়াও আরো গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে।

প্রশ্ন :- কোন দেশে কোন মাযহাবের অনুসারীদের অবস্থান?

উত্তর :- মালেকী মাযহাব : মালেকী মাযহাবের অনুসারী সবচে' বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে স্পেনের পশ্চিমবঙ্গ, আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে।^{২৫৭}

শাফেয়ী মাযহাব : শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী সবচে' বেশি বসবাস করে মিসর, সিরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে।^{২৫৮}

হাম্বলী মাযহাব : হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী সবচে' বেশি বসবাস করে জাযীরাতুল আরব তথা আরব সাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে।^{২৫৯}

হানাফী মাযহাব: বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের প্রায় মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। যেমন ইরাক, কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, রোম ও মধ্য এশিয়ার মা-ওরাউন্নাহর তথা কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কিস্তান, তাজিকিস্তান, বুখারা, ফারগানা, খুওয়ারেযম, ভারতবর্ষ (তথা পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ) আফগানিস্তান, চীন ও বার্মা ইত্যাদি দেশে মুসলমানরা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করে থাকেন।^{২৬০}

প্রশ্ন :- সংখ্যাধিক্যের অনুসরণ করা কি কর্তব্য?

^{২৫৬} আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, মিবসবাহন নূরী শরহ মুখতাসারিল কুদুরীর মুকাদ্দামা ১/১০-১১; আবু হানীফা ওয়া আছহাবুহ ১৪৯; তারীখে বাগদাদ ১২/৩০৮; আল জাওয়াহীরুল মুদিয়াহ ১/২৫৭; ইমাম আবু হানীফা রহ. স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৪০৪ ইত্যাদি।

^{২৫৭} উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহ, আল্লামা তাকী ওসমানী দা.বা. পৃ. ৬০-৬১

^{২৫৮} প্রাগুক্ত পৃ. ৬০-৬৫

^{২৫৯} প্রাগুক্ত পৃ. ৬০-৬১

^{২৬০} প্রাগুক্ত পৃ. ৬০-৬১; মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন? ৫৮।

উত্তর :- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, “হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হবে না। সুতরাং যখন তোমরা মতবিরোধ দেখ, তখন বড় জামাআতের অনুসরণ করো।”^{২৬১}

মিশকাত শরীফে বর্ণিত এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, “কেননা যে বড় জামাত থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তাকে পৃথকভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”^{২৬২}

এখন বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমানের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া বাকি সবাই মুকাল্লিদ তথা চার ইমামের কারও না কারও অনুসারী। তাহলে কারা পৃথক হয়ে গেল?

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার সকল উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। মুসলমানদের সম্মিলিত দলের উপর আল্লাহ তাআলার (সাহায্যের) হাত রয়েছে। সুতরাং যে (দল থেকে) পৃথক হয়ে গেল, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে”।^{২৬৩}

এখন আহলে হাদীসের কথা মত সমস্ত মুকাল্লিদরা যদি গোমরাহ আর জাহান্নামী হয়, আর নিজেরা হাতেগোনা কয়েকজন জান্নাতের অধিকারী হয়, তাহলে এই হাদীসের ব্যাখ্যা কী হবে?

অন্য হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য নেকড়েস্বরূপ। যেমন নেকড়ে দলছুট বকরীকেই নিয়ে পালায়।... সুতরাং তোমরা জামাআতকে আঁকড়ে ধরো।”^{২৬৪}

অর্থাৎ দলছুট বকরীর উপর নেকড়ে যেমনে স্বাচ্ছন্দে হামলা চালায়, তেমনি শয়তানও ঐ ব্যক্তির উপর ভর করে, যে জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

^{২৬১} ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং: ৩।

^{২৬২} মিশকাত শরীফ ১/৩০।

^{২৬৩} তিরমিযী শরীফ ২/৩৯।

^{২৬৪} মুসনাদে আহম্ম ২২১০৭।

নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ ওয়াজিব

প্রশ্ন :- তাকলীদ করা কি ওয়াজিব? ওয়াজিব হলে দলিল কী?

উত্তর :- হ্যাঁ, তাকলীদ করা ওয়াজিব। দলিল হলো, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

“যদি তোমরা না জানো, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো”।^{২৬৫}

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার ও ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেলো, যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না, তার উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। সে আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদানুযায়ী আমল করবে।^{২৬৬}

তছাড়া যুক্তি ও ইতিহাসের আলোকে আমরা জানতে পারি, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে। এবং তদানুযায়ী আমল করা না-জানা ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব। একেই বলা হয় তাকলীদ।^{২৬৭}

প্রশ্ন :- নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানা কি ওয়াজিব?

উত্তর :- নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানা ওয়াজিব। এর দলিল হলো, যদি কেউ নির্দিষ্ট একটি মাযহাব না মেনে একাধিক মাযহাব মানে তাহলে নফসের প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়ে যাবে। যার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত খানবী রহ. অভিজ্ঞতালব্ধ কথাটাই লিখেছেন। তিনি বলেন, “এ ধরনের কাজ-কর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হলে, ধর্মকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার বিস্তর সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রতিটি ব্যাপারেই কোনো না কোনো মাযহাবে আত্মতুষ্টিমূলক বিধান তো

^{২৬৫} নাহুল ৪৩, আশ্বিয়া ৭।

^{২৬৬} তাফসীরে কুরতুবী ১১/২৭২, জামিউ বায়ানিল ইলম ৩৯০।

^{২৬৭} বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন মূল: মুফতি শফী রহ., মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত, সাউদি বাদশাহ ফাহাদ কর্তৃক মুদ্রিত পৃ. ৭৪২।

পাওয়া যাবেই। তাই বলে, নিজের সুবিধা মতে মাযহাবের অনুসরণ কি প্রবৃত্তি পূজার সমর্থক হবে না?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনৈক ভদ্রলোকের শরীর থেকে রক্ত নির্গত হলে তাকে বলা হলো, আমাদের (হানাফী) মাযহাব অনুযায়ী তো আপনার অয়ু নষ্ট হয়ে গেছে, পুনরায় অয়ু করে আসুন। ভদ্রলোক জবাবে বললেন, এ ক্ষেত্রে আমি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব অনুসরণ করবো। সুতরাং পুনরায় অয়ু করার প্রয়োজন নেই। অল্পক্ষণ পর ঐ ভদ্রলোকটি কামভাব নিয়ে কোনো মহিলার শরীর স্পর্শ করলো। তাকে বলা হলো, এবার তো শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ীও আপনার অয়ু নষ্ট হয়ে গেছে। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, এখন আমি আবার হানাফী হয়ে গেছি, কাজেই অয়ু শোধরানোর প্রয়োজন হবে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, একই অয়ুর পর শরীর থেকে রক্ত নির্গত হওয়া ও কামভাব নিয়ে নারী স্পর্শ করা— এ উভয় কারণ মিলিত হওয়ার দরুন উভয় মাযহাব অনুসারেই ভদ্রলোক অয়ু না করে অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করেছেন। অথচ তিনি বিনা অয়ুতেই নামায আদায় করে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের অনুসরণ ধর্মে-কর্মে এমন ধরনের হাজারো দুষ্কৃতির উদ্ভব ঘটাবে, এতে সন্দেহ নেই। এসব বিবেচনা করেই ফকীহগণ যে কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করাওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।”^{২৬৮}

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) এ ক্ষেত্রে উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন,

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار إذا كان طالبا لها وعدم ثبوتها إذا كان مشترى فإن هذا لا يجوز بالإجماع وكذا من بنى على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه وبني على فساد ولايته في حال طلاقه لم يجز ذلك بإجماع المسلمين.
ولو قال المستفتي المعين : أنا لم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم ألتم ذلك لم يكن ذلك لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح الذريعة إلى أن يكون التحليل والتحریم بحسب الأهواء.

“এর উপমা হলো এই, এক ব্যক্তি যখন নিজে হক্কে শোফা’র (preemption) দাবিদার, তখন সে প্রতিবেশীর জন্যে শোফা’র

অধিকারে বিশ্বাসী! আর যখন সে ক্রেতা, তখন তাতে বিশ্বাসী নয়। এই জাতীয় বিশ্বাস ও আচরণ সর্বস্মতিক্রমে নাজায়েয।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিবাহ শুদ্ধতা ও সংগঠনের বেলায় ফাসেক ব্যক্তির আভিভাবত্ব স্বীকার করে। (এবং এর ভিত্তিতে বিবাহের ফায়দাও ভোগ করে) কিন্তু যখন স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসে, তখন (‘হরমতে-মুগাললাযা স্ত্রী চূড়ান্ত হারাম হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে’) ফাসেক ব্যক্তির আভিভাবত্ব অস্বীকার করে। তার অধিনে সংগঠিত বিয়েকে অশুদ্ধ বলে। এই জাতীয় আচরণ সকল মুসলমানের দৃষ্টিতেই নাযায়েয। ফতোয়াপ্রার্থী যদি বলে, আগে আমি এই মাযহাব সম্পর্কে জানতাম না। এখন থেকে আমি এর অনুসরণ করে চলব, তবুও তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কারণ, এতে করে দ্বীনের সাথে হাসি-তামাশা করার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। নিছক প্রবৃত্তির আবেদনে হারামকে হালাল মনে করার পথও দিন দিন প্রসারিত হবে।”^{২৬৯}

প্রশ্ন :- নির্দিষ্ট মাযহাব মানার বাধ্য-বাধকতা তো সালাফের যুগে ছিল না। এখন বাধ্য করার কারণ কী?

উত্তর :- এটা প্রকৃত পক্ষে একটা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দ্বীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর সালাফের যুগে প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যাপকভাবে ছিল না বিধায়, তাঁদের উভয় পদ্ধতির অনুসরণ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যাপকভাবে হওয়ায় নির্দিষ্ট মাযহাবে সীমাবদ্ধ থাকার বাধ্য-বাধকতা করা হয়েছে। এর উদাহরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া সে যুগে এত ব্যাপকভাবে কিতাবাদি প্রকাশ না হওয়ায় কার কী মাযহাব ছিল এবং কোনো মাযহাবে কি সুযোগ-সুবিধা ছিল তা জানা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তা জানা অনেক সহজ। তাই প্রবৃত্তির অনুসরণও ব্যাপকভাবে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।^{২৭০}

ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) বলেন,

ووجهه: أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لا فضي إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربة

^{২৬৯} আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/২২৫ দারুল আরকাম।

^{২৭০} আল-বাহরুল মুহীত, যারকাশী ৬/৩১৯-২০।

التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين.

“(নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো, যদি মানুষকে যেকোনো মাযহাব অনুসরণ করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে মানুষ প্রবৃত্তির তাড়ণায় প্রতিটি মাযহাবের রোখসত (বিকল্প হিসাবে অনুমোদিত) বিধান খুঁজে বের করে শুধু তার উপরই আমল করবে। হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন হয়ে পড়বে। একসময় শরীয়ত থেকেই হাত ধুয়ে ফেলবে। এর বিপরীত প্রথম যুগ। কেননা তখন মাযহাব পূর্ণরূপে সংকলিত ও বিন্যাস্ত ছিল না। (তাই কোন মাযহাবে কী সুযোগ রয়েছে, তা জানার উপায় ছিল না।) সুতরাং এখন কোনো একটি মাযহাবেরই তাকলীদ করতে হবে।”^{২৭১}

নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা ভূমিকাতেও রয়েছে।

প্রশ্ন :- যে বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেয়ী যুগে বৈধ ছিল সে বিষয়টি রহিত হয় কীভাবে? অর্থাৎ তখন উভয় পদ্ধতি মানার সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন সীমাবদ্ধ করার কারণ কী?

উত্তর :- তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রা. তাঁর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা’ তথা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সাতটি কেরাতের একটি কেরাত পড়া বহাল রেখেছেন।

অথচ কুরআনের সাত কেরাতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জিবরীলে আমীনের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সাত কেরাতে কুরআন পাঠ যখন ব্যাপকভাবে বহির্বিশ্বে বিস্তৃত এবং প্রচারিত হতে লাগলো এবং তা নিয়ে ঝগড়া হতে লাগলো, তখন এতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। আর তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরাতে কুরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কেরাত সঠিক ছিল না। বরং দ্বীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কুরআনের হেফাজতের লক্ষ্যে একটি মাত্র কেরাত অবলম্বন করা হয়েছে।

ঠিক তেমনভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামগণই সত্য। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনকে তাকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয়, যে ব্যক্তি যে ইমামের তাকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে

তাকলীদের যোগ্য নয়। বরং পরিবেশের আনুকূল্য ও পরিস্থিতির উপযোগিতা অনুযায়ী এক ইমামের তাকলীদ করে এবং অন্তরে অন্য ইমামগণের প্রতি সম্মান বজায় রাখে।^{২৭২}

প্রশ্ন :- তাকলীদে শাখছী বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানা যে ওয়াজিব— এ ওয়াজিব করলেন কে? আল্লাহ করলেন, না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন?

উত্তর :- তাকলীদে শাখছী বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানা ওয়াজিব। এ ওয়াজিব স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।”^{২৭৩}

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে তাকলীদ করা ওয়াজিব বলেছেন। হাদীসের কিতাব ও ইতিহাস বলে, রাসূল ও সালাফের যুগ থেকেই তাকলীদ করার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, যা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এক. মুক্ত তাকলীদ।

দুই. নির্দিষ্ট তাকলীদ।

এখন উক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে যেভাবে মুক্ত তাকলীদ প্রমাণিত হয়েছে, তেমনিভাবে নির্দিষ্ট তাকলীদও ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। এখানে উভয়টির মাঝে পার্থক্য করার কোনো কারণ নেই বা একটিকে ওয়াজিব বলে অন্যটিকে শুধু জায়েয বা হারাম বলে পার্থক্য করার কোনো দলিল বা কারণ নেই।

সুতরাং বুঝা গেলো, মুক্ত তাকলীদ যে আয়াত ও হাদীস থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, একই আয়াত ও হাদীস থেকে নির্দিষ্ট তাকলীদও ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট তাকলীদকেও ওয়াজিব করেছেন।

^{২৭২} এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুফতি শফী রহ. রচিত, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন পৃ.

৭৪৩, সাউদী বাদশাহ ফাহাদ কর্তৃক মুদ্রিত।

^{২৭৩} সূরা নাহল ৪৩, সূরা আশ্বিয়া ৭।

তবে হ্যাঁ, উভয়টি থেকে যেকোনো একটি আদায় করলে অন্যটি পালন করা ওয়াজিব থাকবে না। যেমন কসম ইত্যাদি ভঙ্গ করার দ্বারা শরীয়তে কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। আর কাফফারা আদায়ের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। যথা:

১. দশজন মিসকিন কে খাওয়ানো।
২. দশজন মিসকীন কে কাপড় দেওয়া।
৩. একটি গোলাম আযাদ করা।

এখন যে কেউ উল্লিখিত এই তিনটির একটি আদায় করলে অন্যটি পালন করা লাগবে না। তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে, শরীয়তে কুরবানী করা ওয়াজিব। আর এই ওয়াজিব আদায়ের একাধিক পদ্ধতি বা মাধ্যম রয়েছে। যথা : গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। এখন যে কেউ এগুলোর যে কোনো একটা দ্বারা কুরবানী আদায় করলে অন্যটা আদায় করা লাগবে না, বরং তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

অনুরূপ তাকলীদের বিষয়টিও। অর্থাৎ এতেও দুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে, যে কেউ একটি পালন করলে অন্যটি পালন করা লাগবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, পদ্ধতি দুটো রয়েছে, তো আপনারা একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেন কেন?

আমরা এর উত্তরে বলবো, শরীয়তে এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যে বিষয়ে প্রথমে একাধিক পদ্ধতি চালু ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে একটার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন কুরআনে কারীম প্রাথমিক অবস্থায় সাত ভাষায় পাঠ করা হতো বা লিখা যেত। কিন্তু পরবর্তীতে এক ভাষায় কুরআন পাঠ বা লিখার বিধান জারী হলো এবং অন্য সব পদ্ধতি রহিত হয়ে গেলো।

তদ্রূপ তাকলীদও প্রথমে দুই পদ্ধতিতে ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার ইকুম জারী হলো।^{২৭৪}

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. (মৃত্যু ১১৭৬ হি.) এ প্রসঙ্গে বলেন,
قلت الواجب الأصل هو أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية
أجمع على ذلك أهل الحق ومقدمة الواجب واجبة فإذا كان للواجب طرق متعددة وجب تحصيل
طريق من تلك الطرق من غير تعيين وإذا تعين له طريق واحد وجب ذلك الطريق بخصوصه.

“মূল ওয়াজিব হলো, উম্মতের মাঝে এমন কিছু লোক থাকা যারা শরীয়তের বিধি-বিধান বিস্তারিত দলিল থেকে আহরণ করার যোগ্যতা রাখে। এটা আহলে হকের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আর ওয়াজিবের পূর্বশর্তও ওয়াজিব বলেই পরিগণিত হয়।

যদি একটি ওয়াজিব আদায় করার একাধিক পদ্ধতি থাকে, তাহলে যেকোনো একটি গ্রহণ করলেই ওয়াজিবের দাবি পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সেই ওয়াজিব আদায় করার একটি মাত্র পথ ও পস্থা নির্ধারিত থাকে বা হয়ে যায়, তখন কেবল তাই অবলম্বন আবশ্যিক।”^{২৭৫}

প্রশ্ন :- যেহেতু নির্দিষ্ট মাযহাব মানা ওয়াজিব; মাযহাব তো আরো রয়েছে। কিন্তু আপনি হানাফী মাযহাব কেন অনুসরণ করেন?

উত্তর :- আমি হানাফী মাযহাব অনুসরণ করি এ জন্য যে, আমি এমন দেশে বসবাস করি, যেখানে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবেরই প্রচলন চলে আসছে এবং এই মাযহাবের আলেমগণ, কিতাবাদি ইত্যাদি এখানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও সহজলভ্য। মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান অনায়াসে পেয়ে যাই। এমতাবস্থায় আমি যদি অন্য কোনো মাযহাব গ্রহণ করি, তাহলে সব বিষয়াদির হুকুম-আহকাম জানা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। কেননা এখানে আলেমদের জ্ঞানার্জন, চর্চা ও ব্যস্ততা অধিকাংশ নিজস্ব মাযহাবকে ঘিরেই। তাই অন্য মাযহাব সম্পর্কে ততটা সুক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী নন। এসব কারণে আমরা ধর্মীয় বিধি-বিধানে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করি।^{২৭৬}

প্রশ্ন :- যেখানে সব মাযহাব চালু রয়েছে সেখানেও হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন কেন?

উত্তর :- যেহেতু পূর্বে থেকে প্রয়োজন মত এই হানাফী মাযহাবেরই উপর আমল করে আসছি। এখন অন্য মাযহাব করলে নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। ফলে বিভিন্ন প্রকারের মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে যেতে হবে। যার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।^{২৭৭}

^{২৭৫} আল-ইনসাফ ফী ব্যানি আসবাবিল ইখতিলাফ ৭৮ দারুন নাফায়েস।

^{২৭৬} আল-ইকতিসাদ পৃ. ৫৩।

^{২৭৭} প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩।

প্রশ্ন :- একজন নওমুসলিম কোন্ মাযহাব অনুসরণ করবে?

উত্তর :- যদি নওমুসলিম ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে, যেখানে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করা হয়, তখন তার জন্য যথাযথ হলো, প্রচলিত মাযহাবের অনুসরণ করা।

আর যদি সে এমন দেশে থাকে, যেখানে বিভিন্ন মাযহাব চালু রয়েছে, তবে তার জন্য যেকোনো একটি অনুসরণের সুযোগ থাকবে, এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। কিন্তু কথা হলো, সেই নির্দিষ্ট মাযহাবের উপর অটল থাকবে। এমন যেন না হয়, নিজের সুবিধামতে কিছুদিন পরপর মাযহাব পাল্টাবে।^{২৭৮}

যোবায়ের মাকছুদ

চার মাযহাব থাকতে এক মাযহাবে সীমাবদ্ধ কেন?

প্রশ্ন :- চার মাযহাবের নির্দিষ্ট একটিকে মানতে হবে কেন?

উত্তর :- ইসলামের স্বর্ণ যুগে তথা সাহাবায়ে কেরাম রা., তাবেরীন ও তাবৈ তাবেরীনের যামানায় দীন অনুসরণের “ব্যক্তি তাকলীদ” (নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ) ও “মুক্ত তাকলীদ” (একাধিক ব্যক্তির অনুসরণ) উভয় পদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু তাদের সোনালী যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর কাল পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহর অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করে, নিজ খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ বেড়ে যায়। লাগামহীনভাবে যার যা মনঃপুত হয় সে তাই গ্রহণ করে নেয়। উম্মাহর দীন অনুসরণে এই অবক্ষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে তখনকার বিজ্ঞ ও সচেতন ওলামায়ে কেরাম চার মাযহাবের নির্দিষ্ট কোনো একটির অনুসরণকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন এবং এর উপর উম্মতের (আমলী) ‘ইজমা’ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামসহ প্রায় মুসলমান নির্দিষ্ট মাযহাব অবলম্বন করেই আমল করে আসছেন। মুসলিম উম্মাহর নিকট সর্বসম্মতভাবে গৃহীত মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মধ্যে এমন পাঁচজন ইমামের নাম কেউ উল্লেখ করতে পারবে না, যারা নিজেরা মুজতাহিদ না আবার চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাবের অনুসারীও ছিলেন না।

সুতরাং বুঝা গেল, তাদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, নির্দিষ্ট এক মাযহাব মানতে হবে।

দ্বিতীয়ত: উম্মতের মাঝে এমন অনেক ইমাম অতিক্রান্ত হয়েছেন যারা প্রথমে এক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে সেই মাযহাব ছেড়ে ভিন্ন মাযহাব গ্রহণ করেছেন। অনেক ওলামায়ে কেরাম তাদের তালিকাও তৈরী করেছেন। যেমন আল্লামা মুনাভী রহ. (মৃত্যু ১০৩১ হি.) স্বীয় গ্রন্থ ‘ফয়যুল কদীর’ এর মধ্যে ২২৮ নং হাদীসের অধীনে যারা এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব গ্রহণ করেছেন, তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হল।

- আব্দুল আজীজ বিন ইমরান রহ. মালেকী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন।
- আবু সাওর হানাফী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন।
- ইবনু আব্দিল হাকাম মালেকী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন।

- আবু জাফর বিন নসর হাম্বলী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন ।
- ইমাম তাহাবী রহ. শাফেয়ী থেকে হানাফী হয়েছেন ।
- ইমাম সামআনী হানাফী থেকে শাফেয়ী হয়েছেন ।

এভাবে ১৩ জনের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন ।

অনুরূপ শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. ‘লামিউদদারারীর মুকাদ্দামায়’ (পৃ. ২০) যারা অন্য মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম সুয়ূতী রহ. তার কিতাব ‘জাযীলুল মাওয়াহিব’ এর মধ্যে যারা অন্য মাযহাব থেকে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেছেন, তাদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন ।

উপরোক্ত মনীষীগণের মাযহাব ত্যাগের কারণ ছিল হয়তো কিছু মাসআলায় নিজের ইমামের ফতোয়া তার কাছে কুরআন-সুন্নাহর মুআফিক মনে হয়নি । তো তিনি চাইলে উক্ত মাসআলাসমূহে অন্য ইমামের তাকলীদ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট মাযহাব ছেড়ে মুক্ত তাকলীদ করেননি । বরং অন্য নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ করেছেন । সুতরাং বুঝা গেল, চার মাযহাবের নির্দিষ্ট কোনো একটির উপরে আমল করা একটি ইজমায়ী বিষয় ছিল, যার বিরোধিতা তারা কেউ করেননি । তাই চার মাযহাবের নির্দিষ্ট একটি মানতে হবে ।

এছাড়াও নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি:-

আল্লামা নাফরাভী রহ. ‘আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী’ কিতাবে (২/৩৫৭) পৃষ্ঠায় বলেন,

وقد انعقد اجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة:

أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم.

“বর্তমানে চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা রহ., মালেক রহ., শাফেয়ী রহ. ও আহমদ বিন হাম্বল রহ.- এদের মধ্যে কোনো একজনের অনুসরণ আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।”^{২৭৯}

আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লী রহ. ‘জামউল জাওয়ামে’ কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে (২/৪৪) বলেন,

(و) الأصح (أنه يجب) على العامي وغيره من لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام

مذهب معين) من مذاهب المجتهدين.

“সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিক মত এটাই যে, জনসাধারণ ও যারা ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছায়নি, তাদের জন্য ওয়াজিব হল, মুজতাহিদগণের নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করা।”^{২৮০}

ইমাম মুনাভী রহ. বলেন,

وعلى غير المجتهد أن يقلد مذهباً معيناً.

“মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট এক মাযহাব মান্য করা আবশ্যিক।”^{২৮১}

ওলামায়ে কেরামের উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে আমরা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারলাম যে, নির্দিষ্ট একটি মাযহাব অনুসরণ করা একান্ত জরুরী। মুক্ত তাকলীদ জায়েয হবে না। আর এটাই হচ্ছে যুগ যুগ ধরে ওলামা ও সাধারণ মুসলিমদের তরীকা ও কর্মপন্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সালাফের কর্মপন্থা বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কামরুল ইসলাম

মাযহাব : পরিচিতি, সূচনা ও ক্রম বিকাশ

মাযহাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

مذهب শব্দটি ذهب শব্দ থেকে নির্গত। ذهب শব্দটি সাধারণত দুটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে-

ক. সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য।

খ. যাওয়া, পথ অতিক্রম করা।^{২৮২}

দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে মাযহাব مذهب শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক. যাওয়ার স্থান।

খ. আকীদা ও বিশ্বাস।

গ. পথ ও পন্থা।

ঘ. কোন জিনিসের মূল বা ভিত্তি।^{২৮৩}

পরিভাষায় মাযহাব বলতে মুজতাহিদগণের ইসতিম্বাত বা উদঘাটনকৃত বিধানাবলীকে বুঝায়।

আল্লামা হমাবী রহ. বলেন,

المذهب في العرف هو ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية

الاجتهادية من الأدلة الظنية.

“পরিভাষায় মাযহাব হচ্ছে, শরীয়তের ওই সকল শাখাগত বিধানাবলী যেগুলো মুজতাহিদীনে কেবলমাত্র দলীলে যব্বীর ভিত্তিতে ইসতিম্বাত করেন।”

প্রশ্ন :- হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় কি মাযহাব মানার প্রচলন ছিল?

উত্তর :- হ্যাঁ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায়ও মাযহাব মানার প্রচলন ছিল। আর তা এভাবে যে, নবীজি অনেককে ফতোয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত যখন কাউকে কোন

^{২৮২} দ্র: مادة ذهب مكارم السبل

^{২৮৩} দ্র: تاجل آركس مادة ذهب

প্রদেশের জন্য গভর্ণর বানিয়ে পাঠাতেন, তখন তাদের ইজতিহাদ করার বিশেষ অনুমতি প্রদান করতেন। আর সে দেশের লোকেরা তার ইজতিহাদ ও মাযহাব মেনে চলত। এটা নব আবিষ্কৃত কোন বিষয় নয়। নিম্নে এর কিছু উপমা পেশ করা হল।

১. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَنِي إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ أَسَنُ مِنِّي لِأَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتَ لِسَانَكَ. قَالَ الْأَرْنَؤُطُ وَأَحْمَدُ شَاكِرٌ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

“আমাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনে পাঠানোর মনস্থ করলেন, আমি নবীজী স. কে বললাম, আমাকে এমন লোকদের নিকট পাঠাচ্ছেন, যারা বয়সে আমার চেয়ে বড়। নবীজী স. বললেন, যাও আল্লাহ তাআলা তোমার কলবে সঠিক জিনিসের জ্ঞান দান করবেন এবং তোমার যবানকে (সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য) মযবুত ও দৃঢ় করবেন।”^{২৮৪}

২. হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. এর প্রসিদ্ধ হাদীস:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয বিন জাবাল রা.-কে ইয়েমেনে পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেন, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তুমি কীভাবে করবে? মু'আয রা. আরয করলেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে ফায়সালা করবো। নবীজী প্রশ্ন করলেন, এতে কোনো সমাধান খুঁজে না পেলো? মু'আয রা. বললেন, তাহলে সুন্নাহর আলোকে ফায়সালা করবো। নবীজী আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোনো সমাধান না পেলো তখন?

মু'আয রা. বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো এবং এতে চেষ্টায় ক্রটি করবো না। তখন নবীজী তাঁর সাহাবীর বুকে নিজ হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সম্ভ্রষ্ট মুতাবিক কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন।”^{২৮৫}

হাদীসে মুআয রা. এর উপর আরোপিত প্রশ্ন ও তার জবাব:

প্রশ্ন :- উক্ত হাদীস দ্বারা আপনার দাবি প্রমাণিত হতে পারে না। কারণ হাদীসটির সনদ দুর্বল। যেমন ইবনে হাযম রহ. বলেন,

لا يحل الاحتجاج به لسقوطه وذلك انه لم يرد قط الا من طريق الحارث بن

عمرو وهو مجهول لا يدري احد من هو.

“হাদীসটি সাক্ষ্যে হওয়ার কারণে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না। কারণ হাদীসটি শুধু হারেস ইবনে আমরের সূত্রেই বর্ণিত। আর সে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী।”^{২৮৬}

ইমাম আবু আওন রহ. বলেন, ولا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح

“হারেস শুধু উক্ত হাদীসের সাথেই প্রসিদ্ধ এবং হাদীসটি সহীহ নয়।”^{২৮৭}

উত্তর :- আল্লামা ইবনুল কায্যিম রহ. বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে যদিও অনেক অপরিচিত রাবী ও বর্ণনাকারী আছে, তবু কোনো সমস্যা নেই। কারণ তারা হলেন, হযরত মুআয রা. এর শাগরিদ। আর হাদীসটি মাশহুর হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

তাছাড়া হারেস ইবনে আমর উক্ত হাদীস হযরত মুআযের একাধিক শাগরিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি পরিচিত একজন রাবী থেকে রেওয়াত করার অপেক্ষায় অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ।

মতন কেন্দ্রীক প্রশ্ন ও তার উত্তর:

তাছাড়া উক্ত হাদীসের উপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, হাদীসটি কাযীর ফায়সালার সাথে সম্পৃক্ত, ফতোয়ার সাথে নয়। তাই এর দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। এর জবাবে বলা হবে, এই হাদীসকে শুধু কাযীর বিষয়ের সাথে খাস করার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই, নিছক

^{২৮৫} আবু দাউদ ৩৫৯২।

^{২৮৬} আল ইহকাম ২/৭৭৩।

^{২৮৭} আত-তারীখুল আওসাত ১/২৬৮।

একটি দাবি মাত্র। বরং বুখারী শরীফ খুলে দেখুন, তাঁকে একজন প্রশিক্ষক বানিয়েও পাঠানো হয়েছিল,

عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلماً وأميراً، " فسألناه

عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف"

“হযরত আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়েমেনে আমাদের নিকট হযরত মুআয রা. শিক্ষক ও আমীর হয়ে এসেছেন। অতঃপর আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তির (মিরাছ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে তিনি এক কন্যা ও বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। (অর্থাৎ মিরাছ কে কতটুকু পাবে?) হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. কন্যা ও বোন উভয়কে অর্ধেক অর্ধেক করে দিলেন।”^{২৮৮}

এভাবে ইবনুল জাওয়াই রহ. ১৪ জন সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদান করতেন: আবু বকর সিদ্দীক রা., ওমর ফারুক রা., উসমসান গণী রা., আলী ইবনে আবি তালেব রা., আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রা., ইবনে মাসউদ রা., উবাই ইবনে কা'ব রা., মুয়ায ইবনে জাবাল রা., আম্মার ইবনে ইয়াছার রা., হুযাইফা রা., যায়েদ ইবনে ছাবেত রা., আবুদ দারদা রা., আবু মুসা আশআরী রা. ও সালমান ফারসী রা.।^{২৮৯}

প্রশ্ন :- সাহাবায়ে কেরামের যমানায় কি মাযহাবের প্রচলন ছিল?

উত্তর :- হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরামের যমানায় মাযহাবের প্রচলন ছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম রা. বিভিন্ন দেশে চলে যান, দ্বীনের প্রচার-প্রসার করেন এবং সেখানে ইলমের মারকায করেন। হযরত ওমর রা. মদীনা থেকে যান, হযরত আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা. কুফায় গমন করেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বসরায় গমন করেন, মুয়ায ইবনে জাবাল রা. সিরিয়ায় যান। এভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা. বিভিন্ন দেশে গমন করেন। এ সুবাদে সেখানকার অধিবাসীরা সমস্যার সমাধান তাঁদের থেকে জেনে নিতেন। সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদের আলোকে সমাধান দিতেন।

প্রশ্ন :- সাহাবায়ে কেরামের যমানায় প্রসিদ্ধ মাযহাব কয়টি ছিল? এবং সেগুলো কাদের মাযহাব ছিল?

উত্তর :- সাহাবায়ে কেরামের যামানায় প্রসিদ্ধ মাযহাব ছিল তিনটি: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবেত ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মাযহাব। যেমন : ইমাম বুখারীর উস্তাদ হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (মৃত্যু. ২৩৪ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘আল ইলাল’ এর মাঝে সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মাঝে তিনজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন, যাদের শাগরিদগণ তাঁদের মাযহাব অনুসরণ করতেন, তাদের মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন এবং তাদের তরীকা অনুকরণ করতেন। তাঁরা হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., যায়েদ ইবনে সাবেত রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর অনুসারীগণ যারা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন এবং তাঁর ক্বিরাত অনুযায়ী মানুষকে কুরআন শিখাতেন- তারা ছিলেন, আলকামা, আসওয়াদ ও মাসরুক রহ. প্রমুখ। তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর যে সকল শাগরিদ তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং তাঁর তরীকা অবলম্বন করতেন- তারা হলেন, হযরত আতা, তাউস, মুজাহিদ, জাবের ও ইকরামা রহ. প্রমুখ।

এভাবে যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর যে সকল শাগরিদ তাঁর নিকট জ্ঞানার্জন করতেন বা তাঁর ইলমের চর্চা করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন- তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাক্ষাতলাভ করেছেন আর কেউ তার সাক্ষাৎ লাভ করেননি, যার সংখ্যা বারজন।”^{২৯০}

প্রশ্ন :- তাবেয়ীন ও পরবর্তী যামানায় কোথায় কাদের ফতোয়ার প্রচলন ছিল?

উত্তর:- মদীনাতে মুনাব্বিহীন:- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, খারেজাহ ইবনে যায়েদ, আবু বকর ইবনে আদ্রির রহমান, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ, আবান ইবনে ওসমান, সালেম, নাকে’ আবু সালামা ইবনে আদ্রির রহমান, আলী ইবনুল হুসাইন, ইবনে হাযম যাহেরী, মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে ওসমান, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়াহ, জা’ফর ইবনে মুহাম্মদ, আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির ও ইবনে শিহাব যুহরী রহ. প্রমুখ।

মক্কাতুল মুকাররামায়:- আতা ইবনে আবী রাবাহ, তাউস ইবনে কাইসান, মুজাহিদ ইবনে জাবের, উবাইদ ইবনে উমাইর, আমর ইবনে দিনার, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকাহ, আব্দুর রহমান ইবনে সাবিত, ইকরিমাহ, আবু যুবাইর আল-মাককী, আব্দুল্লাহ ইবনে খালেদ, আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস, আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আযিয, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, মুসলিম ইবনে খালেদ, সাঈদ ইবনে সালেম ও মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস আশ-শাফেয়ী রহ. প্রমুখ।

বসরায়:- আমর ইবনে সালামাহ, আবু মারযাম আল-হানাকী, কা'ব ইবনে সাওর, হাসান বসরী, আবুশ শা'ছা জাবের ইবনে যায়েদ, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, আবু কিলাবাহ, মুসলিম ইবনে ইয়াছার, আবুল আলিয়া, হুমাইদ ইবনে আদ্রির রহমান, মুতরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ, যুরারাহ ইবনে আবী আওফা, আবু বারদাহ ইবনে আবী মুসা, আইউব সাখতিয়ানী, সুলাইমান আত-তাইমী, আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ, ইউনুস ইবনে উবাইদ, কাসেম ইবনে রাবিআ, খালিদ ইবনে আবী ইমরান, আশআছ ইবনে আদিল মালিক, কাতাদাহ, হাফস ইবনে সুলাইমান, ইয়াস ইবনে মুআবিয়া, সিওয়ার আল-কাযী, আবু বকর আল আতাকী, ওসমান আল-বাত্তি, কাযী তালহা ইবনে ইয়াস, উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-আম্বরী, আশআছ ইবনে জাবের, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল মাজীদ, সাঈদ ইবনে আবী আরুবা, হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ, ইসমাইল ইবনে উলাঈয়াহ, বিশর ইবনে মুফাযযাল, মুআয ইবনে মুআয, মা'মার ইবনে রাশেদ, যাহ্‌হাক ইবনে মাখলাদ ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী রহ.।

কুফায়:- আলকামা ইবনে কায়েস, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আমর ইবনে শুরাহবীল আল-হামদানী, মাসরুক ইবনে আজদা' আল-হামদানী, উবাইদাহ আস-সালমানী, কাযি শুরাইহ ইবনুল হারিস, সুলাইমান ইবনে রাবিআ' আল-বাহেলী, যায়েদ ইবনে সাওহান, সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ, হারেস ইবনে কায়েস আল-জু'ফী, আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা, খায়সামাহ ইবনে আব্দুর রহমান, সালমা ইবনে সুহাইব, মালেক ইবনে আমের, আব্দুল্লাহ ইবনে সাখবারাহ, যারারা ইবনে হুবাইশ, খল্লাস ইবনে আমর, আমর ইবনে মাইমুন আল-আওদী, হাম্মাম ইবনে হারেস, হারেস ইবনে সুআইদ, ইয়াযীদ ইবনে মুআওয়িয়াহ, রাবী' ইবনে খাসইয়াম, উতবাহ ইবনে ফারকাদ, শরীক ইবনে হাম্বল, আবু

ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালমা, ইবাইদ ইবনে নাযলাহ, আবু উবাইদ, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান ইবনে আবী-লায়লা, মাইসারাহ, যাযান, যাহহাক, ইব্রাহীম নাখায়ী, আমের শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান, আবু বকর ইবনে আবী মুসা, মুহারিব ইবনে দিসার, হাকাম ইবনে উতাইবাহ, জাবালাহ ইবনে সুহাইম, হাম্মাদ ইবনে আবী সালামা, সুলাইমান ইবনে মু'তামির, সুলাইমান আল-আ'মাশ, মিসআর ইবনে কিদাম, মুহাম্মদ ইবনে আবী-লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমাহ, সাঈদ ইবনে আশওয়া, শারীক আলকাযী, কাসেম ইবনে মা'ন, সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবু হানীফা, হাসান ইবনে সালেহ, হাফস ইবনে গিয়াছ, ওয়াকীহ ইবনে জাররাহ, কাযী আবু ইউসুফ, যুফার ইবনে ছুযাইল, হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা, হাসান ইবনে যিয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, কাযী আফিয়াহ, আসাদ ইবনে আমর, নূহ ইবনে দাররাজ, আল-আশজাঈ, মুআফা ইবনে ইমরান, যুলী ও ইয়াহ ইবনে আদম রহ. ।

সিরিয়ান:- আবু ইদ্রীস আলখাওলানী, শুরাহবিল ইবনে সিমত, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী যাকারিয়া আল-খুযাঈ, কুবাইসাহ ইবনে যুআইব আলখুযাঈ, হিব্বান ইবনে উমাইয়াহ, সুলাইমান ইবনে হাবীব আল-মুহারেবী, হারেস ইবনে ইবাদ আয-যাবীদী, খালেদ ইবনে মা'দান, আব্দুর রহমান ইবনে গনম আল-আশআরী, জুবাইর ইবনে নুফাইর, আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর, মাকহুল, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, রাজা ইবনে হাইওয়াহ, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান, হুদাইর ইবনে কুরাইব, ইয়াহয়া ইবনে হামযা, আব্দুর রহমান ইবনে আমর আলআওয়াযী, ইসমাইল ইবনে আবিল-মুহাজির, সুলাইমান ইবনে মুসা, সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয, মাখলিদ ইবনে হুসাইন, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম, আব্বাস ইবনে ইয়াযিদ, শুআইব ইবনে ইসহাক ও আবু ইসহাক আল-ফাযারী রহ. ।

মিসরে:- ইয়াযিদ ইবনে হাবিব, বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ, আমর ইবনুল হারেস, লাইছ ইবনে সা'দ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী জা'ফর, আব্দুল ওয়াহহাব রহ. ওসমান ইবনে কিনানাহ, আশহাব ইবনুল কাসিম, মুযনী, ইবনে আব্দুলহাকাম, বুযুতী, মুহাম্মদ ইবনে আলী, আবু জা'ফর তাহাভী

কায়রাওন:- সাহনুন ইবনে সাঈদ, সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ ।

আন্দালুস:- ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব, বাকী ইবনে মাখলাদ, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, মাসলামা ইবনে আব্দুল আযিয, মুনযির ইবনে সাঈদ, মাসউদ ইবনে সুলাইমান ও ইবনে আব্দুল বার ।

ইয়েমেনে:- মুতারিরফ ইবনে মাযিন, আবদুর রাজজাক ইবনে হাম্মাম, হিশাম ইবনে ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনে সাওর ও সিমাক ইবনে ফযল রহ. ।

বাগদাদে:- আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম, আবু সাওর ও ইব্রাহীম ইবনে খালেদ আল-কালবী ।^{২৯১}

প্রশ্ন :- তাদবীনে ফিকহ বা ফিকহের সংকলন এর সূচনা কখন ও কীভাবে হয়?

উত্তর :- হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় সাহাবায়ে কেরামগণ শরীয়তের কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে জেনে নিতেন । আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে সমাধান দিতেন ।

যদি আলোচ্যবিষয়ে পূর্বে ওহী না এসে থাকত, তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর অপেক্ষা করতেন । এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ছিল । তবে কখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করেও সমাধান দিতেন ।

মনে রাখতে হবে, আশ্বিয়ায়ে কেরামের ইজতিহাদ ও আয়িম্মায়ে কেরামের ইজতিহাদ এক ও অভিন্ন নয় । আশ্বিয়ায়ে কেরামের ইজতিহাদ সেটা ‘ওহী খফীর’ অন্তর্ভুক্ত । তাদের ইজতিহাদে সাধারণত ভুল হয় না, কখনো ভুল-ত্রুটি হলেও আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে তাম্বীহ করে দিতেন ।

পক্ষান্তরে আয়িম্মায়ে কেরামের ইজতিহাদের মাঝে ভুল হলে তা ভুলই থেকে যায়, আল্লাহ তাআলা এর তাম্বীহ করেন না ।

পরে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ.এর শাসনামলে তাঁরই নির্দেশনায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস ও আসারের সংকলন শুরু হয় ।

এভাবে উমাইয়া খেলাফতকালে, ফিকহের তাদবীন ও সংকলনের কাজ ধারাবাহিকভাবে শুরু হতে থাকে । আব্বাসী খেলাফতের প্রারম্ভে জনসাধারণের ইলমের প্রতি অনুরাগ দিন দিন বেড়ে যায় । অনারবী ভাষায় লিখিত কিতাবাদি আরবী ভাষায় ভাষান্তর করা হয় । সে সময় পুরো মুসলিম বিশ্বে তাবেয়ীন ও তাদের শিষ্যগণ ছড়িয়ে পড়েছিল ।

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বীনি ইলমের চর্চা শুরু হয় । যার ফলে ইলমে দীন ক্রমাগত সমৃদ্ধ হতে থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় প্রিয় নবীজির হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আসারকে ফিকহী তারতীবে লিপিবদ্ধ করা হয় ।

দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অনেক আয়িম্মায়ে কেলাম ফিকহের তারতীবে কিতাব রচনা করেন। যেমন,

কূফা নগরীতে:- ইমাম আবু হানীফা রহ.।

মদীনা মুনাওয়ারায়:- ইমাম মালেক রহ.।

শামে:- ইমাম আওয়ামী রহ.।

কূফায়:- সুফিয়ান ছাওরী রহ.।

মক্কায় মুকাররামায়:- ইবনে জুরাইজ রহ.।

বসরায়:- রবী' ইবনে সবীহ।

ওয়াসেতে:- হুশাইম রহ.।

ইয়েমেনে:- মা'মার রহ.।

রায়ে:- জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ রহ.।

খুরাসানে:- আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.।

এ সময় ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের কেন্দ্রস্থল কূফায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদবীনে ফিকহের কাজ চলছিল। ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর শাগরিদগণই সর্বপ্রথম ফিকহে ইসলামী ও উসূলে ফিকহকে 'ফল্লী' তথা শাস্ত্রীয় রূপ দান করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম যুফর রহ.।

সারকথা হলো, দ্বিতীয় শতাব্দীর ফুকাহা ও মুহাদিসগণ উসূল ও কাওয়াদের আলোকে মাসআলা ইস্তিহাত করেন ও তাদবীনে ফিকহের কাজ আঞ্জাম দেন। পরে তাঁদের শিষ্যগণ আপন আপন আয়িম্মায়ে কেলামের অনুকরণ করত হাদীস ও ফিকহের তাদবীনের কাজ অব্যাহত রাখেন। এভাবে ক্রমাগত তাদবীনে ফিকহের সূচনা হতে থাকে।

হানাফী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হানাফী মাযহাবের সূচনা ও ক্রম বিকাশ:

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রা. এর শাসনামলে মুসলমানগণ ইরাক বিজয় করার পর তিনি ইরাককে কূফা ও বসরা দুটো দেশে বিভক্ত করে দেন। আর হযরত ওমর ফারুক রা. আহলে কূফার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে পাঠান এবং হযরত ইমরান ইবনে হসাইন রা. কে বসরায় পাঠান।^{২৯২}

^{২৯২} সিয়রু আ'লামিন নুবালা ১/৪৭৬; তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১৮২।

কূফায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ এর মাঝে ছিলেন আলকামা ইবনে কায়স, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ, মাসরুক, উবায়দাহ সালমানী, কায়স ইবনে আবী হাযেম, যির ইবনে হুবাইশ, রাবী' ইবনে খায়সাম, কাযী শুরাইহ প্রমুখ।

৩২হিজরিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ইন্তেকালের পর তাঁর অন্যতম শিষ্য হযরত আলকামা স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর হযরত আলকামা ইন্তেকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর অন্যতম শিষ্য ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (মৃত্যু ৯৬ হি.)। অতঃপর হযরত ইবরাহীম নাখায়ীর ইন্তেকালের পর তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (মৃ. ১২০হি.) স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর হাম্মাদ ইন্তেকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর অন্যতম শিষ্য ও তাঁরই প্রতিচ্ছবি ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. (মৃ. ১৫০হি.)। তিনি দীর্ঘ আঠারো বৎসর যাবত তাঁর উস্তাদের সংস্রবে থেকে ইজতিহাদের সুউচ্চ মাকামের মর্যাদা লাভ করেন। যাকে পরবর্তিতে ইলমে ফিকহের প্রাণ পুরুষ হিসেবে স্বরণ করা হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্যের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, হাসান ইবনে যিয়াদ, আসাদ ইবনে আমর দাউদ তাই, যুফার ইবনে হুযাইল, নূহ আল-জামে, আবু মুতী' আল-বলখী, ওয়াকী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন অন্যতম।^{২৯৩}

ফিকহে হানাফীর ক্রমবিকাশ ও প্রসিদ্ধি লাভ:

প্রশ্ন:- বিশ্বব্যাপী অল্পসময়ে হানাফী মাযহাব প্রসিদ্ধি এবং অধিক অনুসারী হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী?

শায়েখ আবু যুহরা 'তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়া'তে হানাফী মাযহাবের ক্রম বিকাশের তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হল, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শাগরিদের আধিক্যতা ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর রায় ও মাযহাব প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট হওয়া।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদিসে দেহলভী রহ. 'হুজাতুল্লাহিল বালিগা'র মাঝে ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

وكان أشهر أصحابه ذكر أبو يوسف رحمه الله، فولى قضاء القضاة أيام هارون

الرشيد، فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রসিদ্ধ শাগরিদের মাঝে ইমাম আবু ইউসুফ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাদশাহ হারুনুর রশীদের শাসনামলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।”^{২৯৪}

তবে শাহ ওলীউল্লাহ রহ. যে কারণটি উল্লেখ করেছেন, এটিই একমাত্র কারণ নয়। আল্লামা সরফরায খান সফদর রহ. ‘মাকামে আবী হানীফা’ নামক কিতাবে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, ইসলামী হুকুমতের নিত্যনতুন মাসআলার জন্য হানাফী মাযহাবের বিকল্প ছিল না। তাই হুকুমত অনেকটা বাধ্য হয়ে হানাফী মাযহাবের অনুকরণ করার ফরমান দেন।

তিনি আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন:-

ক. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহের মাকাম অনেক উঁচু। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর মাযহাবের প্রসিদ্ধি এবং গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন।

খ. হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,
«لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرِيَّاءِ، لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ - مِنْ أَبْنَاءِ

فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاولَهُ».

“দ্বীনি ইলম যদি ছুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে, তবে সেখান থেকেও পারস্যের অধিবাসী এক ব্যক্তি ইলম আহরণ করে নিয়ে আসবে।”

এই হাদীসের ভবিষ্যৎ বাণীটিও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবের প্রসিদ্ধি ও মাকবুলিয়তের কারণ হতে পারে।”^{২৯৫}

গ. তৃতীয় কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাব গুরাভিত্তিক। চল্লিশজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ সেই শূরার সদস্য ছিলেন। কোনো মাসআলায় দীর্ঘ আলোচনার পর যখন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, তখনই লিপিবদ্ধ করা হত।

সরফরায খান সফদর রহ. বলেন,

يَهْ بِالْكَوْنِ وَاضِحٌ حَقِيقَتُهُ هِيَ كَهْ اِجْتِمَاعِ سَعْيِ اِنْفِرَادِي كَوْشَشِ سَهْ هَرْ حَالِ اَعْلَى وَافْضَلِ هِيَ رَهْتِي هِيَ

“এটা সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে, ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে সমষ্টিগত চেষ্টা সর্বাবস্থায় উত্তম এবং উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে।”^{২৯৬}

^{২৯৪} হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/৩৩২।

^{২৯৫} সহীহ মুসলিম: ২৫৪৬ মুসনাদে আহমদ: ৮০৬৭, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭১২৩, জামেউ মা'মার ইবনে রাশেদ: ১৯৯২৩।

^{২৯৬} মাকামে আবী হানীফা পৃ. ১৮০।

প্রশ্ন :- কাদের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের প্রচার লাভ হয়?

উত্তর :- বলাবাহুল্য ফিকহে হানাফী মজলিসে গুরার ভিত্তিতে হয়েছিল, যা একমাত্র এই মাযহাবেরই বৈশিষ্ট্য। ইমাম আবু হানীফার রহ. এর চল্লিশজন শাগরিদ উক্ত মজলিসে গুরার সদস্য ছিলেন।

তবে মাযহাবের প্রচার-প্রসারে নিম্নের চারজনের ভূমিকা অনেক।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ., ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রহ. ও হাসান ইবনে যিয়াদ।^{২৯৭}

যে সকল স্থানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী:

হানাফী মাযহাব পুরো মুসলিম বিশ্বে রয়েছে। ৪৫% মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। নিম্নে কয়েকটিদেশের নাম উল্লেখ করা হলো।

ইরাক, মা-ওরাউন্নাহার, তুরকিস্তান, সিরিয়া, মিসর।^{২৯৮} দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানের প্রায় ৯০%। ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনে ৫০% হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আর ৫০% শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।

দক্ষিণ রাশিয়া, ককেশাম, দাগেস্তান, চেচনিয়া ও বলকান অঞ্চল, যথা বসনিয়া হার্জগোভিনা, কসোভো, আলবেনীয়া, চুলগোরিয়া, ওরোমানিয়া, এবং মধ্য এশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কির্গিজিস্তান, তাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, চীন, রাশিয়া অঞ্চল, যথা তাতারিস্তান, জিনজিয়াং, ইউক্রেন, জর্জিয়া, এ সমস্ত অঞ্চলে হানাফী মাযহাব অধিক প্রচলিত। এবং তুরস্কেও হানাফী মাযহাব অধিক প্রচলিত। এভাবে পশ্চিম আফ্রিকা, মালি, মৌরতানিয়া প্রমুখ অঞ্চলেও হানাফী মাযহাব বেশ প্রচলিত।^{২৯৯}

প্রশ্ন:- ভারত উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের সূচনা কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর:- মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ের পর তৃতীয় শতাব্দীর শুরু লগ্নেই হানাফী মাযহাবের সূচনা হতে থাকে। এর কয়েকটি উপমা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

১. ২২৮ হি. তে যখন খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহ সেকান্দার প্রাচীরের অবস্থা জানার জন্য লোক পাঠান, সেখানে অবস্থিত লোকদের হানাফী মাযহাবের অনুকরণ করতে দেখেন।

^{২৯৬} মাকামে আবী হানীফা পৃ. ১৮০।

^{২৯৭} আল-মাযহাবুল হানাফী।

^{২৯৮} তারীখুল মাযাহিবুল ইসলামিয়া।

^{২৯৯} সূত্র : ইন্টারনেট।

নবাব সিদ্দীক হাসান খান লিখেন,

سکندر کے محافظ بھی مسلمان اور حنفی المذہب تھے

“সেকান্দারের অধিবাসীরাও মুসলমান এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।”^{৩০০}

শায়খ মুহাম্মদ রহ. বলেন,

۳۷۵ھ کے قریب علاقہ ملتان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد بکثرت تھے

“৩৭৫ হি. এর কাছাকাছি মুলতান নামক এলাকায় ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অনুসারী অনেক বেশি ছিল।”^{৩০১}

প্রশ্ন :- ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দিস ও ওলামায়ে কেরামের নাম জানতে চাই?

উত্তর :- ভারতবর্ষে যাদের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ফিকহ তথা পূর্ণ দীন- ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার-প্রসার লাভ করেছে এমন কিছু মুহাদ্দিস ও মুফতির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো, যারা সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., মুহিবুল্লাহ বিহারী রহ., শাহ আব্দুর রহীম রহ., শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., শাহ আব্দুল আজীয রহ., শাহ আব্দুল কাদের রহ., শাহ আব্দুল গণী রহ., শাহ ইসহাক রহ., হযরত মাও. খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ., আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ., মাও. ইয়াকুব নানুতবী রহ., শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ., ইমামুল আসর হযরত মাও. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ., হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., মুফতি কেফায়েত উল্লাহ রহ., মাও. ইয়াহয়া সাহেব কান্ধলভী রহ. শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ., ইদ্রীস কান্ধলভী রহ., মুফতি শফী রাহ, সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. প্রমুখ মনীষী।

ফিকহে হানাফীর সনদ ও পর্যালোচনা:

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা হয়তো জানার কৌতুহলে হানাফী মাযহাবের উপর একটি প্রশ্ন করে যে, আপনারা যে সকল কিতাবের উপর ভিত্তি করে আমল করে থাকেন, অথবা অন্যকে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, যেমন কুদুরী, কানযুদ দাকায়েক, হেদায়া ও ফাতাওয়া শামী ইত্যাদী কিতাবসমূহের

^{৩০০} আল-কালামুল মুফীদ, পৃ. ১০৭।

^{৩০১} আবে কাউসার, পৃ. ৩৮।

মাসআলা যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইস্তিহ্বাতকৃত মাসআলা এর প্রমাণ কি? এ সকল কিতাবে তো মাসআলার সনদ উল্লেখ নেই।

এই প্রশ্নের জবাব বিস্তারিতভাবে হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহ তাআলার নির্বাচিত প্রবন্ধে রয়েছে। সেখান থেকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সনদের তিনটি মারহালা বা স্তর রয়েছে,

প্রথম মারহালা:- কিতাবটি যেই মুসান্নিফের দিকে মানসূব বা সম্বোধন হয়ে আছে, বিশুদ্ধ সনদের সাথে এর তাহকীক করা।

দ্বিতীয় মারহালা:- উক্ত কিতাব থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত সনদের যাচাই করা।

তৃতীয় মারহালা:- ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদের পরম্পরা জানা।

সনদের প্রথম মারহালা:

সনদের প্রথম মারহালার সংক্ষিপ্ত কথা হল, কোন কিতাব এর গ্রন্থকারের নিশ্চয়তা জানার জন্য সনদের বিশুদ্ধতার চেয়েও অধিক শক্তিশালী প্রমাণ হল ইজমায়ে উম্মত ও ‘মুতালাক্বা বিলকাবুল’ তথা উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কিংবা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়া। হানাফী মাযহাব অনুসৃত মাদ্রাসাগুলোতে ফিকহে হানাফীর যে সকল কিতাব পড়ানো হয়, এগুলোর লেখকদের সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। মুসান্নিফদের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত উম্মত এর স্বীকৃতি দিয়ে আসছে।

সনদের দ্বিতীয় মারহালা:

সনদের দ্বিতীয় মারহালার মূলকথা হল, ফিকহে হানাফীর যে সকল মুতুন বা মৌলিক কিতাব আমাদের সামনে বিদ্যমান, এর প্রায় সকল মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর লিখিত গ্রন্থসমূহ (যাহেরুর রেওয়াত) থেকেই নেয়া হয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ সকল মাসআলা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন, সংক্ষিপ্ততার জন্য সনদ বা সূত্র হযফ বা বাদ দেওয়া হয়েছে।

সনদ উল্লেখ না করা আর সনদ না থাকা দুটো এক নয়। ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ কিতাবে তো হাদীসের সনদ উল্লেখ নেই। তাই বলে কি এ সকল হাদীসের সনদ নেই, তারা কি সেখানে এ প্রশ্ন করে? প্রশ্ন এখানে কেন?

‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ এর মূল ‘মাসাবীহুস্‌সুন্নার’র মাঝে তো হাদীসের কিতাবের হাওয়ালাও উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে তারা কি বলবে? তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় ভবিষ্যতে এ সকল হাদীসের কিতাবের উপরও আপত্তি করে বসবেন! আল্লাহ আমাদের ও তাদের এ সকল ভিত্তিহীন আপত্তি করে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

সনদের তৃতীয় মারহালা:

আমাদের অনেকেরই ইমাম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত ফিকহের একাধিক সনদ রয়েছে। যেমন ‘নির্বাচিত প্রবন্ধে’ আব্দুল মালিক (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর একটি সনদ ইমাম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো আলোচনা সামনের প্রবন্ধে রয়েছে।

শরীফ মাহমুদ নুমানী

হানাফী মাযহাবের ধারাবাহিক সনদ ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহ-ফতোয়া গ্রহণ

প্রশ্ন :- আপনারা ফিকহ ও ফতোয়া গ্রহণ করেন হেদায়া, ফাতাওয়া শামী, কান্যুদাকায়েক ও কুদুরী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। আর এসব ফতোয়া যে আবু হানীফার- তার প্রমাণ কী? এবং আবু হানীফা ও গ্রন্থকার পর্যন্ত আপনাদের কোনো ধারাবাহিক সনদ নেই কেন?

উত্তর :- প্রথমত: ফাতাওয়া শামী, হেদায়া ও কান্যুদাকায়েক ইত্যাদি কিতাব থেকে যেসব ফিকহ ও ফতোয়া গ্রহণ করা হয়- তা ঐ সকল গ্রন্থে মৌলিকভাবে বা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ আছে, যা ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শাইবানী রহ. (১৩২-১৮৯ হি.) এর প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে (যথা, ১. আল-মাবসূত ২. আল-জামিউস সগীর ৩. আল-জামিউল কাবীর ৪. আস-সিয়ারুল কাবীর ৫. আস-সিয়ারুস সাগীর ৬. আয-যিয়াদাত ১) রয়েছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. ফিকহে হানাফীর শীর্ষস্থানীয় তিন ইমামের অন্যতম। তাঁর উস্তাদ হলেন, অপর দুই মহান ইমাম- ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ রহ.। তাঁদের ফিকহী মতামত তিনি সরাসরি তাঁদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া ইমাম আবু হানীফা রহ. ও আবু ইউসুফ রহ. এর ফিকহ ও হাদীস বিষয়ক সংকলন ও গ্রন্থসম্ভারও তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। সুতরাং উক্ত গ্রন্থসমূহের মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর গ্রন্থাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এই প্রশ্নের সুযোগই থাকে না।

দ্বিতীয়ত: সনদের প্রয়োজন হয় খবরে ওয়াহেদ এর ক্ষেত্রে; মুতাওয়াতির^{০০২} এর ক্ষেত্রে নয়। এ কারণেই কুরআনে কারীম এর ক্ষেত্রে সনদের প্রয়োজন হয় না।

অনুরূপ আমরা যে ফিকহ ও ফতোয়ার উপর আমল করছি, তা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। কেননা যখন থেকে ইমামের কোনো কথা প্রকাশ পেয়েছে, তখন থেকেই অসংখ্য লোক

^{০০২} মুতাওয়াতির বলা হয়, যে বিষয়টি অসংখ্য লোক একে অপর থেকে বর্ণনা করেন। আর খবরে ওয়াহেদ হল, এক বা দুই জন একে অপর থেকে বর্ণনা করেন।

একজন অন্যজন থেকে গ্রহণ করা শুরু করেছে। যাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার।

সুতরাং উল্লিখিত কিতাবগুলোর ফিকহ ও ফতোয়া ইমাম আবু হানীফার প্রতি নিসবত বা সম্বোধন করাটা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত।^{৩০৩}

তৃতীয়ত: উল্লিখিত কিতাবগুলো প্রত্যেক যুগের ফিকহ ও ফতোয়া বিশেষজ্ঞদের কাছে, এমনকি অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের কাছেও হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। বরং ফিকহে হানাফীর মুতালাফা-বিল-কবুল বা স্বীকৃত উৎসগ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত।

হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. লিখেন,

وحكى الأستاذ الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا

يشترط اتصال السند إلى مصنفها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه.

“ইমাম আবু ইসহাক ইসফারায়ীনী রহ. এ বিষয়ে ইজমা’ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো থেকে তথ্যাবলী উদ্ধৃত করা যথার্থ। এর জন্য গ্রন্থকার পর্যন্ত ধারাবাহিক সনদ বা সূত্র পরম্পরা জরুরি নয়।”^{৩০৪}

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

^{৩০৩} আল-ইকতেসাদ ফিত তাকলীদ ওয়াল ইজতেহাদ পৃ. ৮১-৮২।

^{৩০৪} তাদরীবুর রাবী ১/১৫০; আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ১/২৭১।

ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রহ. (৬৬০ হি.) বলেন,

وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد، والإسناد إليها؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار، ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار، لبعد التدليس. انتهى.

আরও দেখুন, তাদরীবুর রাবী ১/১৫২, আল-আজয়িবাতুল ফাযিলাহ-আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. ৬০-৬৪, তাওযীহুন নয়র-তাহের জাযাইরী ২/৭৬৫-৭৭২। এবং ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. (৭৯০-৮৬১ হি.) এ বিষয়ে ফতহুল কাদীরে ১/৩৬০ পৃ. দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গ: “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব”

প্রশ্ন :- ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ সকল ইমাম বলেছেন,

إذا صح الحديث فهو مذهبي

“কোনো বিষয়ে যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, সেটাই আমার মাযহাব”। এখন আমরা দেখতে পাই, অনেক বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও তা ইমামের মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। এর কারণ কি?

উত্তর :- প্রথমত: ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে এ কথাটি কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে (আমাদের জানা মতে) গ্রহণযোগ্য কোনো কিতাবে উল্লেখ নাই। আর যে সব কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, তাতে কোনো সনদ উল্লেখ নাই। অথচ তারা কোনো কথা সনদ ছাড়া গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দাবি করে থাকেন, কিন্তু এই বাক্য সনদ ছাড়া গ্রহণ করেন কীভাবে?

দ্বিতীয়ত: বাক্যটির অর্থ ও মর্ম হচ্ছে, হাদীস যদি ‘সহীহ হয়’ মানে ‘আমলযোগ্য হয়’, সেটা আমার মাযহাব হিসেবে গণ্য হবে। অতএব হাদীস সহীহ হলেই যে, তা ইমামের মাযহাব হিসেবে গণ্য হতে হবে- এমন নয়। কেননা অনেক হাদীস সহীহ হওয়া সত্ত্বেও আমলযোগ্য নয়। হয়তো রহিত হয়ে গেছে বা অন্য কোন কারণ রয়েছে। এ জন্য এই বাক্যটি যদিও অন্য ইমাম থেকে প্রমাণিত, কিন্তু তার মর্ম বুঝতে হবে।

তৃতীয়ত: এটাও বুঝতে হবে যে, এ বাক্যটি কাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। মূলত এটা একমাত্র ঐ সকল ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে ও তার মধ্যে কোনটি মানসূখ (রহিত) আর কোনটি আমলযোগ্য, সে সম্পর্কে গভীর দৃষ্টির অধিকারী।

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহ. ‘রাদ্দুল মুহতার’ কিতাবে বলেন,

ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من

منسوخها.

“এটা স্পষ্ট যে, ইমামগণের এই নসীহত ঐ সকল ব্যক্তির জন্য, যারা এ নসীহতের যোগ্য। অর্থাৎ নুসূস তথা কুরআন ও হাদীসের ভাণ্ডারের

উপর ব্যাপক গবেষণার সামর্থ্য রাখেন। মানসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়া হাদীসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং যে হাদীসগুলো আমলযোগ্য তাও তার নখদর্পণে থাকে।”^{৩০৫}

কাজেই উক্ত বাক্য যেকোনো ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ হতে পারে, কোনো ব্যক্তি একটি হাদীস সহীহ মনে করছে। অথচ হাদীসটি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। সে তো হাদীস দেখছে সহীহ, কিন্তু সে জানে না উক্ত হাদীস আমলযোগ্য নয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية.

“এমন কত হাদীস রয়েছে, যা উলূমে হাদীস এর শর্তানুযায়ী সহীহ। কিন্তু সে হাদীস রহিত হয়ে গেছে।”^{৩০৬}

হাফেজ আবু যুর'আ ইরাকী রহ. বলেছেন,

لا يسوغ عندي لمن هو أهل الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه،
والتمكن من علمي الأصول والعربية ومعرفة خلاف السلف مأخذهم؛ إذا وجد
حديثاً صحيحاً على خلاف مقلده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه.

“কেউ যদি তার অনুসরণীয় ইমামের বিপরীত কোনো সহীহ হাদীস পায়, তাহলে সে ইমামের বক্তব্য ছেড়ে সহীহ হাদীসের উপর আমল করবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো,

- উক্ত ব্যক্তির সহীহ হাদীসকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে পৃথক করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

- আরবী ভাষা ও দুই ইলমে উসূল (তথা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহ) এর উপর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

- পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য ও তার উৎস সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হতে হবে।

এ বিষয়গুলোর উপর পারদর্শী ব্যক্তিই কেবল ইমামের বক্তব্য ছেড়ে হাদীসের উপর আমল করবে।”^{৩০৭}

অনুরূপ কথা ইমাম নববী রহ.-ও অল্প শব্দে বলেছেন। তিনি বলেন,

^{৩০৫} ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭।

^{৩০৬} ফাতহুল বারী ১/৪১৩।

^{৩০৭} আল-আজইবাতুল মুরদিয়া, পৃ. ৬৮।

وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب.

“এ কথাটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি মুজতাহিদ ফীল মাযহাব বা তার মাযহাবে যিনি ইজতেহাদ এর স্তরে পৌঁছেছেন।”^{৩০৮}

ইমাম আবু শামা মাকদিসী রহ. বলেন,

ولا يتأتى ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد فذلك هو الذي خاطبه الشافعي رحمه الله بقوله: (إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت) وليس هذا لكل أحد. فكم في السنة من أحاديث كثيرة صحيحة والعمل/والفتوى على خلاف ظاهرها إما إجماعاً وإما اختياراً لما منع من ذلك مما ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك.

“ইমাম শাফেয়ী রহ. কেবল মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, আমার বক্তব্যের বিপরীতে রাসূলের হাদীস পেলে হাদীস গ্রহণ করো এবং আমার কথা পরিত্যাগ করো। সুতরাং এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।...”^{৩০৯}

আল্লামা যাহিদ কাউসারী রহ. বলেন,

إذا صح الحديث فهو مذهبي: ليس بمعنى: أن كل ما قال فيه أحد: إنه حديث صحيح، أخذ به مراجعاً عما قلته من قبل، بل بمعنى: أن الحديث إذا صح بشرطه ووضحت دلالة أخذ به.

“হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব” কথাটির অর্থ এই নয় যে, কেউ কোনো হাদীসকে সহীহ বললো, আর আমি তার কথা মেনে নিয়ে আমার পূর্ব বর্ণিত (ফিকহী সমাধান) থেকে সরে আসবো। বরং কথাটির অর্থ হলো, যে হাদীস তার শর্তসহ সহীহ হবে এবং উক্ত হাদীসের অর্থও সুস্পষ্ট হবে, আমি তা গ্রহণ করবো।^{৩১০}

এই বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুহাক্কিক আল্লামা হাবীব আহমদ কীরানভী রহ. বলেন,

^{৩০৮} আল-মাজমু’ ১/১০৪।

^{৩০৯} খুতবাতুল কিতাবিল মুআম্মাল পৃ. ১৫০, শামেলা।

^{৩১০} ইমাম যাহাবী রহ. রচিত আবু ইউসুফ রহ. এর জীবনের টীকা পৃষ্ঠা নং ৬৩। উল্লেখ্য, ইমাম যাহাবী রহ. এর উক্ত কিতাব الحسن بن محمد بن يوسف وصاحبه أبي حنيفة و مناقب الإمام أبي حنيفة নামে আল্লামা যাহিদ কাউসারী রহ. ও আবুল ওফা আফগানী এর টীকা ও তাহকীক সহ প্রকাশিত হয়েছে।

حقيقة هذه الأقوال: هو إظهار الحقيقة الواقعة بأن الحجة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولي، فلا تظنوا قولي حجة مستقلة، وأنا أبرأ إلى الله مما قلته خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة لا تستلزم ما نسب هذا القائل إليه رحمه الله - أي إلى الشافعي - من تجويز نسبة كل قول صح الحديث به عند كل قائل : إليه، فاعرف ذلك ولا تغتر بأمثال هذه الكلمات.

(ইমামগণের) এরূপ কথার বাস্তবতা হলো, (ইমামগণ বলেন,) আমাদের প্রদত্ত প্রতিটি (ফিকহী সমাধান বা মাসআলার) দলিল আমাদের কথা নয়, বরং হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীই মূল দলিল। অতএব তোমরা এ কথা ধারণা করো না যে, আমাদের কথা স্বতন্ত্র দলিল। (আল্লাহ মাফ করুন) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার বিপরীত আমাদের কোনো কথা হলে আমরা আল্লাহর দরবারে দায় মুক্তি ঘোষণা করছি। তবে এ বাস্তবতা এটি আবশ্যিক করে না যে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো হাদীস সহীহ বলবে আর সেটিই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হয়ে যাবে।^{৩৩} সুতরাং এ বাক্যের মর্ম ভালোভাবে বুঝে নাও, এ ধরনের বাক্য শুনে প্রতারণিত হয়ো না।

সুতরাং প্রমাণিত হল, “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব” এই বাক্যটি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং বিশেষ কিছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইমামগণের এ কথা প্রযোজ্য।

অপব্যখ্যা ও অরাজকতা:

পক্ষান্তরে ইমামগণের “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব” নসীহতটি যদি সকলের জন্য হতো, তাহলে দ্বীনের মধ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তখন সহীহ হাদীসের স্লোগানে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো মাসআলা ইমামের মাযহাব বলে প্রচার শুরু করতো।

শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা (দা.বা.) এ বিষয়টির বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

ولو لا ضرورة التأمل والتأني واشتراط الشروط : لساغ لكل إنسان أن ينسب كل مسألة يقتنع بصحة الحديث فيها إلى فلان من الأئمة، ويأتي آخر

فينسب القول بالمسئلة نفسها إلى إمام آخر ويأتي ثالث فيقتنع بصحة حديث مخالف في المسئلة نفسها فينسب القول به إلى الإمام الأول والثاني، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية له من الاضطراب في العلم والبلبله في الدين تحت تطبيق شعار : إذا

صح الحديث فهو مذهبي!

“ইমামের পূর্বোক্ত উক্তির ব্যাপারে যদি চিন্তা ভাবনা ও শর্ত আরোপ না হতো, তাহলে যে কেউ যে কোনো মাসআলাতে কোনো হাদীস সহীহ মনে করে তা কোনো একজন ইমামের মাযহাব বলে প্রচার করতো।

এরপর অন্য ব্যক্তি পূর্বের মাসআলাটিই আরেক ইমামের মাযহাব বলে দাবি শুরু করতো।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে পূর্বের মাসআলারই খিলাফ কোনো হাদীস সহীহ মনে করে আলোচিত প্রথম ও দ্বিতীয় ইমামের মাযহাব প্রচার শুরু করতো।

এভাবে (إذا صح الحديث فهو مذهبي) “হাদীস যদি সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব” বাক্যটির ছত্র-ছায়ায় এমন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো, যার কোনো শেষ নেই।”^{৩১২}

শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা আরো বলেন, শায়খ আব্দুল গাফফার উয়ুনুস সুদ হিমসি রহ. (জন্ম-সফর, ১২৯০ হি. মৃত্যু ২৭ রবিউস সানি, ১৩৪৯ হি.) একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির। তিনি ‘দাফউল আওহাম’ কিতাবে আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. বাক্যটির উপর যে শর্তারোপ করেছেন, তা উল্লেখ করে বলেন,

“এটি অতি উত্তম শর্ত। কেননা বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। সে মনে করে যে, সে (ইলমের দিক থেকে) ‘ছুরাইয়্যা’ তারকার উপরে রয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, তার অবস্থান পাতালের তলদেশে।

এরা সিহাহ সিত্তা থেকে কোনো একটি হাদীসের কিতাব পড়ে কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফার রহ. মাযহাবের বিপরীত কোনো হাদীস পায়, তবে তারা বলে, ‘আবু হানীফার মাযহাব দেয়ালে ছুঁড়ে মার, আর রাসূলের হাদীস গ্রহণ করো।

অথচ হাদীসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা এর চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার অন্য কোনো হাদীস থাকতে পারে। অথবা সুনিশ্চিত কোনো কারণ রয়েছে, যার জন্য হাদীসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনোটিই জানে না।

এ শ্রেণির লোকদের হাতে যদি সাধারণভাবে হাদীস অনুসরণের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের কাছে যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পথচ্যুত করবে।”^{৩১৩}

সুতরাং আমরা এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, উক্ত বাক্যটি কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের জন্য বলা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, লা-মাযহাবীরা বাক্যটির মর্ম ও মাহাত্ম্য না বুঝে ফিৎনা সৃষ্টি করে। তাই এ বিষয়ে সকল মুসলমানদের সচেতন থাকতে হবে। যেন কেউ সহীহ হাদীসের ধোঁয়া তুলে ঈমান-আমল নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন!

জুনায়েদ
সাতকানিয়া

চতুর্থ শতাব্দীতে মাযহাব সূচনার দাবি ও তার খণ্ডন

অধুনা বিশ্বে লা-মাযহাবী নামে যে দলটি আল্লাহর বান্দাদেরকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ^{৩১৪} করার স্লোগান তুলেছে, তারা নিজেরাই দেখছি ফের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে যে সরলমনা মুসলমানরা হাজার বছর ধরে নির্দিষ্ট এক ইমামের মাযহাব অনুসারে আমল করে আসছিল, তাদের সামনে মাযহাবকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে সংশয়ের আগুন জালিয়ে দিয়েছে। তারা স্লোগান তুলেছে, ‘মাযহাব চারশত হিজরীর পূর্বে ছিলনা! তা বিদআত! শয়তানের পথ!’ যেন তাদের সব আক্রোশ মাযহাবের উপর। পাঠক! এমনই কিছু ঘোলাটে প্রশ্নের উত্তর আপনাদের সমীপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

প্রশ্ন :- লা-মাযহাবী ভাইয়েরা বলে থাকে, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. এর ‘আল-ইনসারফ’ ও ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে কোনো মাযহাব মানার প্রচলন ছিল না। বরং তা চতুর্থ শতাব্দীর পরে শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

উত্তর :- হাঁ, অনেক লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাদের লেখাতে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) এর উক্ত দুই কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে এ দাবি করেছেন যে, মাযহাব চতুর্থ শতাব্দী বা ৪০০ হিজরীর পরে আবিষ্কৃত একটি বিদআত, যা তার পূর্বে ছিল না।^{৩১৫}

কিন্তু তাদের এই দাবিটি সঠিক নয়। লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও তাদের মতলব হাসিলের জন্য দেহলভী রহ. এর বক্তব্যের ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছে।

প্রিয় পাঠক! প্রথমে দেখুন উক্ত দুই কিতাবের মূল আলোচনাটি।

তিনি ‘আল-ইনসারফ’ কিতাবে লিখেন,

اعلم أن الناس كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب

واحد بعينه.

^{৩১৪} ঐক্য আমাদের এবং সকলেরই কাম্য। আর মাযহাব চতুর্থ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে অন্তরায় নয়।

^{৩১৫} দেখুন, মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণে বাধ্য? পৃ. ২৮; আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে বিমোদগারের তত্ত্ব রহস্য পৃ. ৪১।

“জেনে রাখুন! প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্দিষ্ট এক মাযহাবের তাকলীদের উপর লোকদের ইজমা’ বা ঐকমত্য ছিল না।”^{৩১৬}

তিনি ‘হুজাতুল্লাহিল বালিগা’ গ্রন্থে বলেন,
اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب

واحد بعينه.

“জেনে রাখুন! চতুর্থ শতাব্দী বা ৪০০ হিজরীর পূর্বে নির্দিষ্ট এক মাযহাবের নির্ভেজাল তাকলীদের উপর লোকদের ইজমা’ বা ঐকমত্য ছিল না।”

এবার লক্ষ্য করুন তাদের দাবি “মাযহাব চতুর্থ শতাব্দী বা ৪০০ হিজরীর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে” বক্তব্যটির আরবী পাঠ, যা উভয় গ্রন্থে রয়েছে-

أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد.

সঠিক অনুবাদ: “চতুর্থ শতাব্দী বা ৪০০ হিজরী পর্যন্ত নির্দিষ্ট বা এক মাযহাবের নির্ভেজাল তাকলীদের উপর লোকদের ঐকমত্য ছিল না।”

যার সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে, ৪০০ হিজরী পর্যন্ত নির্দিষ্ট বা এক মাযহাবের তাকলীদ সবাই পালন করতেন না। বরং কিছু লোক এক মাযহাবের তাকলীদ করতেন; আর কিছু লোক বিভিন্ন মাযহাবের তাকলীদ করতেন।

এখানে এবং এর পূর্বের দুই আরবী পাঠের কোথায় তিনি বলেছেন, “মাযহাব চতুর্থ শতাব্দী বা ৪০০ হিজরীর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে”?

আর আমরা দেহলভী রহ. এর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, তা স্বয়ং তিনিও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যাতে তাঁর বক্তব্যের কেউ ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে। তিনি ‘আল-ইনসায়ফ’ কিতাবে লিখেন,

وبعد المتين ظهر فيهم التمدد للمجتهدين بأعيانهم، وقل من كان لا يعتمد

على مذهب مجتهد بعينه، وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان.

“হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব গ্রহণ করা প্রকাশ পেয়েছে। এমন লোক কমই ছিল, যারা তখন নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করত না। আর তখন নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব ছিল।”^{৩১৭}

^{৩১৬} আল-ইনসায়ফ, পৃ. ৬৮।

^{৩১৭} প্রাগুক্ত পৃ. ৭০।

কাজেই তাদের দাবি “মাযহাব চতুর্থ শতাব্দী বা ৪০০ হিজরীর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে” তা তাঁর কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। বরং এটি মতলব হাসিলের জন্য দেহলভী রহ. এর বক্তব্যের ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন : চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে নির্দিষ্ট মাযহাব মানার প্রচলন থাকার ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোনো ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থাকলে তা উল্লেখ করুন?

উত্তর : এ ব্যাপারে অন্যরা ছাড়াও ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইমাম যাহাবী রহ. প্রমুখের স্বীকারোক্তি ও বক্তব্য রয়েছে।

যেমন লা-মাযহাবী ভাইদের অনুসৃত ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন,

والأوزاعي أمام أهل الشام وقد كانوا على مذهبه إلى المائة الرابعة.

“আওয়ামী রহ. (মৃত্যু ১৫৭ হি.) সিরিয়াবাসীর ইমাম ছিলেন। ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত সিরিয়াবাসী তাঁর মাযহাবের অনুসরণ করেছিল।”^{৩১৮}

অনুরূপ সর্বজন স্বীকৃত ইমামুল জারহি-ওয়াত-তাদীল^{৩১৯} ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু. ৭৪৮ হি.) বলেন,

كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر، ثم فني

العارفون به، وبقي منه ما يوجد في كتب الاختلاف.

“বেশ কিছুযুগ সিরিয়া ও স্পেনের অধিবাসীরা ইমাম আওয়ামী রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ছিল। অতঃপর একসময় তাঁর মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এখন তাঁর মাযহাবের কিছু অংশ ‘কুতুবুল খিলাফ’ (এমন কিতাব যার মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে) এর মধ্যে পাওয়া যায়।”^{৩২০}

ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, “স্পেন এলাকায় আমার মত ও মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছে। সিরিয়াতে আছেন ইমাম আওয়ামী রহ.। আর ইরাকের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।”^{৩২১}

ইমাম মালেক রহ.-এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তার সময়ে (১৭৯ হিজরির আগ থেকে) একেক এলাকায় একেক মাযহাব প্রচলিত ছিল।

^{৩১৮} মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৫৮৩।

^{৩১৯} হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের মান নির্ণয় করেন যিনি।

^{৩২০} তাযকিরাতুল ছফফাজ, ইমাম যাহাবী ১/১৩৭।

^{৩২১} তারতীবুল মাদারিক ২/৭২।

সিরিয়াবাসী ইমাম আওয়াঈ রহ.-এর তাকলীদ করতেন। স্পেনের আন্দালুসে ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব অনুসৃত হতো। ইরাকের অধিবাসীগণ হানাফী মাযহাব মেনে চলতেন।

প্রশ্ন : চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী মহান আলেম, যারা নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন- এমন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করুন?

উত্তর : যে সকল মহামনীষী ৪০০ হিজরীর পূর্বে নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব অনুসরণ করতেন তাদের কয়েকজনের নাম সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো :-

ওকী' ইবনুল জাররাহ রহ. (মৃত্যু ১৯৭ হি.)

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান রহ. (মৃত্যু ১৯৮ হি.)

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. (মৃত্যু ২৩৩ হি.)

মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. (মৃত্যু ২১৫ হি.)

ইমাম তাহাবী রহ. (মৃত্যু ৩২১ হি.)

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. (মৃত্যু ৩৭০ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুছান্না রহ. (মৃত্যু ২১৫ হি.) প্রমুখ ইমামগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যু ২৫৬ হি.)

ইমাম মুসলিম রহ. (মৃত্যু ২৬১ হি.)

ইমাম আবু দাউদ রহ. (মৃত্যু ২৭৫ হি.)

ইমাম নাসায়ী রহ. (মৃত্যু ৩০৩ হি.)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল হাকাম মালেকী রহ. (মৃত্যু. ২০৮ হি.)

ইমাম দারাকুতনী রহ. (মৃত্যু ৩৮৫ হি.)

ইমাম হাকেম রহ. (মৃত্যু ৪০৫ হি.) প্রমুখ ইমাম মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো এক ইমামের তাকলীদ করতেন।^{৩২২}

এছাড়া সাহাবা ও তাবেরী যুগেও মাযহাব-তাকলীদ বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপরে হয়েছে।

প্রশ্ন :- বর্তমান প্রচলিত চার মাযহাব বিদআত হবে না কেন?

উত্তর :- প্রচলিত চার মাযহাবকে যদি বিদআত বলা হয়, তবে দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিদআত বলা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। যেমন, বর্তমান সংকলিত কুরআন মাজীদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর যামানায় এভাবে সংকলিত ছিল না। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংকলন করার নির্দেশও দেননি। এজন্যই তা সংকলন করাকে হযরত আবু বকর রা. প্রথমে বিদআত মনে করেছিলেন।^{৩২৩}

অনুরূপ বর্তমানে আমরা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে দেখতে পাচ্ছি, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় লিপিবদ্ধ ছিল না। এগুলো গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে তৃতীয় শতাব্দীতে। বিশেষ করে সিহাহ সিত্তার কিতাবগুলো। উপরোক্ত প্রশ্নের আলোকে বর্তমান লিপিবদ্ধ কুরআন এবং হাদীসগ্রন্থকে বিদআত বলতে হয়। অথচ তা কেউ বলে না। অতএব বর্তমান চার মাযহাবকে বিদআত বলার কোনো প্রশ্নই আসে না।

শীয়া মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে মাযহাব সম্পর্কে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল যে, “মাযহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবা যুগে ছিল না” এর জবাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন,

قوله: "إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة" إن أراد أن الأقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم؛ فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم، وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه بأقوالهم، فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم، وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان فهذا لا محذور فيه.

فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول...

قوله: "وأهملوا أقاويل الصحابة" كذب منه، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى.

وإن قال: أردت بذلك أنهم لا يقولون: مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها، فأضيف ذلك إليه،

كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها، كالبخاري ومسلم وأبي داود، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير.

وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عن قبلهم، وفي قول بعضهم ما ليس منقولاً عن قبله لكنه استنبطه من تلك الأصول.

“তার (শীয়া মতাবলম্বী আবু মানসুর হিল্লীর) দাবি, ‘মাযহাব চতুষ্টয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা যুগে ছিল না’ এ থেকে উদ্দেশ্য যদি এমন হয় যে, মাযহাবের ইমামদের মতামতসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবা রা. থেকে অনুসৃত নয় বরং নব আবিষ্কৃত, তাহলে তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা-বানোয়াট। কারণ ইমামগণ সাহাবা বিরোধিতার ব্যাপারে একমত হননি, বরং সকলেই তাঁদের অনুসারী ছিলেন। আর কেউ কোনো কারণে দ্বিমত পোষণ করলেও অন্যরা তার সাথে একমত হননি।

আর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়, মাযহাবের ইমামগণ ওই যামানায় জন্মলাভ করেননি। এতে দোষের কিছু নেই। কারণ প্রত্যেক পরবর্তীগণ পূর্বে বিদ্যমান থাকেন না।

তার দাবি, “মাযহাবের ইমামগণ সাহাবা রা. এর ফাতাওয়া ছেড়ে দিয়েছে” এ আপত্তিও অবাস্তব। কারণ মাযহাবের কিতাবগুলো সাহাবাদের ফাতাওয়া দিয়ে ভরপুর, যা দ্বারা তাঁরা প্রমাণ পেশ করেছেন। যদিও বা এক মাযহাবে এক ফতোয়া, অন্য মাযহাবে অন্য ফতোয়া।

আর যদি উদ্দেশ্য হয়, আবু বকর রা. বা ওমর রা. এর মাযহাব বলা হয় না কেন? (বরং হানাফী মাযহাব, শাফেয়ী মাযহাব বলা হয়।) এর কারণ হলো, এ সকল ইমামের প্রত্যেকে (রাসূলের) আসার একত্রিত করেছেন এবং (প্রয়োজনে) ইজতিহাদ করেছেন। তাই তাদের প্রতি মাযহাবের নিসবত বা সম্বোধন করা হয়। যেভাবে হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলকের দিকে নিসবত করে বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদের হাদীস বলা হয়।...”৩২৪

এ প্রসঙ্গে উপমহাদেশের প্রাণপুরুষ ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه.

“তদানীন্তন কাল থেকে অদ্য পর্যন্ত উক্ত সঙ্কলিত চার মাযহাবের তাকলীদ বৈধ হওয়ার উপর ইজমা’ সংঘঠিত হয়েছে। আর এতে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে, যা লুকায়িত নয়। বিশেষ করে আমাদের এই (ইলম ও আমলের অবক্ষয়ের) যুগে, যখন আমাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। কল্পিত স্বাধীনতা ও চিত্তপূজা বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজের মতামতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে ধরে নিয়েছে।”^{৩২৫}

শামসুদ্দীন সালীম

মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে কী?

প্রশ্ন : মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে কী?

উত্তর : কিছু অবস্থায় পরিবর্তন করা যাবে, এবং কিছু অবস্থায় যাবে না।^{৩২৬}

প্রশ্ন :- কোন অবস্থায় মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে, আর কোন অবস্থায় পরিবর্তন করা যাবে না?

উত্তর :- মাযহাব পরিবর্তনের কারণ- নিম্ন তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি হতে পারে :-^{৩২৭}

১. বিশেষ কারণে স্থায়ীভাবে কেউ অন্য মাযহাব গ্রহণ করলে। বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও বৈধ। এ ধরনের কাজে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।^{৩২৮}

২. এ ব্যক্তি সুযোগ-সন্ধানী হয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মাঝে যেটি পছন্দ হয়, সেটি গ্রহণ করে। এ ধরনের কাজ নিন্দনীয় ও অবৈধ।

৩. কোনো একটি নির্দিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতেহাদের যোগ্য ব্যক্তি দলিলের আলোকে উদ্দিষ্ট মাসআলা আহরণের জন্য প্রয়াসী হয়ে বিভিন্ন মাযহাবের দলিল বিশ্লেষণ করে তা অবলম্বন করবে। এ ব্যক্তি যদি ইজতেহাদের যোগ্য হয় এবং প্রাপ্তিকতা, স্থূলতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়, তবে তা শুধু বৈধই নয়, বরং তা ফিকহ শাস্ত্রের একটি প্রশংসনীয় কাজও। তবে শর্ত হলো, তাকে এ গবেষণায় ন্যায়-পরায়ণ হতে হবে।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের পাশাপাশি পরবর্তী অনেক ওলামায়ে কেরাম এ জাতীয় গবেষণা করেছেন। যেমন, ইমাম নববী রহ., ইমাম ইবনুস সালাহ, ইয় ইবনে আদিস সালাম, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাযিয়ম, তকিউদ্দীন সুবকি এবং ইবনুল হুমাম রহ. সহ বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম। এমনকি আল্লামা যাহেদ কাউসারি রহ.-কে অনেকে হানাফী মাযহাব অনুসরণের গোঁড়া হওয়ার অপবাদ দিলেও তিনি তাঁর ‘মাকালাতে’ ওয়াকফ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বক্তব্য পরিত্যাগ

^{৩২৬} জাযীলুল মাওয়াহেব ফী ইখতিলাফিল মাযাহিব পৃ. ৫৩।

^{৩২৭} পুরো উত্তরটি শায়খ আওয়ামা হাফিয়াহুল্লাহর ‘আসারুল হাদীস’ ও তার অনুবাদ ইজহারুল ইসলাম সাহেবের ‘নবিজির হাদীস ও ইমামগণের মতভেদ’ থেকে সংগৃহীত।

^{৩২৮} আল্লামা শাতেবী কৃত আল-মুয়াফাকাত, ৪/১৪৪।

করেছেন। সুতরাং ইমাম কাউসারি রহ. এ মাসআলায় জমহুরের মত অবলম্বন করেছেন, যা সহীহ হাদীস এবং সাহাবাগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমতও এটি।

ইমাম কাউসারি রহ. এর বিশ্লেষণ হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. কোনো কোনো মাসআলায় নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী দলিল থেকে মাসআলা ইস্তেস্বাতের পরিবর্তে ইবরাহিম নাখয়ী কিংবা কাযি গুরাইহের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন এবং উক্ত বক্তব্যের দলিল অশ্বেষণের চেষ্টা করেননি।

কিছু পরবর্তী বিশ্লেষণের দ্বারা যখন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ইমাম এ মাসআলায় অন্যের অনুসরণ করেছেন, তখন মাসআলাটি ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়। কেননা দলিল ছাড়া ইমাম যদি অন্যের অনুসরণ করেন, সেক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ জরুরি নয়। এসব ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল প্রকাশিত হলে তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। ইজতিহাদ মূলত এমন মাসআলার ক্ষেত্রে হয়, যেখানে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না।^{৩৯৯}

পক্ষান্তরে কেউ যদি ইজতেহাদের যোগ্য না হয়, গবেষণায় সত্যানুসন্ধানী-ন্যায়পরায়ণ না হয় এবং প্রাপ্তিকতার দোষে দুষ্ট হয়, তবে এ ব্যক্তির জন্য মাযহাব ছেড়ে ইজতিহাদের ময়দানে নেমে যাওয়া চরম গর্হিত ও নিন্দনীয় বিবেচিত হবে। বরং এটি তার ঈমান ও আমলের জন্য ধ্বংসাত্মক কাজ হিসেবে গণ্য হবে।^{৪০০}

অথচ বর্তমান সময়ের অধিকাংশ স্বশিক্ষিতরা উদার মানসিকতার অন্তরালে ইমামদের সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও স্বেচ্ছাচারিতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তারা যে উপাধি আর শ্লোগানের ছদ্মাবরণ করুক না কেন, মিছে কখনও ছদ্ম শ্লোগানে সত্য হয়ে যায় না। এবং আমরা কখনও তাদের এ গর্হিত কাজ সমর্থন করা বৈধ মনে করি না, বরং এ অন্যায়ের ঘোর বিরোধিতা করাই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর মনে করি।

দেখা যায়, এক ব্যক্তি হয়তো কোনো একটি মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাব ছেড়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব গ্রহণ করে।

^{৩৯৯} মাকালাতুল কাউসারী, পৃ. ২০০-২১৫।

^{৪০০} উমদাতুত তাহকীক ফি মাসআলাতিত তাকলীদ ওয়াত তালাফীক, সাঈদ আলবানী, পৃ. ৮৬..।

কিন্তু এই পরিবর্তন তাকে অন্য একটি মাসআলায় (উদাহরণ স্বরূপ) ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাবে পরিবর্তনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

আবার তৃতীয় একটি মাসআলায় সে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর মাযহাবে স্থানান্তরিত হবে। একইভাবে চতুর্থ কোনো মাসআলায় সে চক্রাকারে প্রথম মাযহাব অথবা অন্য কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ করবে।

এই স্থানান্তর সম্পর্কে ইমাম দারেমী রহ. নিজ সূত্রে ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

من جعل دينه غرضاً للخصومة كثر تنقله.

“যে ব্যক্তি নিজের দীনকে তর্ক-বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানায়, তার স্থানান্তর ও অভিবাসন বৃদ্ধি পায়।”^{৩৩}

এভাবে এই স্বেচ্ছাচারী এক মাযহাব থেকে অপর মাযহাবে স্থানান্তর করতে থাকবে। পরিশেষে এ ব্যক্তি শুধু চার মাযহাব থেকেই বের হওয়া পছন্দ করবে না, বরং সে এ ধরনের চল্লিশ মাযহাব থেকেও বের হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক রহ. এর সাথে এ ধরনের একজন স্বেচ্ছাচারীর কথোপকথন হয়। ইমাম মালেক রহ. তার সামনে ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. এর উক্ত বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

মহিউদ্দীন

ভিন্ন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান

প্রশ্ন :- আমরা জানি, নির্দিষ্টভাবে চার মাযহাবের একটির অনুসরণ আবশ্যিক। তথাপি এক মাযহাবের অনুসারী মুফতি সাহেবের জন্য অন্য মাযহাবানুসারে ফতোয়া প্রদান করা কি বৈধ হবে?

উত্তর :- স্বতঃসিদ্ধ নীতি হলো, এক মাযহাবের অনুসারী মুফতি সাহেব ঐ মাযহাবের নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের আলোকেই ফতোয়া প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে অন্য মাযহাব মতে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি নেই।

শরীয়তের সার্বিক কল্যাণ ও গুনাহের সুযোগ বন্ধ করার স্বার্থে এ বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়েছে। মানুষের মাঝে গুনাহের প্রবণতা রয়েছে, তাই কখনো কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এক পর্যায়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর এটা বাস্তব ও পরীক্ষিত।^{৩৩২}

তবে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে মুফতি সাহেবের জন্য ভিন্ন মাযহাবানুযায়ী ফতোয়া প্রদানেরও অবকাশ রয়েছে, যার বিবরণ সামনে আসছে।

প্রশ্ন :- অন্য মাযহাব অনুযায়ী আমল করা কিংবা ফতোয়া প্রদান কখন বৈধ?

উত্তর :- অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো, মুজতাহিদগণের সকল মাযহাব কুরআন-সুন্নাহরই ব্যাখ্যা, যার কোনো একটিতেও দোষ তালাশের কোনো সুযোগ নেই। আর যেহেতু প্রত্যেক মুজতাহিদ কুরআন-সুন্নাহর 'নস' এর সঠিক মর্ম উদ্ধার ও তা থেকে আহকাম উদঘাটনে সর্বাত্মক সচেষ্ট ছিলেন, তাই প্রত্যেক মাযহাবই শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এক মাযহাবের বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের জন্য কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্য-পরিত্যাগের শর্তে অন্য মাযহাবের উক্তিকে আমল কিংবা ফতোয়া প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা জায়েয বা বৈধ। তবে এ বৈধতা ৩টি অবস্থায় সীমাবদ্ধ।

এক. عموم بلوی বা ব্যাপক প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে।^{৩৩৩}

দুই. অন্য ইমামের মাযহাব দলিলের আলোকে প্রণিধানযোগ্য হলে।^{৩৩৪}

^{৩৩২} উসূলুল ইফতা, আদ্বামা তাকী ওসমানী পৃ. ২০২।

^{৩৩৩} প্রাগুক্ত।

^{৩৩৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

তিন. কোনো কাযী যদি স্বীয় মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফায়সালা করে, তাহলে মুফতি সাহেবের জন্য সে ফায়সালা অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া বৈধ।^{৩৩৫}

প্রশ্ন :- عموم بلوی বা ব্যাপক প্রয়োজনের সম্মুখীন হওয়া বলতে কি বুঝায়? এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমের জন্য কী করণীয়?

উত্তর :- عموم بلوی বা ব্যাপক প্রয়োজনের সম্মুখীন হওয়া দ্বারা বুঝায়, কোনো মাযহাবের নির্দিষ্ট কোনো মাসআলায় যদি অসহনীয় সমস্যা দেখা দেয় অথবা এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, যা থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকে না। এমন মুহুর্তে সমস্যার নিরসন ও প্রয়োজন পূরণার্থে অন্য মাযহাব অনুযায়ী আমল করা ও ফতোয়া প্রদান করা বৈধ।^{৩৩৬}

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআন শিখিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা হানাফী মাযহাব মতে বৈধ না থাকলেও পরবর্তী হানাফী ওলামায়ে কেরাম শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য গ্রহণ করে তা বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। কেননা তাতে অসহনীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল।^{৩৩৭}

বিজ্ঞ আলেম ও মুফতি সাহেবের করণীয় :

এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের করণীয় বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বর্তমান যামানার বিশিষ্ট আলেম আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ তকী ওসমানী সাহেব (হাফিয়াহুল্লাহ) বলেন, বর্তমান যমানায় মানব সমাজে লেনদেন, বিভিন্ন পেশার আবিষ্কার এবং বিভিন্ন শহর ও দেশে ব্যবসা বাণিজ্য খুব ব্যাপক রূপ লাভ করেছে।

সুতরাং একজন আদর্শবান মুফতি সাহেবের জন্য উচিত হলো, যে সকল বিষয়ে মানুষ বেশি সম্পৃক্ত, সেক্ষেত্রে চার মাযহাব থেকে যে বিষয়টি মানুষের জন্য সহজ হয়, সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া। যদিও তা ভিন্ন মাযহাবের বক্তব্য অনুযায়ী হয়।^{৩৩৮}

(উপরোক্ত বিষয়ে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ. তাঁর শিষ্য মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. কে অসিয়ত করে গেছেন, আর বহু মাসআলায় তিনি তা বাস্তবায়নও করেছেন।)

^{৩৩৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

^{৩৩৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

^{৩৩৭} প্রাগুক্ত পৃ. ২০৩।

^{৩৩৮} প্রাগুক্ত পৃ. ২০৪।

প্রশ্ন :- عموم بلوی বা ব্যাপক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে অন্য মাযহাব মতে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কী কী শর্ত লক্ষণীয়?

উত্তর :-

১. বাস্তবিক খুব বেশি প্রয়োজনের সম্মুখীন হওয়া। নিছক ধারণাভিত্তিক না হওয়া।

২. সমসাময়িক অন্য মুফতি ও জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনকে সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা। এমন বিষয়ে তাড়াহুড়া করে এককভাবে ফতোয়া না দেওয়া।

৩. কোনো মাসআলায় যে মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদানের ইচ্ছা করেছেন, সে মাসআলা সম্পর্কে উক্ত মাযহাবের বিজ্ঞ ওলামাগণের কাছ থেকে সুনিশ্চিতভাবে জেনে ফতোয়া প্রদান করা। শুধু দু-এক কিতাবের উপর ভরসা করবে না।

৪. অন্য মাযহাবের যে উক্তির উপর ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে, সেটি জমহুর ফুকাহাদের বিপরীত ও বিরল বিষয় না হতে হবে।

৫. উক্ত মাসআলায় ঐ মাযহাবকে গ্রহণযোগ্য সমস্ত শর্ত সহ গ্রহণ করা। যাতে করে একই মাসআলায় (تلفيق) তালফীক পর্যন্ত না পৌঁছায়।^{৩৩৯}

প্রশ্ন :- কী পরিমাণ ইলমী যোগ্যতা থাকলে একজন মুফতি সাহেব অন্য মাযহাবের দলিলকে প্রাধান্যযোগ্য মনে করে আমল কিংবা ফতোয়া প্রদানের জন্য নির্বাচিত করতে পারেন?

উত্তর :- একজন মুফতি সাহেব যখন স্বীয় মাযহাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন, দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে হন বেশ জ্ঞাত এবং কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে তার সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান থাকে, (যদিও তিনি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছতে পারেননি) এমনতাবস্থায় তিনি যদি এমন কোনো সহীহ হাদীস পান, যা তার অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয় আর তিনি উক্ত হাদীসের বিপরীত শুধু নিজের ইমামের বক্তব্যকেই পান, তাহলে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মুফতি সাহেবের জন্য স্বীয় ইমাম বা মাযহাবের উক্তিকে ছেড়ে ঐ সহীহ হাদীস অনুযায়ী যে ইমামের মাযহাবকে পাবে, সে অনুযায়ী আমল করা ও ফতোয়া প্রদান করা তার জন্য বৈধ।

মুফতি তকী ওসমানী সাহেবের বক্তব্য লক্ষ্য করুন,

والحالة الثانية التي يجوز فيها العمل والإفتاء بمذهب الغير "أن يكون المفتي متبحرا في المذهب، عارفا بالدلائل، له نظر عميق في القرآن والسنة، وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد، ولكنه يطلع على حديث صحيح واضح الدلالة ولا يوجد له معارضا إلا قول إمامه فحينئذ يسوغ له الأخذ بقول مجتهد وعمل بذلك الحديث.

তালফীক পরিচিতি ও তার শরয়ী বিধান:

প্রশ্ন :- (تلفيق) তালফীক কাকে বলে, একটু জানতে চাই?

উত্তর :- তালফীক এর শাব্দিক অর্থ ضم شقة إلى أخرى অর্থাৎ একটিকে অপরটির সাথে মিলানো।

পরিভাষায় তালফীক বলা হয়, একই মাসআলায় দুই বা ততোধিক মাযহাব গ্রহণ করা। যার ফলে এমন যৌগিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা কোনো মাযহাব মতেই বৈধ নয়।

সহজে বুঝার লক্ষ্যে উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমরা জানি শরীরের কোনো অঙ্গ হতে যদি রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে যায়, এর দ্বারা হানাফী মাযহাব মতে অযু ভেঙ্গে যায়। আর আমরা এটাও জানি যে, উত্তেজনার সহিত মহিলাকে স্পর্শ করলে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী অযু ভেঙ্গে যায়। উভয় মাসআলায় হানাফী ও শাফেয়ীর বক্তব্য বিপরীতমুখী।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি মহিলাকে স্পর্শ করার দ্বারা অযু না-ভাঙ্গার মাসআলায় হানাফী মাযহাব আর প্রবাহিত রক্ত দ্বারা অযু না-ভাঙ্গার মাসআলায় শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে আর মহিলাকে স্পর্শ করে এবং শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে যাওয়ার পর নামায আদায় করে, তবে কোনো মাযহাব মতেই তার নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ সে কোনো মাযহাব মতেই অযু বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য নয়।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তার অজু নেই, তার শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে, আর শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তার অযু নেই, উত্তেজনার সহিত মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে। সুতরাং একই অধ্যায়ে বরং একই মাসআলায় (অযু) এমন দুটি বিষয় একত্রিত হয়েছে, যা কোনো মাযহাব মতেই বৈধ নয়।^{৩৪০}

প্রশ্ন :- তালফীক এর হুকুম কি?

উত্তর :- তালফীকের হুকুম নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী, ইবনু মোল্লা ফররুখ সহ কিছু ওলামায়ে কেরাম এটিকে জায়েয বলেন। কিন্তু চার মাযহাবের সমস্ত মুতাআখখিরীন ওলামাগণ তালফীক জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন।

বর্তমান যমানার বিশিষ্ট আলেমেদীন শাইখুল ইসলাম মুফতি তকী ওসমানী সাহেব দা.বা. উভয় পক্ষের মতপার্থক্যের মীমাংসা করতে গিয়ে বলেন, ‘তালফীক’ নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়াটি প্রণিধানযোগ্য। কেননা কামনা ও কু-প্রবৃত্তির বাসনায় মাযহাব নিয়ে খেলা করা কুরআনের ‘নস’ দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

فَاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

আল্লামা তকী ওসমানী সাহেব (দা.বা.) বলেন, যদি তালফীককে জায়েয করা হয় তাহলে কামনা ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ শুরু হয়ে যাবে, যা উপরোক্ত আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।^{৩৪১}

ভিন্ন মাযহাবের ইমামের পিছনে নামায আদায় প্রসঙ্গ

প্রশ্ন :- ভিন্ন মাযহাবলম্বী ইমামের পিছনে নামায আদায় করার হুকুম কী?

উত্তর :- ভিন্ন মাযহাবীয় ইমামের পিছনে নামায আদায়ের হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে এখানে হানাফী ওলামাগণের ফতোয়াসিদ্ধ বক্তব্য বর্ণনা করা হল।

আল্লামা ইউসুফ বানূরী রহ. জামে তিরমিযীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মাআরিফুস সুনানে’ হেদায়া প্রণেতার মত উল্লেখ করে বলেন,

قال صاحب الهداية: إنه يجوز، إلا إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته

كالفصد وغيره.

“হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, মুক্তাদি তার ভিন্ন মাযহাবীয় ইমামের পিছনে নামায আদায় করা জায়েয। তবে হ্যাঁ, ইমাম থেকে যদি এমন

বিষয় জানতে পারে যার দ্বারা (মুক্তাদির মাযহাব মতে) নামায নষ্ট হওয়া আবশ্যিক হয়ে যায়, তাহলে জায়েয হবে না।”^{৩৪২}

হানাফী মাযহাবের শর্ত ও রুকনের প্রতি যত্নবান হয়ে যদি শাফেয়ী মাযহাবী ইমাম ইমামতী করে, তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে হানাফী মুক্তাদীর নামায শুদ্ধ হবে। কিন্তু মাকরুহ হবে কি না এ নিয়ে ওলামাগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এ মাসআলার সমাধানে আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. বলেন,

إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وإن شك كره.

“মুক্তাদী যদি ভিন্ন মাযহাবের ইমামের পক্ষ থেকে স্বীয় মাযহাবে বর্ণিত সমস্ত শর্ত ও রুকনের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়, তাহলে মাকরুহ হবে না। আর যদি যত্নবান না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়, তাহলে তার পিছনে নামায আদায় শুদ্ধ হবে না। আর যদি যত্নবান হওয়া না-হওয়া নিয়ে সন্দিহান থাকে, তাহলে হানাফীর নামায উক্ত ভিন্ন মাযহাবী ইমামের পিছনে মাকরুহ হবে।”^{৩৪৩}

এ মাসআলায় আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. নিজের মতামত পেশ করতে গিয়ে বলেন,

والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراعاة في الفرائض، لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم.

“আমার নিকট প্রাধান্যযোগ্য ফতোয়া হলো, ভিন্ন মাযহাবী ইমামের পিছনে নামায আদায় মাকরুহ হবে না, যদি ইমাম মুক্তাদির মাযহাবে বর্ণিত ফরযসমূহের প্রতি যত্নবান হয়। কেননা অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীন রা. মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও এক ইমামের পিছনে নামায আদায় করেছেন।”^{৩৪৪}

^{৩৪২} মাআরিফুস সুনান ১/১৬১-১৬৩। আরও দেখুন আল্লামা ইবনে নুজাইমের ‘আল-বাহরুর রায়েক’ কিতাবের ১ম খ- ৬১৩ নং পৃষ্ঠা এবং ‘ফাতাওয়া শামী’র ২য় খ- ৩০২ ও ৩০৩ পৃষ্ঠায়ও মোল্লা আলী কারী রহ. থেকে অনুরূপ বক্তব্য নকল করা হয়েছে।

^{৩৪৩} আদ-দুররুল মুখতার, ১/৫৬৩-৫৬৪, এইচ. এম সাঈদ; আল বাহরুর রায়েক, ২/৮১-৮২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১/৩৮২-৩৮৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬/৩৬৯, আশরাফী বুক, দেওবন্দ।

^{৩৪৪} ফাতাওয়া শামী ১/৫৬৪, এইচ. এম সাঈদ, ফতোয়া মাহমুদিয়া ৬/৩৬৯, ইমদাদুল ফতোয়া, ১/৩৮২-৩৮৩।

উল্লেখ্য, হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের মধ্যে বিতির নামাযের হুকুম তথা ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত হওয়া ও আদায়ের পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকার কারণে অর্থাৎ হানাফীগণের নিকট ১ সালামে আর শাফেয়ীগণের নিকট ২ সালামে আদায় করার কারণে সচেতন মুকাল্লিদেদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, শাফেয়ী ইমামের পিছনে হানাফীর বিতির নামায আদায় কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর :- এ মাসআলায় হানাফী ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে। তবে এখানে উক্ত মাযহাবের ফতোয়াসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতটি তুলে ধরা হল। আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী রহ. এ মাসআলা সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন,

فظهر بهذا أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر إن لم يسلم

على رأس الركعتين وعدمها إن سلم.

“দীর্ঘ আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, শাফেয়ী ইমাম বিতির নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় রাকাতে সালাম না ফিরিয়ে ৩ রাকাত একই সালামে আদায় করে, তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে হানাফী মুক্তাদীর বিতির নামায আদায় করা শুদ্ধ হবে; অন্যথায় শুদ্ধ হবে না। আর এটাই বিশুদ্ধ মাযহাব।”^{৩৪৫}

তবে উক্ত নামায আদায় করার সময় শুধু বিতির আদায়ের নিয়ত করবে, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত কোনোটাই উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সন্দেহের অবকাশযুক্ত প্রমাণাদীর মাধ্যমে বিতিরের ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ায় অত্যাৱশ্যকীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মুহাম্মদ উসামা

^{৩৪৫} আল-বাহরুর রায়েক: ২/৭, বিস্তারিত দেখুন, ফাতহুল কাদীর ১/৪৫২-৪৫৩, মাকতাবায়ে তাওফীকিয়া, ফাতাওয়া শামী ২/৫৩৬-৫৩৭, মাকতাবাতুল আযহার।

মাযহাব চারটি কেন?

প্রশ্ন :- মাযহাব চারটি কেন? অর্থাৎ মাযহাব তো অনেক ছিল, শুধু চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলো কেন?

উত্তর :- এর কারণ হলো, এই চার মাযহাবের মধ্যে মৌলিক ও শাখাগত সমস্ত মাসআলার সমাধান দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, এই চার মাযহাব সুবিন্যস্ত গ্রন্থবদ্ধ আকারে সংকলিত এবং ইসলামী দুনিয়াই সর্বত্র বিরাজমান।

পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে শরীয়তের সমস্ত হুকুম-আহকামের সমাধান দেওয়া নাই এবং মূলনীতি সহকারে সুবিন্যস্ত গ্রন্থবদ্ধ আকারে সংকলিত হয়নি। এছাড়া তাদের মাযহাবের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না বিধায় মুসলিম চার মাযহাব মানতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها

كلها مفسدة كبيرة.

“জেনে রাখুন! এই চার মাযহাব অনুসরণের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে এর থেকে বিমুখতায় রয়েছে বিরাট ক্ষতি।”^{৩৪৬}

এভাবে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইজ্জাতুল্লাহিল বালোগা’ ১ম খণ্ডের ১৫৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

إن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة - أو من يعتد به

منها - على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما

في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا، وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل

ذي رأي برأيه.

“নিশ্চয় সংকলিত ও সুবিন্যস্ত মাযহাব চতুষ্টয়ের আজ পর্যন্ত তাকলীদের বৈধতার উপর উম্মত একমত পোষণ করেছেন। আর এর উপকারিতা ও কল্যাণ সুস্পষ্ট, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন চিন্তা-

চেতনা খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে, কু-প্রবৃত্তি বিরাজ করছে এবং প্রত্যেকেই যার যার রায়ের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে।”^{৩৪৭}

মাযহাব চতুষ্টয়ের সীমাবদ্ধতার উপর আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. ‘আত-তাহরীর ফী উসুলুল ফিকহ’ নামক গ্রন্থে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,
 وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين منع تقليد غير الأئمة الأربعة لانضباط
 مذاهبهم وتقييد مسائلهم وتخصيص عمومها ولم يدر مثله في غيرهم إلى الآن
 لانقرض أتباعهم.

“পরবর্তীকালের শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ ছাড়া অন্য কোনো ইমামের তাকলীদ করা থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ একমাত্র ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবই সব বিষয়ে সামগ্রিকভাবে খুঁটিনাটি সহকারে গঠিত। আর চার মাযহাবের বাইরে অন্যদের অনুসারী না থাকার কারণে তাদের মাযহাব এমন নয়।”^{৩৪৮}

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. ‘আল-ইকতিসাদ’ গ্রন্থের ৫২ নং পৃষ্ঠায় মাযহাব চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, “চার মাযহাবের ইমামগণ মৌলিক ও শাখাগত সমস্ত মাসআলার সমাধান দিয়েছেন এবং শরীয়তের সমস্ত হুকুম-আহকামের সমাধান এই চার মাযহাবের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই চার মাযহাবের গ্রহণযোগ্যতার উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে। তাই এই চার মাযহাব অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।”

বরং যারা চার মাযহাবের বিরোধিতা করবে তারা ইজমা থেকে বের হয়ে যাবে। বিখ্যাত উসূলে ফিকহ এর কিতাব ‘আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের’ এর ১৩১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

من خالف الأئمة الأربعة فهو مخالف الاجماع.

“যে ব্যক্তি চার ইমামের খেলাফ করবে সে ইজমার বিরোধী।”

অথচ গাইরে মুকাল্লিদগণ মাযহাব চতুষ্টয়ের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে।

^{৩৪৭} হুজ্জাতুল্লাহিল বালোগাহ ১/১৫৪।

^{৩৪৮} আত-তাহরীর ফী উসুলুল ফিকহ পৃ. ৫৫২।

শায়খ আহমদ মোল্লা জিওন রহ. ‘তাকসীরে আহমদী’তে ৫০৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

الانصاف : أن انحصار المذاهب في الأربعة واتباعهم فضل إلهي، وقبولية من

عند الله، لا مجال فيه للتوجيهات والأدلة.

“ন্যায়সঙ্গত কথা হলো, মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং তাদের আনুগত্য করা- এটা আল্লাহ পাকের একটি অনুগ্রহ এবং এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কবুলিয়াত। এখানে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও দলিলের পিছনে পড়ার অবকাশ নেই।”

এর সমর্থনে আমার সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ (হাফিযাহুল্লাহ) হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর কিতাব ‘আল-ইকতিসাদ’ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আল-ইতিমাদ’-এ বলেন,

هذا هو العدل والإنصاف في توجيه انحصار المذاهب في الأربعة، وهذا شيء لا

ينازع فيه مع أحد يعطيه من يشاء من عباده، كما قال تعالى: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [الحديد: ٢١]، {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ}

[النساء: ٣٢].

ثم في عدد "الأربعة" سرٌّ خفي لا يعلمه إلا الله؛ لأننا نرى كثيرا من الأشياء

منحصرة في العدد المذكور. مثل خير الكتب الأربعة: التوراة والزبور والإنجيل

والقرآن من الكتب السماوية، وأشهر الملائكة الأربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل

وعزرائيل من الملوك النورانية، وأفضل الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان

وعلي من الصحابة المهديّة ﷺ، وغيرها.

“মাযহাব চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি যথার্থ ও ন্যায় সঙ্গত কথা। আর এটা এমন বিষয়, যে ব্যাপারে কারও সাথে ঝগড়াও করা যায় না। কারণ আল্লাহ পাক তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।” যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

অর্থ “এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।”^{৩৪৯}

অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন,

অর্থ “যে সব জিনিসের দ্বারা আমি তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তার আকাজ্জা কর না।”^{৩৫০}

“অতঃপর আমরা আরেকটা রহস্য লক্ষ্য করি। তা হলো, চার সংখ্যার মধ্যে একটা বিশেষত্ব রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে গোপন রহস্য বিদ্যমান, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। কেননা আমরা চার সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে- এমন অনেক কিছু দেখতে পাই। যেমন চার আসমানি কিতাব তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফ। এভাবে চার প্রসিদ্ধ ফেরেশতা, জিবরাঈল, মিকাইল, আযরাঈল ও ইসরাফীল আ.। অনুরূপ চার খলীফা হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী রা.।^{৩৫১}

সুতরাং আমাদেরকে চার মাযহাবের কোনো একটার অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা চাই। আল্লাহ পাক সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

জুনায়েদ
(সাতকানিয়া)

^{৩৫০} সূরা নিসা: ৩২।

^{৩৫১} আল-ইতিমাদ ফী তওদীহিল ইকতিসাদ (পাণ্ডুলিপি)।

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

প্রশ্ন :- তাকলীদ-মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা এবং না মানার পরিণতি কী?

উত্তর :- প্রয়োজনীয়তা ও পরিণতি সম্পর্কে নিম্নে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত হলো।

এক. প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী আলেম মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবী রহ. বলেন,

“পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যারা ইলম না থাকা সত্ত্বেও মুজতাহিদ বনে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে তাকলীদ পরিহার করে, পরিশেষে তারা ইসলামকেই বিদায় সম্ভাষণ জানায়। মুরতাদ ও ফাসেক হওয়ার বহু কারণ পৃথিবীতে রয়েছে। কিন্তু দীনদার মানুষের বে-দীন হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ইলম না থাকা সত্ত্বেও তাকলীদ পরিহার করা।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের যেসব ইলমহীন বা স্বল্প ইলমের অধিকারী লোক তাকলীদ পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেয়, তাদের উচিত নিজেদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে ভীত হওয়া। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা দিন দিন মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে।”^{৩৫২}

দুই. প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ. লিখেন, “তাদের (আহলে হাদীস) হাদীসের অনুসরণের অর্থ হলো, ইমামগণের মতভেদপূর্ণ সেই মাসআলাগুলোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। বলাবাহুল্য যে, এসব লোক আহলে হাদীসের প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত।”^{৩৫৩}

তিন. প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম, খাযা আব্দুল ওয়াহিদ খানপুরী রহ. বলেন,

“বর্তমান সময়ের বিদআতী ও সালাফ-বিরোধী ভ্রষ্ট আহলে হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ; তারা রাফেযীদের উত্তরসূরী। অর্থাৎ যেমন শীআদের মাধ্যমে কুফরী ও মুনাফেকী বিস্তার লাভ করেছে এবং বে-দীন ও যিন্দিক (নাস্তিক) ‘মুসলিম

^{৩৫২} ইশাআতুস সুন্নাহ, খ- ১১, সংখ্যা ২, ১৯৮৮ ইং- সূত্রে নবীজীর নামায পৃ. ৮৬।

^{৩৫৩} আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ- নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, শামেলা, পৃ. ১৩৯।

পরিচয়' লাভের সুযোগ পেয়েছে, তেমনি বর্তমান যুগের মূর্খ ও বিদআতী আহলে হাদীসরাও বে-দীন ও যিন্দিকদের মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।”^{৩৫৪}

চার. অমৃতসর এলাকায় সর্বপ্রথম আহলে হাদীস মতবাদ চালুকারী ডেপুটি কালেক্টর হাফেজ মুহাম্মদ ইউসুফ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভক্ত ও অনুসারী হয়ে যায়।^{৩৫৫}

পাঁচ. মাওলানা মাহবুব আহমদ সাহেব অমৃতসারী লিখেন, “আমার জানা মতে অমৃতসর ও আশ-পাশ এলাকায় যারা নতুন মুরতাদ ও খৃষ্টান হয়েছে, তারা প্রথমে গায়রে মুকাল্লিদ ছিল।”^{৩৫৬}

প্রশ্ন :- নির্দিষ্ট মাযহাব না মানলে ক্ষতি কী?

উত্তর :- নির্দিষ্ট মাযহাব না মানার দরুন বহুমুখী ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, নফসানিয়াত তথা প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এমনকি এক পর্যায়ে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

যেমন ইমাম আওয়ামী রহ. (মৃ. ১৫৭ হি.) বলেন,

من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام.

“যে ব্যক্তি ওলামায়ে কেরামের বিচ্ছিন্ন ও বিরল বক্তব্যগুলো গ্রহণ করবে, সে ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।”^{৩৫৭}

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনে আব্দুল বার রহ. হযরত সুলাইমান আত-তাইমী রহ এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.

“যদি তুমি প্রত্যেক আলেমের সহজ মাসআলাগুলো গ্রহণ করো, তবে তোমার মাঝে সব ধরনের নিকৃষ্টতা ও অকল্যাণের সমাবেশ ঘটবে।”^{৩৫৮}

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) ‘আল-মুসাওয়াদা’ গ্রন্থে লিখেন,

^{৩৫৪} ইযহারুল কুফরি সানাউল্লাহ বিজামী উসুলি আমানতু বিল্লাহ, খায়া আব্দুল ওয়াহিদ, পৃ. ২৬২।

^{৩৫৫} ইশাআতুস সুন্নাহ, ২১/১১৪।

^{৩৫৬} আল-কিতাবুল মাজীদ পৃ. ৮-সূত্রে তাজাদ্দিয়াতে সাফদর ১/২১৩।

^{৩৫৭} সুনানে কুবরা, বায়হাকী রহ. ১০/২১১, শামেলা- ২০৯১৮।

^{৩৫৮} জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফায়লিহি ২/৯০-৯১।

“আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তাঁর পিতা আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি,

لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع وبقول أهل الكوفة في النبذ وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقا.

“কেউ যদি প্রত্যেক রুখসতের (বিশেষ সুবিধা) উপর আমল করে, যেমন: গান-বাদ্যের ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর বক্তব্য, নাবীয পান করার ক্ষেত্রে কুফাবাসীর বক্তব্য এবং নিকাহে মুতা’র (অস্থায়ী বিবাহ) ব্যাপারে মক্কাবাসীর বক্তব্যের উপর আমল করে, তবে সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে।”^{৩৫৯}

সর্বশেষ আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. ‘যুয়ুলু তাযকিরাতিল হুফফাজ’ গ্রন্থের টীকায় আল্লামা ইবনে আবী আবলাহ রহ. এর বক্তব্যটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

من تبع شواذ العلماء ضل.

“যে ব্যক্তি ওলামায়ে কেরামের বিরল বক্তব্যের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।”^{৩৬০}

এছাড়া যাহেদ কাউসারী রহ. এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র ছোট্ট একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যার নাম হচ্ছে, اللامذهبية قنطرة اللادينية এটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা মনিরুল ইসলাম ‘মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ নামে। পুস্তিকাটির শেষাংশ নিম্নে তুলে ধরছি।

যাহেদ কাউসারী রহ. বলেন,

“শেষ কথা হলো, যারা এরূপ মাযহাব না মানার জঘন্য দাবি তুলছে, তাদের (দরসে) ক্লাসে যদি তুমি উপস্থিত হও, তাহলে দেখতে পাবে অতি পরিচিত বিষয়গুলোও তাদের কাছে পরিচিত নয় এবং অতি প্রসিদ্ধ বিষয়গুলো তাদের কাছে অন্ধকার। মূলত প্রবৃত্তির উচ্চাভিলাষী চাহিদা তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি তাদের দেখবে প্রাচ্যের অসহায়দের উপর ষড়যন্ত্রকারী ও নির্যাতনকারীদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখছে। অতএব তাদের এ হাঁক-ডাক (মাযহাব

^{৩৫৯} আল-মুসাওয়াদা পৃ. ৫১৮।

^{৩৬০} যুয়ুলু তাযকিরাতিল হুফফাজ গ্রন্থের টীকা পৃ. ১৮৭।

ত্যাগের আহবান) কুফরীর হাঁক-ডাক ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং এর সূত্রপাত করেছে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা।

জ্ঞানীদের উচিত সমাজে এই ভয়াবহ ফিতনার পরিচয় তুলে ধরা এবং এর খারাপী প্রতিহত করতে স্বেচ্ছা হওয়া। কারণ এই নিকৃষ্ট ফিতনার শেষফল ধর্মত্যাগ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বিশেষ করে এই ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছে ঐ সকল দেশ, যেখানে ধর্মহীনতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

পাঠক! এই ফিতনার কঠিন পরিণতির কথা লক্ষ করে সামান্য কিছু লিখলাম। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, ‘মুমিন একই গর্ত দু’বার দংশিত হয় না।’ আর জ্ঞানী তো সেই, যে অপরকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। আল্লাহই চির সত্য বলেন, তিনিই সঠিক পথ দেখান।”

উল্লিখিত বক্তব্যগুলো দ্বারা এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, তাকলীদ ও নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মানা আবশ্যিক; অন্যথায় গোমরাহী বা ইসলাম ত্যাগের আশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ পাক সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন!

শফীকুল ইসলাম বিন রুহুল আমীন

ইমামগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁদের তাকলীদ করা

প্রশ্ন :- ইমামগণ তো তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, এরপরও আপনারা তাঁদের তাকলীদ করেন কেন?

উত্তর :- ইমামগণ এমন কথা বলেননি, বরং তারা বলেছেন, আমার কথার দলিল জানা ছাড়া তা গ্রহণ করিও না। অথবা আমাদের কোনো রায় হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে, তা দেয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে হাদীসকে আঁকড়ে ধরবে। তবে হ্যাঁ, ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন,

لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من

حيث أخذوا.

“আমার তাকলীদ কর না। এবং মালেক, শাফেয়ী রহ.-সহ কোনো ইমামের তাকলীদ কর না।” কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. এতটুকু বলে শেষ করে দেননি। বরং সাথে বলে দিয়েছেন, وخذ من حيث أخذوا.

“তুমি গ্রহণ কর, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন”।^{৩৬১}

অর্থাৎ উপরোক্ত ইমামগণ যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম গ্রহণ করেছেন, তুমিও তা থেকে গ্রহণ কর।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে ইনসাফ ও বাস্তবতার বিচার এটা যে, মুজতাহিদগণের এ জাতীয় উক্তি তাদের জন্য নয়, যারা ইজতিহাদের নূন্যতম যোগ্যতাও রাখে না। কেননা ইমামগণ যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম গ্রহণ করেছেন, সেভাবে ইজতিহাদের নূন্যতম যোগ্যতা নেই- এমন ব্যক্তির পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং ইজতিহাদ ও বিচার বিশ্লেষণের যোগ্য ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেই মুজতাহিদগণ এ জাতীয় কথা বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন,

إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة، وفيمن ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، ونهى عن كذا، وأنه ليس

^{৩৬১} ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ইবনুল কায়্যিম।

بمنسوخ إما بأن يتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة، فلا يجد لها نسخاً، أو بأن يرى جمعا غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، ويرى المخالف له لا يحتاج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك، فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي، أو حق جلي.

“এ ধরনের উক্তি শুধু তাদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা অন্তত একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হলেও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী। রাসূলের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত যে, রাসূলের অমুক আদেশ বা নিষেধ রহিত হয়ে যায়নি। আর এ অবগতি তাঁরা অর্জন করেছেন সংশ্লিষ্ট হাদীস ও পক্ষ-বিপক্ষে যাবতীয় বক্তব্য বিচার পর্যালোচনা করে কিংবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমকে উক্ত হাদীস মোতাবেক আমল করতে দেখে।

অন্যদিকে হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইমামের কাছে কিয়াস বা এ জাতীয় দলিল ছাড়া অন্য কোনো দলিল নেই। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস তরক করার অর্থ গুপ্ত কপটতা কিংবা নিরেট মূর্খতা।”^{৩৬২}

আসলে বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে, তা যুক্তি প্রমাণের কোনো অপেক্ষা রাখে না। কেননা মুজতাহিদগণের মতে তাকলীদ অবৈধ হলে মানুষকে তারা হাজার হাজার ফতোয়া, (জিজ্ঞাসার জবাব) দিয়ে গেছেন কোন্ যুক্তিতে? আরো মজার ব্যাপার এই যে, প্রায় সকল মুজতাহিদই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাধারণ লোকের জন্য তাকলীদের অপরিহার্যতার কথা ঘোষণা করেছেন।

‘হেদায়া’র ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘কেফায়া’তে এসেছে,

وفي "الكفاية" شرح الهداية من كتاب الصوم ٥٩٨/١ (المطبوع مع الهداية كليلة من المطبع الطبي سنة ١١٤٩ هـ): وإذا كان المفتي على هذه الصفة فعلى العامي تقليده، وإن كان المفتي أخطأ في ذلك، ولا معتبر بغيره، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وابن رستم عن محمد، وبشير بن الوليد عن أبي يوسف.

“ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন মুফতি সাহেব সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করলেও সাধারণ লোকের জন্য তার তাকলীদ করা অপরিহার্য। এর

কোনো বিকল্প নেই। ইমাম হাসান, ইবনে রোস্তম ও বশির বিন অলীদ যথাক্রমে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এরূপ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।”

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মন্তব্য হলো,

عَلَى الْعَامِّيِّ الْاِقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ، لِعَدَمِ الْاِهْتِدَاءِ فِي حَقِّهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ.

“হাদীস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে সাধারণ লোকের কর্তব্য হলো, ফকীহগণের তাকলীদ করে যাওয়া।”^{৩৬৩}

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন,

وَيَأْمُرُ الْعَامِي بِأَنْ يَسْتَفِي إِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا ثَوْرٍ وَأَبَا مَصْعَبٍ، وَيَنْهَى الْعُلَمَاءَ مِنْ أَصْحَابِهِ، كَأَبِي دَاوُدَ، وَعَثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرَبِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْأَثَرَمَ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمِ السَّجِسْتَانِيِّ، وَمُسْلِمَ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ أَنْ لَا يَقْلُدُوا أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيَقُولَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَصْلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

“(ইমাম আহমদ রহ.) সাধারণ লোকদেরকে ইসহাক, আবু উবাইদ, আবু সাওর ও আবু মুসআব প্রমুখ ইমামের তাকলীদ করার নির্দেশ দিতেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু দাউদ, ওসমান বিন সাঈদ, ইবরাহীম আল-হারবী, আবু বকর আল-আসরম, আবু যুর’আ, আবু হাতেম সিজিস্তানী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্রদেরকে কারও তাকলীদের ব্যাপারে নিষেধ করে বলতেন, তোমাদের জন্য শরিয়তের মূল উৎস তথা কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব।”^{৩৬৪}

এ বর্ণনা পরিষ্কার প্রমাণ করছে যে, তাকলীদের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের নিষেধবাণী ছিল তাদের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের প্রতি। কেননা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকই ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, একেকজন ইমাম। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের কঠোর নির্দেশ ছিল, ‘নির্ভেজাল তাকলীদের’।

অবশ্য ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তির জন্য অপর মুজতাহিদের তাকলীদ করার অবকাশ আছে কিনা- সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

^{৩৬৩} হেদায়া খ. ১, পৃ. ২২৩।

^{৩৬৪} ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২/২৪।

খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর মতে এর অবকাশ আছে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার ভাষ্য মতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. সুফিয়ানের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে তা বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফার মতে একজন মুজতাহিদ অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের মুজতাহিদের তাকলীদ করতে পারেন। উসূলে ফিকহের অধিকাংশ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মোটকথা, মুজতাহিদ কর্তৃক মুজতাহিদের তাকলীদ সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও মুজতাহিদ ইমামগণ সাধারণ ব্যক্তির তাকলীদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে জোরালো ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আর তাকলীদের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের নিষেধবাণী ও উক্তি শুধু তাদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা অন্তত একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হলেও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী।

আব্দুল বারী

কুরআনে কারীমে কিয়াস করতে নিষেধ করা হয়েছে এরপরও কিয়াস শরীয়তের দলিল হয় কীভাবে?

প্রশ্ন :- পবিত্র কুরআনের সূরা নাজম ২৮ ও সূরা ইউনুস ৩৬ নং আয়াতে ধারণা ও অনুমান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর কিয়াস যে ধারণা মাত্র তা সর্বস্বীকৃত। তাহলে কিয়াস শরীয়তের দলিল হয় কীভাবে?

উত্তর :- সর্বপ্রথম আমরা উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ দেখি।

সূরা নাজম ২৮ নং আয়াত:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“কাফেররা কেবল ধারণার পিছনে চলে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের ব্যাপারে ধারণা কিছুমাত্র কাজে আসে না।”

সূরা ইউনুস ৩৬ নং আয়াত:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“এবং (প্রকৃতপক্ষে) তাদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) মধ্যে অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে থাকে, আর এটা তো নিশ্চিত যে, সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনও কাজে আসে না।”

এবার উত্তর লক্ষ করি,

প্রথমত: উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে উদ্দেশ্য হলো, দলিলবিহীন অনুমান ও ধারণা। যেমন সূরা জাছিয়াহর ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَكَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

“কাফেররা বলে, জীবন বলতে যা কিছু তা ব্যস আমাদের এই পার্থিব জীবনই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি, আর আমাদেরকে কেবল কালই ধ্বংস করে, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনোই জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণাই করে।”

আর মুজতাহিদগণ যে কিয়াস করেন, তা দলিলবিহীন ধারণা নয়। বরং দলিলভিত্তিক হয়ে থাকে, যা আহলে ইলমের কাছে অজানা নয়।

দ্বিতীয়ত: অধিকাংশ হাদীস হলো, ‘খবরে ওয়াহেদ’, আর ‘খবরে ওয়াহেদ’ সাধারণত ধারণার ফায়দা দিয়ে থাকে। আবার কিছু হাদীস আছে ‘খবরে মুতাওয়াতির’, কিন্তু তাতে একাধিক অর্থের সুযোগ থাকায় তার থেকে একটি অর্থকে নির্ধারণ করা এবং এটাকে অন্যগুলি থেকে প্রাধান্য দেওয়া- এটাও তো ধারণাভিত্তিক হয়ে থাকে। তখন একথা বলা আবশ্যিক হয়ে যাবে যে, (নাউয়িব্লাহ) হাদীসের উপর আমল করাও জায়েয নাই। কেননা হাদীসের প্রমাণ ও অর্থকে নির্ধারণ সবই ধারণাভিত্তিক। তাহলে বুঝা গেল, আয়াতদ্বয় থেকে উদ্দেশ্য হলো, দলিলবিহীন ধারণা। আর মুজতাহিদগণ যে কিয়াস করেন এবং ‘খবরে ওয়াহেদ’ ইত্যাদি হচ্ছে, দলিলভিত্তিক ধারণা। কাজেই দুটোর মধ্যে আসমান-জমীন তফাৎ রয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কিয়াস শরীয়তের দলিল হতে কোনো সমস্যা নেই।^{৩৬৫}

প্রশ্ন :- কিয়াসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন হাদীস উল্লেখ করুন।

উত্তর :- কিয়াসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন দুটি হাদীস :-

প্রথম হাদীস:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَيَا، ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لَصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدَّ الْآخَرُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدَّ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأُكَ صَلَاتُكَ». وَقَالَ لِلْآخَرِ: «أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ».

“হযরত আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, দুজন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। এরপর ওয়াক্তের ভিতর পানি পাওয়ায় একজন অযু করে দ্বিতীয়বার সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করল, কিন্তু অন্যজন দ্বিতীয়বার নামায আদায় করল না। অতঃপর উভয়জনই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার নামায আদায় করেনি, তাকে বললেন, ‘তুমি সূনাত অনুযায়ী আমল করেছ, এবং এই নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে’। আর অন্য জনকে বললেন, ‘তুমি দ্বিগুণ সাওয়াব পেয়েছ’।”^{৩৬৬}

ফায়দা: উভয় সাহাবী কিয়াসের উপর আমল করেছেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই তিরস্কার করেননি। আর

^{৩৬৫} আল-ইকতিসাদ, পৃ. ৫৫।

^{৩৬৬} সুনানে নাসাঈ, হা. ৪৩৩।

একজনের কিয়াস সূন্নাহসম্মত হয়েছে, অপরজনের কিয়াস ভুল হয়েছে। এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মুজতাহিদ কখনো সঠিক করে, আবার কখনো ভুল করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই একথা বলেননি যে, তুমি কেন কিয়াসের উপর আমল করলে? সুতরাং কিয়াস যে জায়েয তা পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেলাম ‘নস’ না পেলে ইজতিহাদ ও কিয়াস করতেন।^{৩৬৭}

দ্বিতীয় হাদীস:

“হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, এক শীতের রাতে গাযুওয়ায়ে যাতুস্‌সালাসিলের সফরে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আর আমার আশঙ্কা হলো যে, যদি গোসল করি, তাহলে বড় ধরণের ক্ষতি হতে পারে। অতএব আমি তায়াম্মুম করে সাথীদেরকে নিয়ে নামায আদায় করে নিলাম। তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এই ঘটনা আলোচনা করলে তিনি আমাকে বললেন, হে আমর! তুমি কি নাপাকী নিয়েই লোকদেরকে নামায পড়িয়েছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ কী তা খুলে বললাম এবং সাথে সাথে এ কথাও বললাম যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান।’ একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং কিছুই বললেন না।”^{৩৬৮}

ফায়দা: এই হাদীসও পরিষ্কারভাবে ইজতিহাদ ও কিয়াস জায়েয হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

প্রশ্ন :- সর্বপ্রথম কে কিয়াস অস্বীকার করেন? এবং পরে তার সাথে আর কে কে যুক্ত হন?

উত্তর :- সর্ব প্রথম যিনি কিয়াস অস্বীকার করেন, তিনি হলেন ইবরাহীম নায্‌যাম মু’তাহিলী (মৃত্যু ২৩১ হি.)। তাকে অনুসরণ করে বাগদাদের একদল ধর্মতত্ত্ববিদ কিয়াসকে অস্বীকার করেন। এরপর উক্ত তালিকায় যুক্ত হন দাউদ ইবনে আলী যাহেরী (মৃত ২৭০ হি.)। পরবর্তীতে এ চিন্তাকে আরো প্রচার-প্রসার করেন ইবনে হায্ম যাহেরী (মৃত ৪৫৬ হি.)।

ইলিয়াস শহীদ

তাকলীদ কি কুরআন-বিরোধী?

প্রশ্ন :- পবিত্র কুরআনে তাকলীদ সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“এবং যখন কাফেরদের বলা হয়, অনুসরণ কর ঐ সকল বিধানের যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব ঐ পদ্ধতির যার উপর পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদের। তারা কি তাদের বাপ-দাদার অনুসরণ করবে, যারা কিছুই বুঝে না এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্তও নয়।”^{৩৬৯}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।”^{৩৭০}

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে বুজুর্গদের তরীকা অনুযায়ী আমল করা নিন্দনীয়। এবং মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েলের ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে সমাধান বের করা চাই, কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের কথা থেকে নয়।

উত্তর :- প্রথম আয়াতের অনুবাদ দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে, সেখানে কাফেরদেরকে তাদের বাপ-দাদার তাকলীদ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য তাকলীদের সাথে কাফেরদের তাকলীদের নূন্যতম সম্পর্কও নেই। কারণ তাদের বাপ-দাদাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ ছিল না এবং তারা হেদায়েতের উপরও ছিল না। অথচ আমাদের ইমামগণ (আমরা যাদের তাকলীদ করি) দ্বীনের সঠিক বুঝ রাখেন এবং তারা

^{৩৬৯} সূরা বাকারা, ১৭০।

^{৩৭০} সূরা নিসা, ৫৯।

গোমরাহও নন। বরং হেদায়েতের উপর ছিলেন, যা সর্বজনস্বীকৃত। এবং শরীয়তের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল।

তাছাড়া কাফেররা আল্লাহর বিধানকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলত, আমরা এসব মানি না, আমাদের বাপ-দাদার তরীকাই অবলম্বন করব। কিন্তু কোনো মাযহাবের কোনো মুকাল্লিদ কখনই এ কথা বলে না যে, আমরা কুরআন-হাদীস মানি না, বরং তারা বলে, আমরা কুরআন-হাদীসেরই অনুসরণ করি। তবে কুরআন ও হাদীসের বিধানাবলী সম্পর্কে আমাদের গভীর জ্ঞান নেই এবং ইজতিহাদ করার যোগ্যতাও নেই।

আর আমাদের মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখেন। তাঁদের রয়েছে ইজতিহাদের যোগ্যতা। তারা আয়াত ও হাদীসের সূক্ষ্ম মর্ম ও নিগূঢ় অর্থ বের করতে সক্ষম। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য আয়াত ও হাদীসের অর্থ বুঝতে পারেন। পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় করতে পারেন। তাই আমরা কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক আমল করার জন্য এবং কুরআন-হাদীস থেকে সঠিক সমাধান বের করার ব্যাপারে তাদের প্রতি সু-ধারণা রাখি। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের উপর আমল করি।

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে সঠিকভাবে উক্ত আয়াতের মর্ম বুঝতে পেরেছেন এবং কোনো ইমামের তাকলীদ করার হুকুমও বুঝেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতের ক্ষেত্রে আমরা বলব, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “যখন তোমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।”

উক্ত আয়াত তাকলীদের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ আমরা তো বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোনো বিজ্ঞ আলেমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করা প্রকৃতপক্ষে কুরআন-হাদীসের উপরই আমল করা।

যেমন আমাদের মাঝে কোনো আরব দেশের মেহমান বয়ান করলে আরবী ভাষায় দক্ষ কেউ আমাদের সামনে তার বয়ানের অনুবাদ করে দেয়। আর যারা আরবী ভাষা বুঝে না তারা অনুবাদকের অনুবাদের উপর নির্ভর করে মেহমানের বয়ান বুঝে নেয় এবং সে অনুযায়ী আমল করে। এখন কি কেউ এ কথা বলবে, তোমরা মেহমানকে অমান্য করে

অনুবাদককে মেনে চলছ? মেহমানের অনুসরণ না করে কেন অনুবাদকের অনুসরণ করছ? এমন প্রশ্ন কেউ করবে না।

কারণ অনুবাদকের কথা অনুযায়ী আমল করা প্রকৃতপক্ষে মেহমানেরই অনুসরণ করা। তাকলীদের বিষয়টাও ঠিক তেমন। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতের কথা বলে অভিযোগ উত্থাপনের কোনো অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য, শেষ আয়াতটি সম্পর্কে ভূমিকাতে আরো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

বিলাল হুসাইন

কুরআন-হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রশ্ন :-ফিকহের পরিচয় কী?

উত্তর:-ফিকহের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা না করে আমরা ফিকহের মাধ্যমে কী কী উপকার পাই এবং ফিকহ থেকে আমরা কীভাবে উপকৃত হই, তা তুলে ধরছি। যাতে ফিকহের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. ফিকহ বলা হয়, কুরআন ও হাদীসের বিধানাবলির সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপকে। কেননা ফিকহের মধ্যে জন্ম ও তাহারাত (পবিত্রতা) থেকে ফারায়েয (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল) পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসায়েল বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে একস্থানে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :-

আমরা যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, তার তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসআলাসমূহ যদি আপনি হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান, তাহলে হাদীসের এক-দুটি কিতাব নয়, দশ-বিশটি কিতাবেও তা পাবেন না। এভাবে নামাযের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীস যা অনেক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, আপনি যদি তা এক জায়গায় একত্রিত করেন, তারপরও এ সংক্রান্ত মাসায়েল জানার জন্য আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে:

ক. নামাযের কাজসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরী করা। কেননা কোনো হাদীসেই স্পষ্টভাবে এ পূর্ণাঙ্গ খসড়া উল্লেখ করা হয়নি।

খ. সংকলিত হাদীসসমূহের সহীহ-যঈফ নির্ণয় করা।

গ. এ সকল হাদীসের মধ্যে যেসব হাদীসের মর্ম শুধু আরবী ভাষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় না, তার সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। কেননা অনেক হাদীস এমন আছে, যেখানে ভাষার বিচারে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. কিছু হাদীস এমন আছে যার বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। কিন্তু এর দলিল সে হাদীসে উল্লেখ নেই। শরীয়তের অন্যান্য দলিলের আলোকে এ ধরনের হাদীসসমূহ শনাক্ত করতে হবে।

ঙ. সাধারণ পাঠকবৃন্দ দেখবেন, কোনো হাদীসে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করার কথা আছে আবার কোনো হাদীসে আছে, না করার কথা। কোথাও আমিন ‘জোরে’ বলার কথা এসেছে, আবার কোথাও ‘আস্তে’ বলার কথা। কোনো হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইমামের পিছনে কুরআন (সূরা ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা) পড়তে হয়, আবার কোনো হাদীস বলছে, ইমামের পিছনে কুরআন পড়তে হয় না। এ ধরনের অনেক বিষয় আছে।

এখন এসব বিষয়ে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এবং কোন হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে না- এর ফায়সালা শুধু হাদীসের বাংলা অনুবাদ পড়ে করা সম্ভব নয়।

চ. উপরোক্ত হাদীসসমূহে নামাযের যেসব আমলের কথা জানা গেলো, তার মধ্যে কোন্টি ফরয, কোন্টি ওয়াজিব, কোন্টি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আবার কোন্টি সুন্নাতে যাবেদাহ বা মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণও হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই। এবার চিন্তা করে দেখুন, ফুকাহায়ে কেরাম কত কঠিন কাজ সহজ করে দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের কত বড় উপকার করে গেছেন!

২. অনুরূপ ফিকহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, ঐ সব মাসআলার সুবিন্যস্ত সমষ্টি, যা কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই। শরীয়তের নীতিমালা থেকে বা কিয়াসে শরয়ীর মাধ্যমে শরীয়তের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে আহরিত ঐ সব মাসআলাকেও ফিকহের মধ্যে উপযুক্ত বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ফিকহের পরিচয় ও উপকারিতা জানার পর এ প্রশ্নটির উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ‘কুরআন-হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কী?’ কেননা ফিকহ কুরআন-হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়, বরং কুরআন-হাদীসেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বস্তুদ্বয়ের হুকুম-আহকামেরই সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ। তাই কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য এবং সহজভাবে সঠিক পন্থায় এর অনুসরণের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন।

আর এ জন্যই ফিকহবিমুখ ব্যক্তির কোনো হাদীসের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে না। হাদীসের অনুসারী তারাই, যারা ফকীহগণের নির্দেশনাক্রমে এবং ফিকহের আলোকে হাদীসের অনুসরণ করেন। হাদীস

অনুসরণের এ পদ্ধতিই খাইরুল কুরান (সাহাবা-তাবেঈনের যুগ) থেকে চলে আসছে এবং ইসলামের সকল যুগেই মুসলিম জাতি এ পদ্ধতিতেই হাদীসের অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। তাই এটিই হলো কুরআন-হাদীস অনুসরণের সুন্নাহ নির্দেশিত পথ ও পন্থা।

প্রশ্ন :- এরপরও কেউ যদি বলে, কুরআন-সুন্নাহ থাকতে ফিকহ কেন?

উত্তর :- বাস্তবতা হলো, ফিকহ কুরআন-হাদীস বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। তাই তা মানা কুরআন-সুন্নাহর মতই আবশ্যিক। যার যৌক্তিকতা নিম্নে পেশ করা হলো:-

মূলত- কুরআন-সুন্নাহ নিঃসৃত বিধি-বিধান সংক্রান্ত সঠিক বুঝকে ফিকহ বলে। ফিকহ-ই একক মাধ্যম কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক আমল করার। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস, সাহাবা রা. এর আমল ও সাল্লাফের কর্ম পদ্ধতি এ কথার প্রমাণ বহন করে। তাই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে হলে ফিকহ অপরিহার্য।

কারণ দিনে-দিনে সময়ের পরিবর্তন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদায় ও দৈনন্দিন জীবন চালনায় পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। উদ্ভব হচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা। নব উদ্ভাবিত এসব সমস্যার সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও মুজতাহিদ ফকীহগণের রেখে যাওয়া মৌলিক নীতিমালার আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাও শরীয়তের হুকুম বলে বিবেচিত। যার অপর নাম ‘ফিকহ’।

এ ব্যাপারে আব্দুল কারীম শাহরাস্তানী রহ. (মৃ. ৫৪৮ হি.) বলেন,

وبالجملة: نعلم قطعاً وبقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات: مما لا يقبل الحصر والعد؛ ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضاً؛ والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية؛ وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار؛ حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد.

“মোট কথা আমরা নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে এটা জানি যে, ইবাদত ও জীবনোপায়ের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা ঘটবেই, যার কোনো শেষ নেই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে এটাও জানি যে, প্রতিটি নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য সুস্পষ্ট নস নেই। আর এটা কল্পনাভীতও বটে। অতএব

নস যখন সীমিত আর সমস্যা অসীম, তাহলে যা অসীম তাকে সীমিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কাজেই বুঝা গেল, ইজতিহাদ ও কিয়াস আবশ্যিক একটি বিষয়। সুতরাং ইজতিহাদ প্রতিটি নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।”

প্রশ্ন :- কুরআন, হাদীস, সাহাবা, তাবেরী ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যের আলোকে ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর :-

ফিকহ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য:

মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

“কেন এমন হয় না যে, মুসলিমদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ বের হবে, যাতে তারা দ্বীনের ফিকহ অর্জনের চেষ্টা করে। এবং যখন তাদের কওমের লোক (জিহাদ থেকে) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করবে, ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।”^{৩৭১}

আমাদের যে সকল ভাই ফিকহের প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, এমনকি ফিকহ শব্দটি শুনতেও নারায়, তারা কি দেখেন না যে কুরআনুল কারীমে ফিকহ (ব্যাপক অর্থে) অর্জন করার আদেশ করা হয়েছে।

ফিকহ সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য:

হযরত মুআবিয়া রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইরশাদ নকল করেছেন,

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

“আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা ও ফিকহ (ব্যাপক অর্থে) দান করেন।”^{৩৭২}

^{৩৭১} সূরা তাওবা ১২২।

^{৩৭২} বুখারী ও মুসলিম।

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসে ‘ফিকহ’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে এসেছে। যাতে আকীদা, আখলাক ও আমল সহ সবই শামিল, ভূমিকার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে আম ও ব্যাপকের মধ্যে যেহেতু তার প্রকার শামিল থাকে, সে হিসেবে উক্ত ইসতিদলাল করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَقِيَّةٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

“(একজন) ফকীহ শয়তানের উপর এক হাজার (ইলমবিহীন) ইবাদতগুয়ার অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী।”^{৩৭৩}

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফিকহের গুরুত্ব:

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিকহের যে গুরুত্ব প্রদান করে গিয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতা খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাগণের মধ্যে স্বগতিতে প্রবাহমান ছিল। যেমন:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. একটি আয়াতের তাফসীরে বলেন,
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: ৭৭]: «كُونُوا عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ».

“তোমরা ওলামা ও ফকীহ হয়ে যাও।”^{৩৭৪}

হযরত ওমর রা. বলেন,

لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

“যে ব্যক্তির দ্বীনি বিষয়ে ফিকহ অর্জন হয়নি, সে যেন আমাদের বাজারে ক্রয় বিক্রয় না করে।”^{৩৭৫}

তাবেঈদের দৃষ্টিতে ফিকহ:

হযরত আমর ইবনে মাইমুন আল-আওদী রহ. বলেন,

قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنِيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ، قَالَ: فَأُلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقِهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ.

“হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধি হয়ে আমাদের দেশ ইয়ামানে আসলেন। ফজর নামাযে আমি তাঁর তাকবীর শুনলাম। তাঁর আওয়াজ ছিল বেশ উঁচু। অতঃপর আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। এ জন্য সিরিয়াতে তাঁর মৃত্যুবরণের পর সমাধিস্থ করা পর্যন্ত আমি তাঁর সংস্পর্শে থাকি। এরপর

^{৩৭৩} তিরমিযী, হা. ২৬৮১।

^{৩৭৪} শরহুস সুন্নাহ, বগভী ১/২৮৩।

^{৩৭৫} শরহুস সুন্নাহ, বগভী ৮/১৭।

আমি মানুষদের (সাহাবীদের) মধ্যে বড় ফকীহের সন্ধান করতে থাকি। পরে তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে আমি বড় ফকীহ হিসাবে পাই। এজন্য তাঁর সোহবতে আমি তাঁর ইত্তিকাল পর্যন্ত থাকি।”

মুহাদিসগণের দৃষ্টিতে ফিকহের গুরুত্ব:

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন,

لَوْ أَنَّ فَقِيهًا عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَكَانَ هُوَ الْجَمَاعَةَ.

“যদি কোনো পাহাড়ে একজন ফকীহ অবস্থান করেন, তাহলে তিনি একাই এক জামাআতের সমকক্ষ।”^{৩৭৬}

খতীব বাগদাদী রহ. ‘আল-কিফায়া’ এর শেষাংশে একটি হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

وَيُرْجَحُ بَأَنَّ يَكُونَ رِوَايَتُهُ فَقِيهًا؛ لِأَنَّ عِنَايَةَ الْفَقِيهِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ أَشَدُّ مِنْ عِنَايَةِ غَيْرِهِ بِذَلِكَ.

“হাদীসের বর্ণনাকারী যদি ফকীহ হয়, তাহলে সে হাদীস প্রাধান্য পাবে। কেননা একজন ফকীহ হাদীসে বর্ণিত বিধি-বিধানের প্রতি অন্যদের তুলনায় বেশি সতর্ক থাকেন।”

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ওকী’ ইবনুল জাররাহ রহ. একদা তাঁর ছাত্রদেরকে বলেন,

الْأَعْمَشُ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْنَا: الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَقْرَبُ فَقَالَ: الْأَعْمَشُ شَيْخٌ وَأَبُو وَائِلٍ شَيْخٌ، وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقِيهٌ عَنْ فَقِيهِ عَنْ فَقِيهِ.

“তোমাদের নিকট দু’টি সনদের কোন্টি অধিক উত্তম?

১. আ’মাশ আবু ওয়াইল থেকে এবং সে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে।

২. সুফিয়ান সাউরি মানসুর থেকে, তিনি ইবরাহিম থেকে, তিনি আলকমা থেকে এবং তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে?

তারা উত্তর দিলো, যে সনদে আ'মাশ আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করে সেটি উত্তম। কেননা এতে রাসূল পর্যন্ত মধ্যস্তাকারী রাবীর সংখ্যা কম।

ইমাম ওকী' বললেন, আ'মাশ হলো মুহাদ্দিস। আবু ওয়াইলও মুহাদ্দিস। কিন্তু দ্বিতীয় সনদে সুফিয়ান ছাওরী ফকীহ, হযরত মানসুর ফকীহ, হযরত ইবরাহিম ফকীহ, হযরত আলকমাও ফকীহ।”

অর্থাৎ একজন ফকীহ থেকে অপর তিনজন ফকিহের পরম্পরায় সনদটি বর্ণিত হয়েছে। (সুতরাং এটি উত্তম হবে।) ^{৩৭৭}

ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ রহ. আরো বলেন,

كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة.

“মুহাদ্দিসগণের কাছে ফকীহদের বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসদের হাদীসের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।” ^{৩৭৮}

খতীব বাগদাদী রহ. ‘আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ’ কিতাবে লিখেছেন,

وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيهاً، وإنما

يفقهه باستنباط معانيه، وإنعام التفكير فيه.

“জেনে রেখো, বেশি করে হাদীস লিখা বা জমা করা এবং অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা দ্বারা কেউ ফকীহ হয়ে যায় না। বরং হাদীসের অর্থ আহরণ এবং তা নিয়ে গভীর গবেষণা দ্বারাই ফকীহ হওয়া যায়।” ^{৩৭৯}

অতঃপর তিনি ইমাম মালেক থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন, তিনি তার দুই ভাগ্নে আবু বকর ইবনে আবী উয়াইস এবং ইসমাইল ইবনে আবী উয়াইসকে ওসিয়ত করেছেন। তিনি তাদেরকে বললেন,

«أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟» قالا: نعم، قال: «إن أحببتما أن تتفعا به

وينفع الله بكما، فأقلا منه وتفقها».

“তোমাদের দু’জনকে দেখছি, তোমরা হাদীস সংকলন, তা শ্রবণ এবং অন্বেষণ অধিক পছন্দ করো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা যদি পছন্দ করো যে, তোমরা তা থেকে উপকৃত হবে এবং আল্লাহ তাআলা

^{৩৭৭} আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল, পৃ.২৩৮।

^{৩৭৮} আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, ২/২৫।

^{৩৭৯} আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৫৮-১৫৯।

তোমাদের দ্বারা অন্যের উপকার করবেন, তবে কম হাদীস বর্ণনা করো এবং হাদীসের বুঝ তথা ফিকহ বেশি অর্জন করো।”^{৩৮০}

ইমাম রামাহুরমুযি রহ. ‘আল-মুহাদিসুল ফাসিল’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

“জনৈক মহিলা মুহাদিসগণের একটি মজলিসে উপস্থিত হলো। যেখানে (ইমামুল মুহাদিসীন) ইয়াহয়া ইবনে মাসীন রহ, আবু খাইসামা ও খালাফ ইবনে সালাম রহ.-সহ একদল মুহাদিস হাদীস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করছিলেন। মহিলাটি তাদের এই আলোচনা শুনলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এটি অমুকে বর্ণনা করেছে, অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এটা বর্ণনা করেনি ইত্যাদি।

মহিলাটি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, হায়েযা (মাসিকাবস্থায়) মহিলা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারবে কি না? মহিলাটি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতো। মজলিসের কেউ মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। তাদের একজন অপরজনের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে (ফকীহ) আবু সাওর রহ. আগমন করলেন। মহিলাকে বলা হলো, আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করুন।

মহিলাটি (ফকীহ) আবু সাওর রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। হায়েযা মহিলা মৃত ব্যক্তির গোসল দিতে পারবে। কেননা এ ব্যাপারে ওসমান বিন আহনাফ কাসেম থেকে, তিনি হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নেই’। আরেকটি দলিল হলো, হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, ‘আমি হায়েয অবস্থায় পানি দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা ধৌত করতাম’।

সুতরাং তিনি যখন পানি দ্বারা জীবিত মানুষের মাথা ধৌত করেছেন, তাহলে মৃত ব্যক্তির গোসল প্রদান নিঃসন্দেহে বৈধ।

উত্তর শুনে মুহাদিসগণ বললেন, হ্যাঁ। হাদীসটি অমুকে অমুকে বর্ণনা করেছেন। আমরা এই এই সনদে হাদীসটি পেয়েছি। তাঁরা হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও বর্ণনার মাঝে ভুলে গেলেন। তখন মহিলা তাদেরকে বললো, এতক্ষণ আপনারা কোথায় ছিলেন?!”^{৩৮১}

^{৩৮০} আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৫৮-১৫৯; আল-মুহাদিসুল ফাসিল, পৃ. ২৪২, ৫৫৯।

^{৩৮১} আল-মুহাদিসুল ফাসিল, পৃ. ২৪৯; আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৮৮।

আবুয যিনাদ রহ. থেকে ইবনে আব্দুল বার রহ. নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন,

وأيما الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة، ونتعلمها شيئا بتعلمنا

أي القرآن.

“আল্লাহর শপথ! আমরা ফকীহ ও সিকাহ রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করতাম এবং সেগুলো পবিত্র কুরআনের আয়াতের মতো শিখতাম।”^{৩৮২}

ইমাম তিরমিযী রহ. ‘সুনানে তিরমিযী’তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা যয়নব রা. এর গোসলের বর্ণনা সম্বলিত উম্মে আতিয়া রা. এর হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করে শেষে লিখেছেন,

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ.

অর্থাৎ “ফুকাহায়ে কেলাম এমনটি বলেছেন, আর তাঁরা হাদীসের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।”

ইবনে উয়াইনা রহ. বলেছেন, “ফকীহগণ ছাড়া অন্যদের জন্য হাদীস হলো ভ্রান্তির কারণ।”

ইমাম ইবনে আবী যাইদ কাইরওয়ানী রহ. বলেন, “উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো, অন্যরা হয়তো হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করবে। অথচ অন্য কোনো হাদীস দ্বারা এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব বা অন্যদের নিকট হাদীসের দলিল অস্পষ্ট থাকতে পারে অথবা সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কারণ থাকায় হাদীসটা আমলযোগ্য নয়। এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের আলেম ও ফকীহ ছাড়া অন্যরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।”^{৩৮৩}

প্রশ্ন :- কোনো ব্যক্তি যদি সরাসরি হাদীসের উপর আমল করে ও হাদীস থেকে সরাসরি মানুষদের ফতোয়া দেওয়া শুরু করে, তাহলে তাকে গোমরাহ বলা যাবে কি?

উত্তর :- শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা (দা.বা.) তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ ‘আসারুল হাদীসিশ শরীফ’ এর ভেতর এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

হ্যাঁ, তাকে গোমরাহ বলা হবে, যদি সে এরূপ কাজের উপযুক্ত না হয়। অর্থাৎ সে হাদীসের উপর আমল করছে এ কারণে তাকে গোমরাহ বলা

^{৩৮২} জামিউ বয়ানিল ইলম, ২/৯৪৯।

^{৩৮৩} আল-জামে’, পৃ. ১১৮- সূত্রে আসারুল হাদীস পৃ. ৬৩।

হচ্ছে না; বরং তাকে গোমরাহ বলা হচ্ছে এ কারণে যে, সে এ কাজের উপযুক্ত না হয়ে এ কাজে অংশিদারিত্ব খাটাতে চাচ্ছে।

লা-মাযহাবীদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তার অপনোদন:

কিছু কিছু গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী ও আহলে হাদীস শায়খ আলবানী সাহেবের ভক্তরা কোনো রকম পড়াশোনা ব্যতীত বা শুধু ধারণা করে অথবা অন্য কারও কাছ থেকে শুনে এ কথা বলেন যে, অমুক ইমাম হাদীসের খেলাফ করেছেন, তিনি হাদীস জানতেন না বা অমুক হাদীস তাঁর কাছে পৌঁছেনি ইত্যাদি।

অথচ তারা যদি একটু কষ্ট করে উক্ত ইমামের বা তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের অথবা তাঁর মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো খুলে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, উক্ত ইমাম হাদীসের খেলাফ করেননি। বরং তিনি কোনো হাদীস গ্রহণ না করার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। হয়তো হাদীসটির অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে বা হাদীসটি মানসূখ কিংবা উক্ত হাদীস থেকে শক্তিশালী কোনো দলিল ইমামের নিকট বিদ্যমান ছিল। যার কারণে তিনি উক্ত হাদীস গ্রহণ করেননি। এ ছাড়া আরো কারণ থাকতে পারে। তাহলে কীভাবে একথা বলা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় হয় যে, উক্ত ইমাম হাদীস বা নসের বিরোধিতা করেছেন?

ফিকহশূন্য মুহাদ্দিসের পরিণতি:

সাধারণ ব্যক্তি তো দূরের কথা, হাদীস বর্ণনাকারীদের অনেকে এমন রয়েছেন, যাদের মাঝে ফিকহের নেয়ামত না থাকায় তাঁরা কোনো কোনো হাদীসের এমন অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা শুধু হাস্যকরই নয়, বরং অনেকটা আশ্চর্যেরও বটে।

কেউ তো ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে অযু না করেই বিতরের নামায পড়ছেন! আর এ আমলের দলিল প্রদান করেছেন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা,

من استجمر فليوتر

অথচ হাদীসটির মর্ম হলো, যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জাতে ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেনো বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।

এখানে فليوتر অর্থ বিতরের নামায পড়া নয়। বরং বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা।

কেউ আবার في عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.

হাদীস থেকে বুঝেছেন, জুমার পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। তাই চল্লিশ বছর জুমার নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেননি। এ আমলের দলিল প্রদান করেছেন পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা।

অথচ এখানে الحلق শব্দটি حلقة এর বহুবচন। অর্থাৎ ‘হা’র নিচে যের ও লামের ওপর যবর হবে। আর হাদীসের মর্ম হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন জুমার নামাযের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। মাথা মুণ্ডন করার সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই।

আবার কেউ **فهي أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره.**

হাদীস থেকে বুঝেছেন অন্যের বাগানে পানি সিঞ্চন করা নিষেধ। অথচ হাদীসের মর্ম হলো হলো, ক্রয়কৃত বা জিহাদে প্রাপ্ত অন্তঃসত্ত্বা দাসীর সাথে মিলিত হওয়া নিষেধ। প্রতিবেশী বা অন্যের বাগানে পানি সিঞ্চন করার সাথে, এ হাদীসের কোনো সম্পর্কই নেই।^{৩৮৪}

এ হলো ফিকহশূন্য শুধু হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা। যাদের হাদীসের উস্তাদ ছিলো এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁরা হাদীসের উস্তাদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন।

আর যাদের হাদীসের উস্তাদ নেই বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস অধ্যয়ন করেননি তাদের অবস্থা কী? বিশেষ করে আমাদের সময়ে যারা কোনো উস্তাদের কাছে হাদীস বা ফিকহ অধ্যয়ন না করে মুহাদ্দিস বা মুজতাহিদ সেজেছেন, তাদের অবস্থা কী হতে পারে?!

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সুলাইমান হাবীব

পারম্পরিক বিভেদে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ও মাযহাবসমূহের মতভেদ

প্রশ্ন :- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

অর্থাৎ আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা এবং পরস্পরে বিভেদ করো না।^{৩৮৫}

এখন বিভিন্নজন বিভিন্ন মাযহাব মানার দ্বারা বিভেদ হচ্ছে। এটা কুরআনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য নয়?

উত্তর :- এখানে দুটি বিষয়। একটি হচ্ছে বিভেদ; অপরটি হল মতভেদ। সকল মতভেদ বিভেদ নয়। এবং চার মাযহাবের মতভেদও বিভেদ নয়। কেননা ফুররী মাসায়েল বা শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের যে মতপার্থক্য যাকে ফিকহী মাযহাবের মতভেদ বল হয়, কখনো বিভেদ নয়। কারণ বিভেদ হচ্ছে মৌলিক ও অকাট্য বিষয়ে মতভেদ করা, যাকে দলিলবিহীন মতভেদও বলে। কিন্তু মুজতাহিদ ইমামগণের মতভেদ হল শাখাগত বিষয়ে ওহী ও দলিলভিত্তিক, যা স্বীকৃত ও নন্দিত।

এ কারণে সাহাবায়ে কিরামের যুগেও ফিকহের মাযহাব ও ফিকহের মতভেদ ছিল, কিন্তু বিভেদ ছিল না। যেমন ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (মৃ. ২৩৪ হি.) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণের মাঝে তিনজন সাহাবী এমন ছিলেন, যাদের শাগরিদ তাদের মাযহাব অনুসরণ করতেন, তাদের মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন, এবং তাদের তরীকা অনুসরণ করতেন। তারা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও য়ায়েদ ইবনে সাবিত রা।^{৩৮৬}

সুতরাং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে যে বিভেদ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে ইমামগণের মাঝে ইজতিহাদের কারণে সৃষ্ট মতভেদ

^{৩৮৫} সূরা আলে-ইমরান, ১০৩।

^{৩৮৬} আল-ইলাল, ইবনুল মাদীনী ৬৫-৭৩ মাকতাবাতুত দাওয়াহ।

ও মতপার্থক্য উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, التفرق في العقائد তথা দ্বীনের মৌলিক ও আকীদাগত বিষয়ে মতপার্থক্য এবং التفرق للأغراض তথা পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত মতপার্থক্য।

আরো একটু বিস্তারিত করে বললে বিষয়টি এভাবে বলা যায়, সারাবিশ্বে যত মতবিরোধ ও মতানৈক্য হয় তা কোন কোন জায়গা থেকে হয়, কিংবা তার মূল কেন্দ্র কোথায়- সে দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা কুরআন ও হাদীসকে সামনে রাখি, ইতিহাস পর্যালোচনা করি এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে গবেষণা করি, তাহলে দেখা যায় সবগুলোর মূল কেন্দ্র হলো চারটি ক্ষেত্র। আর আমরা যদি এ চারটি বিষয় ভালোভাবে বুঝতে পারি, তাহলে কুরআনে ‘তাফাররুক’ বা বিভেদ করতে নিষেধাজ্ঞার সঠিক মর্ম বুঝে আসবে বলে আশা করি।

ক্ষেত্র চারটি হল,

এক. التفرق في العقائد দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অর্থাৎ আকীদাগত বিষয়ে মতবিরোধ হওয়া। যেমন ইয়াহুদীরা এ আকীদা পোষণ করে যে, হযরত ওয়াইর আ. আল্লাহর পুত্র। তদ্রূপ খৃস্টানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। আল্লাহ তাআলা তাদের এ আকীদাসমূহকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلُهُمُ اللَّهُ أَلَىٰ يُؤْفَكُونَ

“ইয়াহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র আর নাসারাগণ বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ সবই তাদের মুখের তৈরী কথা। এরা তাদের পূর্বে যারা কাফের হয়ে গিয়েছিলো, তাদেরই মত কথা বলে। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে উল্টে যাচ্ছে?”^{৩৮৭}

অথচ মুসলমানদের আকীদা হলো, আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।^{৩৮৮} এভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিপরীত যত আকীদা আছে, সবই এই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত।

দুই. التفرق للأغراض النفسانية الدنيوية তথা পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত মতপার্থক্য। আর এটা একেবারেই স্পষ্ট। কারণ মারা-মারি, কাটা-কাটি, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ-নির্যাতনে বিশ্ব আজ মৃত্যুকূপে পরিণত হতে চলেছে। সারা বিশ্বে হাহাকার বিরাজমান। জাতি আজ শান্তির খোঁজে দিশেহারা।

এ সবার মূলে রয়েছে দুনিয়াবী স্বার্থ কিংবা প্রবৃত্তি। সুতরাং এগুলো থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেফাজত করুন।

তিন. التخطئة في الفروع مع التبري فيها অর্থাৎ শাখাগত মাসায়েলের ক্ষেত্রে অন্যকে নিশ্চিত ভুল সাব্যস্ত করা এবং নিজেকে ভুল থেকে মুক্ত দাবি করা। অর্থাৎ এভাবে বলা যে, আমিই একমাত্র সঠিক আর অন্যমতের অনুসারীরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় রয়েছে।

এর দ্বারাও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে মতবিরোধের রূপ নেয়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং একে অন্যের পিছনে লেগে থেকো না এবং হিংসা করো না।”^{৩৮৯}

চার. التخطئة في الفروع بدون التبري فيها অর্থাৎ শাখাগত মাসায়েলে অন্যকে (অনিশ্চিতভাবে) ভুল সাব্যস্ত করা এবং নিজেকে ভুল থেকে মুক্ত দাবি না করা। ফুকাহায়ে কেরামদের পরিভাষায় যাকে বলা হয়,

مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب.

“আমাদের মাযহাব সঠিক, তবে ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর অন্য মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।”

আমরা যদি এ চারটি ক্ষেত্র ভালোভাবে বুঝে থাকি, তাহলে এখন বুঝার চেষ্টা করি, পবিত্র কুরআনের ‘তাফাররুক’ বা মতবিরোধ হতে নিষেধের সঠিক অর্থ কী?

আর তা হলো, প্রথম তিন ক্ষেত্রে মতবিরোধ করাকে পবিত্র কুরআনে لا تفرقوا শব্দ বলে নিষেধ করেছে। অর্থাৎ প্রথম তিন ক্ষেত্রে বিভেদ ও মতবিরোধ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ, আর চতুর্থ ক্ষেত্রে বৈধ ও স্বীকৃত।^{৩৯০}

^{৩৮৯} মুসলিম, হাদীস নং ৩০।

^{৩৯০} দেখুন, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর তত্ত্বাবধানে যফর আহমদ ওসমানী রহ. এর রচিত ‘আহকামুল কুরআন’ ২/৪৭; আহকামুল কুরআন, ইমাম আবু বকর জাসসাস ২/৩৬-৩৭; আহকামুল কুরআন, কাযী ইবনুল আরবী ১/৩৮১-৮২; আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া হারাসী

প্রশ্ন :- আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক, হাদীস এক, মাযহাব চারটি কেন?

উত্তর :- দেখুন, ফুরূয়ী মাসায়েল বা শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের যে মত পার্থক্য তথা ফিকহী মাযহাবের মতপার্থক্য, তা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নয়। কারণ ফিকহের এই মাযহাবগুলো তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণেরই মাযহাব। এগুলো গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ, স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। ফিরকা ও ফিকহি মাযহাবের পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়া খুবই দুঃখজনক বিষয়।

ইমামগণের মাঝে ফিকহের মাযহাব ও ফিকহের মতপার্থক্য ছিল দলিলভিত্তিক, যা শরীয়ত সমর্থন করেছে এবং বহাল রেখেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগেও তা ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কেননা আমরা যখন ফিকহী মাসায়েলকে সামনে রেখে গবেষণা করি, তখন দেখি এমন কিছু মাসায়েল আছে, যা غير منصوصة অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফলে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ইজতিহাদ করে কুরআন-হাদীস থেকে বের করেছেন। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা, যেখানে ইজতিহাদ সেখানে মতপার্থক্য হবেই।

আর কিছু মাসায়েল منصوصة محتملة তথা কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট আছে, কিন্তু একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করেন, তখনো তাদের মাঝে মতানৈক্য হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে কিছু মাসায়েল منصوصة متعارضة তথা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু পরস্পর বিরোধী, তখনো ইমামগণ বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে পরস্পর বিরোধকে দূর করে থাকেন।

সুতরাং বুঝা গেল, উল্লিখিত বিষয়গুলোর সমস্যা সমাধান করার জন্য ইমামগণ ইজতিহাদ করেছেন, এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে রায় দিয়েছেন। আর রায় হলে মতপার্থক্য হবেই। এদিকে লক্ষ্য করে ইমাম শাফেয়ী রহ. কতইনা সুন্দর বলেছেন। তিনি বলেন, **إذ الرأي إذا كان تفرق فيه.**

“যদি কোনো বিষয়ে রায় পাওয়া যায়, তাতে মতপার্থক্য হবেই।”^{৩৯১}

এ সম্পর্কে আরো বিশদ আলোচনা ভূমিকাতে রয়েছে।

প্রশ্ন :- ইজতিহাদী মতপার্থক্যের হুকুম কী? এবং এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর :- দলিলভিত্তিক ইজতিহাদী মতপার্থক্য বৈধ ও ইসলামের সৌন্দর্য্য; কিন্তু কোনো পক্ষের নিন্দাবাদ অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। এ ইখতিলাফের কারণ দলিল না জানা বা না মানা নয়, বরং দলিল অনুসরণ করতে গিয়েই এ ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরে যাওয়ার কারণে নয়। আসবাবুল-ইখতিলাফ বিষয় অধ্যয়ন করলেই আমরা বুঝতে পারবো, এ ধরনের প্রকারকে ইখতিলাফে মুবাহ বা শরীয়ত স্বীকৃত ইখতিলাফ বলা হয়। যেমন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন,

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالاختلاف في أنواع الشهادات، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك من الأفراد والقران والتمتع.

“নামাযে ‘রাফয়ে ইয়াদাইন’ করা- না করা, তাশাহুদদের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে মতভেদ, আযান-ইকামতের বিভিন্ন প্রকার এসব মুবাহ বা জায়েয মতভেদের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভৎসনার পাত্র নন।”^{৩৯২}

‘রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী’ এর মাজমাউল ফিকহী (ফিকহী বোর্ড) এ ইজতিহাদী মাসাআলায় মতভিন্নতার ধরণ বিষয়ে মজলিসের (যেখানে সব মাযহাবের প্রতিনিধিসহ সালাফী আলেমগণও ছিলেন) সিদ্ধান্তে উল্লেখ হয়েছে,

“..وأما الثاني: وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل، فله أسباب علمية اقتضته، والله في ذلك حكمة بالغة... فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا،...”

“আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য। যার অনেক শাস্ত্রীয় কারণ আছে। এ বিষয়ে মতপার্থক্যের মাঝে আল্লাহর নিগূঢ় তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত আছে। যেমন বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং শরীয়তের উৎস থেকে বিধি-বিধান সমূহ আহরণ করার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা।... সুতরাং এ রকম মাযহাবের ইখতিলাফ

^{৩৯১} শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা রচিত কিতাব, আদাবুল ইখতিলাফ পৃ. ১৪।

^{৩৯২} যাদুল মাআদ ১/২৬৬ মুআস্সাসাতুর রিসালা।

দ্বীনের জন্য দোষের কিছু নয়, স্ববিরোধিতাও নয়, বরং এ ধরণের বিরোধিতা না হওয়া অসম্ভব। এমন কোনো জাতি পাওয়া যাবে না, যাদের আইন ব্যবস্থায় এ ধরণের ইজতিহাদী মতপার্থক্য নেই। সুতরাং বাস্তবতা হলো, এ ধরণের মতভেদ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।”^{৩৯৩}

সুতরাং আমাদের কারো জন্য উচিত হবে না, কোনো ইমামের ব্যাপারে কটুক্তি করা বা তাদের শানে গোস্তাখী করা। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়তসম্মত ইজতিহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপর পক্ষ সঠিক হলে, তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতিহাদকারীকে দ্বিগুণ সাওয়ার দান করবেন।

ইজতিহাদী মতবিরোধে কারও এ কথা বলার অধিকার নাই যে, নিশ্চিতরূপে এক পক্ষ সঠিক এবং অপর পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে এক পক্ষকে কুরআন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক, কিন্তু ভুল হওয়ার আশংকাও রয়েছে। এবং অপর পক্ষ ভুল, সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কথাটি ইমাম ও ফিকহবিদগণের কাছে স্বীকৃত, যা পূর্বেও বলা হয়েছে।

এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজতিহাদী মতপার্থক্যে কোনো পক্ষ এমন হয় না যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যিক। আজকাল অনেক আলিমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। ইজতিহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতিহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়।

কিন্তু আজকাল মুসলমানদের কী হচ্ছে! বর্তমানে এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক বিতর্ককেই দ্বীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক লড়াই বাগড়া ও মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ কর্মপন্থা

অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের বিরোধী ও নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীগণের রীতির পরিপন্থী।

উদাহরণত, ইমাম শাফেয়ী রহ. ও অন্য কয়েকজন মুজতাহিদের মতে জামাআতের নামাযে ইমামের পিছনে মুজাদিগণ সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার নামায হবে না। এর বিপরীতে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের কোথাও দেখা যায় না যে, শাফেয়ী মাযহাবের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের মুসলমানগণ কে বে-নামাযী বলেছেন।^{৩৯৪}

প্রশ্ন :- পরস্পরের মতভেদ শত্রুতাকে বাড়ায়, মুহাব্বতের অবসান ঘটায়। এ কারণে মতভেদ ভুলে সকলে এক মত ও পথের অনুসারী হওয়া কি একান্ত কাম্য নয়?

উত্তর :- ‘মতভেদ করা শত্রুতাকে বাড়ায়, মুহাব্বতের অবসান ঘটায়’ এটা অবাস্তব ধারণা মাত্র। কারণ সাহাবায়ে কেরাম এবং ইমামগণ তাদের নিজেদের মাঝে পরস্পর মুহাব্বত থাকা সত্ত্বেও কিছু ফুরূযী বিধানে মতানৈক্য হয়েছে। কিন্তু এ মতানৈক্য তো তাদের মাঝে শত্রুতা বাড়ায়নি, বরং মুহাব্বত অটুট ছিল।

যেমন শাইখ বিন বায রহ. বলেন,

“আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করুন! নিশ্চয় আপনারা অবগত আছেন যে, দ্বীনের ফুরূ বা শাখাগত মাসায়ালে ফিকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে যে মতপার্থক্য তা নতুন নয়, বরং প্রাচীন যুগ (সাহাবা যুগ) থেকে চলে আসছে। আর এই মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো রকম হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিভক্তি সৃষ্টি করেনি।”^{৩৯৫}

সুতরাং এক মত ও পথের অনুসারী হয়ে চলার প্রশ্নও আর আসে না, আর তা সম্ভবও নয়। কারণ কুরআন-হাদীসই এ মতভেদের ভিত্তি। সর্বপোরি তা ইলাহী নীতির বিরোধী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইচ্ছার পরিপন্থী এবং সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের কর্মবিরোধী।

কিন্তু শরীয়তের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই, তারা ইখতিলাফ শব্দটি শোনা মাত্রই ভ্রু কুণ্ঠিত করেন এবং কিছুটা বিব্রত

^{৩৯৪} মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. রচিত তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন-২/১৪৩-১৪৪।

^{৩৯৫} মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৫/১৪৯।

হয়ে পড়েন, বিশেষত নামাযের মতো মৌলিক ইবাদত বিষয়ে ইখতিলাফ, যা ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন, তাদের পক্ষে একেবারেই যেন অসহনীয়।

তাদের জানা থাকা উচিত, ইখতিলাফ মাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা কিছু ইখতিলাফ বা মতভেদ আছে যার প্রেরণা দলিলের অনুসরণ। দলিল না জানা বা না মানা নয়। স্বয়ং দলিলই ওই মতভেদের উৎস যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আর এখানে দলিলভিত্তিক মতভেদ স্বীকৃত, বরং নন্দিত কিন্তু ঝগড়া বিবাদ নিষিদ্ধ।

এ প্রকার ইখতিলাফ যে বৈধ- তার দলিল প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা সহীহ বুখারীতে ইবনে ওমর রা. সূত্রে বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কে বললেন, কেউ যেন বনু কুরাইযায় পৌঁছানোর পূর্বে আসরের নামায না পড়ে। (অনেকে সময়মত পৌঁছে গেলেন। তবে) কিছু সাহাবা রাস্তায় ছিলেন। এদিকে আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছিল। (এঁদের মাঝে মতভেদ দেখা দিলো যে, নামায কোথায় পড়া হবে)

একদল বললেন, আমরা নামায বনু কুরাইযাতে গিয়েই পড়বো, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অন্যদল বললেন, আমরা নামায পড়ে গন্তব্যে পৌঁছবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য দ্রুত পৌঁছানো, নামায কাযা করা নয়। অবশেষে এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি কোনো পক্ষকেই ভৎসনা করেননি।

যারা পথে নামায পড়েছেন তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমানের কারণে সাওয়াবের নিয়তে নামায আদায় করেছেন। আর যারা কাযা করেছেন তারাও একই কারণে কাযা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম ইখতিলাফ বা মতভেদ করেছেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থনও করেছেন।

এরকম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আরো বহু মাসআলায় মতানৈক্য হয়েছে, যেমন আবু মূসা আশআরী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রা. এর মাঝে মিরাস সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদ হয়েছে।^{৩৯৬}

এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে যা লক্ষণীয় বিষয় তা হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ বা মতভেদ হয়েছে, কিন্তু কেউ কারো সাথে বিবাদ করেননি, একে অপরের সাথে দুশমনি রাখেননি, কেউ কাউকে ভ্রান্ত বলেননি।^{৩৯৭}

শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা সাহেব দা.বা. এ জাতীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে আরো বলেন, ইমাম ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ বলেন যে, ফকীহ ও মুফতি সাহেবরা ফতোয়া দিয়ে একজন একটাকে হারাম সাব্যস্ত করেন, অপরজন এটাকে হালাল সাব্যস্ত করেন, কিন্তু হারাম সাব্যস্তকারী এ কথা মনে করেন না যে, হালাল সাব্যস্তকারী পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন হালাল সাব্যস্ত করার কারণে। এবং হালাল সাব্যস্তকারীও মনে করেন না যে, হারাম সাব্যস্তকারী পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন হারাম সাব্যস্ত করার কারণে।^{৩৯৮}

এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, ফুরূয়ী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করা দোষণীয় ও নিন্দিত নয়। সুতরাং এ মতভেদকে বিভেদ কিংবা বিচ্ছিন্নতা মনে করা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, কেউ ওই ফুরূয়ী ইখতিলাফ কে বিভেদের কারণ বানায়, তাহলে সেটা তার অজ্ঞতা, যা সংশোধন করা ফরয। আল্লাহ আমাদের কে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন!

মুহাম্মদ আব্দুন নূর

^{৩৯৭} আদাবুল ইখতিলাফ পৃ. ২৯।

^{৩৯৮} আদাবুল-ইখতিলাফ পৃ. ৩৫।

ইমামগণের তাকলীদ পোপ-পাদ্রিদের তাকলীদের মতো হওয়ার কারণে শিরক

প্রশ্ন :- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

“তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (অর্থাৎ ইহুদী ধর্মগুরু) এবং রাহিব (খ্রিস্টান ধর্মগুরু)কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে।”^{৩৯৯}

উক্ত আয়াতে ধর্মগুরুদের তাকলীদকে শিরক বলা হয়েছে। তাহলে ইমামের তাকলীদ কি শিরকতুল্য নয়?

উত্তর :- আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুদের অভিযোগটি সম্পূর্ণ অসত্য ও বাস্তবতাবিরোধী। কেননা আমাদের আলোচ্য তাকলীদের সাথে এই অভিযোগের দূরতমও সম্পর্ক নেই। আশা করি, সামনের আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, ইনশাআল্লাহ!

এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কথা হল, লা-মাযহাবী বন্ধুগণ উক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণে মারাত্মকভাবে ইলমী খিয়ানতের শিকার হয়েছেন। কারণ কোনো মুফাসসির উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাযহাব অনুসারীদের তাকলীদকে শিরক বলেননি, বা মাযহাবের তাকলীদ উক্ত আয়াতের হুকুমের আওতাভুক্ত হবে এমন কথাও বলেননি।

কুরআনের উক্ত আয়াতে তাকলীদের নিন্দার কারণ হল, ইহুদী-খ্রিস্টানেরা তাদের ধর্মীয় আলেম, পোপ, পাদ্রি ও সন্যাসীদেরকে ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করত, তারা কোনো বস্তুকে হালাল অথবা হারাম সাব্যস্ত করলে নিঃসঙ্কোচে তারা তা গ্রহণ করে নিত। এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর হুকুমের প্রতি কোনো ভ্রক্ষেপ করত না। প্রকারান্তরে তারা ধর্মীয় পাদ্রি-রাহেবদেরকে রবের আসনে বসিয়ে দিয়েছিল। আর উক্ত আয়াতে তাদের এই ধরনের নিষিদ্ধ তাকলীদের নিন্দা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে মাযহাবের অনুসারীরা কুরআন-সুন্নাহর উপর সঠিক পন্থায় আমল করার জন্য নিজেদের অসম্পূর্ণ ও কাঁচা বুঝের উপর নির্ভর না করে

কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিত্য অর্জনকারী ইমামগণের অনুসরণ করেন। ইমামগণকে নিছক ব্যাখ্যাকার এবং কুরআন ও সুন্নাহর জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের মর্ম উদঘাটনকারী হিসেবে মান্য করেন। শরীয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে এককভাবে তাদের সিদ্ধান্ত দলিলযোগ্য মনে করা হয় না।

উপরন্তু আমরা (মুকাল্লিদরা) তাঁদেরকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করি না; বরং আমরা তো বিশ্বাস করি, তাঁদের উদঘাটনকৃত মাসআলা সঠিক হওয়ার পাশাপাশি ভুল হওয়ারও আশংকা আছে। এ কারণেই প্রত্যেক মাযহাবেই এমন কিছু বিষয় দেখা যায়, যাতে সার্বিক বিচারে নিজ ইমামের দলিল দুর্বল হওয়ার কারণে তাতে ভিন্ন ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

সুতরাং প্রমাণিত হল, ইহুদী-খ্রিস্টানরা আল্লাহ ও তাদের নবীর পরিবর্তে তাদের ধর্মগুরুদেরকে আইনপ্রণেতা মনে করত। আর মুসলিমগণ তাদের ইমামদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইনের ব্যাখ্যাকারী মনে করে। এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করতে না পারা অজ্ঞতার পরিচয় অথবা ইলমী খেয়ানত।

উল্লেখ্য, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হয়তো আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহ. এর উদ্ধৃতি টেনে বলবেন, তিনি স্বীয় তাফসীর গস্বে **اَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ** وَرُؤَسَاءَهُمْ আয়াতের অধীনে তার শায়খের নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হল, তিনি ফুকাহায়ে কেরামের অনুসারী এক জামাআতের সাক্ষাত পেয়ে কিছু মাসআলায় তাদের মাযহাবের বিপরীত কুরআন থেকে অনেকগুলো আয়াত পাঠ করলেন। কিন্তু তারা উক্ত আয়াতসমূহ গ্রহণ করলেন না। যেহেতু এগুলো তাদের ইমামদের থেকে বর্ণিত মতের বিপরীত ছিল।^{৪০০}

সুতরাং উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল, মাযহাবের অনুসারীরা তাদের ইমামদের যেন রব বানিয়ে নিয়েছে।

এর উত্তরে আমাদের প্রথম কথা হল, আপনি প্রশ্নটির উত্তর বার বার পড়ুন সাথে সাথে সামনের প্রশ্নের উত্তরও দেখুন। তাহলে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত দিবেন যে, আমাদের আলোচ্য তাকলীদের সাথে উপরোক্ত ঘটনায় উল্লিখিত মুকাল্লিদদের তাকলীদের সাথে কোনো মিল নেই। কেননা যে

^{৪০০} তাফসীরে কাবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী : ৬/৩১- দারুল হাদীস।

কোনো মাসআলায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য থাকলে সেখানে আমরা তাই গ্রহণ করি।

قال الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم في "تفسير القرآن الكريم": وحكى الرازي عن بعض شيوخه ... انتهى.

على أي الأحوال الكلام ينبغي أن يحصى وألا يأخذ بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكره العلماء؛ لأننا لا نقبل أن يشيع الاستدلال كما يحصل من بعض الغلاة السلفيين، حيث يكثرون من الاستدلال بهذه الآية الكريمة في الرد على المذهبيين، فيشبهون عموم الناس من مقلدة الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقلدين المشهورة مذاهبهم بالأخبار والرهبان! وهذا لا يقبل في ملة الإسلام أبداً؛ لأن أئمتنا ما أحلوا الحرام ولا حرموا الحلال، ولا يظن بإمام من أئمة المسلمين أبداً أنه تعمد ذلك، غاية ما في الأمر أن يكونوا ما بين مجتهد مصيب حصل على أجرين ومجتهد مخطئ حصل على أجر واحد.

لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان، يفعلون مثل فعل هؤلاء الأخبار والرهبان، ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى، ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام، أو يجرمون الحلال، وينتهكون حرمان الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يحذروا بهذه الآية تخويفاً وموعظة وزجراً لهم، أما في المسائل الخلافية الفقهية التي هي محل خلاف سائغ معتاد بين الفقهاء، فلا يأت أحد المتناظرين يستدل على الآخر بقوله: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ)، فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين.

আরবের ড. মুহাম্মদ আহমদ ইসমাইল তার 'তাবসীরুল কুরআনিল কারীম' গ্রন্থে ইমাম রায়ীর বর্ণিত উপর্যুক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

সারাংশ, “উপর্যুক্ত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে হবে, আলেমগণের বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখে তার বাহ্যিক মর্ম গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কিছু গোড়া সালাফীরা এ আয়াতকে যে মাযহাব অনুসারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, তা ইসলামে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমাদের ইমামগণ কোনো হালালকে হারাম করেননি বা কোনো হারামকে হালাল করেননি। এবং মুসলিমদের কোনও ইমাম সম্পর্কে এ কল্পনাও করা যায় না

যে, তিনি এর ইচ্ছে করেছেন। বেশি থেকে বেশি এতটুকু হবে যে, কোনও ইমাম সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে দুই সাওয়াব আর কারো ভুল হয়ে গেলে এক সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

তবে হ্যাঁ, প্রতিটি সময় ও স্থানে কিছু (ওলামায়ে সূ) স্বার্থান্বেষী আলেম আছে, যারা হুবহু সেই পোপ-পাদ্রিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। তাদের অনুগামীরাও তাদের সাথে ইহুদ-নাসারাদের মত খোদাসুলভ আচরণ করছে। তাদেরকে উপদেশ, শাসন ও সংশোধন করার জন্য এ আয়াত দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

কিন্তু ফুকাহাদের মাঝে প্রচলিত ইখতিলাফী বিষয়সমূহে কেউ কারো বিরুদ্ধে এ আয়াত দ্বারা দলিল দিতে পারবে না এবং এ আয়াতকে কখনোই মুসলমানদের ইমামদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সমীচীন হবে না।”

দ্বিতীয়ত: নির্দিষ্ট মাযহাবসমূহের উপর আমল জারী হওয়ার পর থেকে উম্মতের অসংখ্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এ সমস্ত মাযহাবের উপর আমল করে আসছেন। মাযহাবের বড় থেকে নিয়ে ক্ষুদ্র মাসআলায়ও তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। মাযহাবের ফতোয়াসমূহকে কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখেছেন, তাতে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত কোনো মাসআলা আছে কি না খতিয়ে দেখেছেন এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখন নতুন কেউ এসে যদি বলে, “তোমার এ মাসআলা কুরআনের এ আয়াতের বিরোধী!” তখন তার কথা গ্রহণ করা হবে নাকি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে দক্ষ ইমামদের কথা গ্রহণ করা হবে?!

তাছাড়া তাফসীরে কাবীরের স্বয়ং লেখক নির্দিষ্ট মাযহাবের (শাফেয়ী) অনুসারী। উক্ত তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে তিনি চার মাযহাবের ইমামদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, উক্ত ঘটনাটি তিনি কিছুতেই মাযহাবের বিরোধিতার জন্য আনেননি; বরং যারা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও গোড়ামি করে তাদের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

প্রশ্ন :- খৃস্টানদের পোপ অনুসরণ এবং মুকাল্লিদগণের ইমাম অনুসরণের মাঝে পার্থক্যগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন?

আল্লামা তাকী ওসমানী (হাফিয়াহুল্লাহ) স্বীয় কিতাব ‘তাকলীদ কী শরয়ী হায়ছিয়াত’ এর মধ্যে ‘ইন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ এর উদ্ধৃতি দিয়ে খৃস্টধর্মে পোপকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

১. খৃস্টানদের কাছে পোপ হলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি প্রমাণ তথা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নির্বিচারে তার কথা প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. পোপকে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্দেশনা জারী করার পরিপূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সকল আকীদা সকল খৃস্টানদের উপর কার্যকারী হবে, এক্ষেত্রে কারো কোনো ধরনের বিরোধিতার সুযোগ নেই।

৩. খৃস্টধর্মে পোপকে আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

৪. পোপ খৃস্টধর্মের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখেন।

এগুলো হল খৃস্ট জগতে পোপের ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকার, যার নিন্দা কুরআন ও হাদীস শরীফে এসেছে। পোপের এ সমস্ত অধিকারের সাথে মুজতাহিদ ইমামের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নাই।

কেননা, মুজতাহিদ ইমাম শরীয়তের স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো দলিল নন যে, নির্বিচারে তার কথা গ্রহণীয় হবে। শরীয়তের আইন প্রণয়নে তার কোনো অধিকার নেই। মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও মুহকাম বিষয়ে তার তাকলীদ জায়েজ নয়। শরীয়তের যে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার মুজতাহিদ ইমামকে দেওয়া হয়নি, আমরা তাকে শুধু সুবিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার মনে করি। উপরন্তু তার ইজতিহাদকৃত মাসআলায় ভুলের আশংকা রয়েছে।

পোপ ও ইমামের মাঝে আকাশসম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদকে কিভাবে ইহুদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় নেতাদের অন্ধ ও নিষিদ্ধ অনুসরণের সমপর্যায়ের মনে করে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা তাদেরকে এতটুকু অনুরোধ করব, সব ধরনের হঠকারিতা ও বিদ্বেষ দূর করে, আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে একনিষ্ঠ ইখলাসের সাথে তাকলীদ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে বোঝার চেষ্টা করুন! আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রশ্ন :- মুকাল্লিদরা কখন এবং কী কারণে ইমামগণের অনুসরণ করে থাকেন?

উত্তর :- এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করছি যে, মুকাল্লিদরা শরীয়তের সকল বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামকে অনুসরণযোগ্য মনে করেন না। বরং যে সকল মাসআলা-

মাসায়েলের সমাধান মুজতাহিদ ইমামের সাহায্য ছাড়া সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে জানা সম্ভব নয়, শুধু সেসকল ক্ষেত্রেই তাদের অনুসরণ করে থাকেন। উদাহরণ সরূপ ১. যে সকল মাসআলার সমাধান সুস্পষ্টভাবে কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নাই। ২. কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু তা একাধিক অর্থ বা মর্মের সম্ভাবনা রাখে। ৩. পরস্পর সাংঘর্ষিকপূর্ণ দলিল সম্বলিত মাসআলা।

যেহেতু উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদ ছাড়া সমাধান বের করা সম্ভব নয়, সঙ্গত কারণেই নিজের অপরিপক্ব মেধার পরিবর্তে যোগ্য মুজতাহিদ ইমামের বুকের উপরে ভরসা করে আমল করাই সঠিক ও নিরাপদ পদ্ধতি।

প্রশ্ন :- কথায় কথায় যারা মুসলিমদেরকে কাফের-মুশরিক বলে তাদের হুকুম কী?

উত্তর :- এ প্রশ্নটি এখানে আনার কারণ হল, যেহেতু গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা মাযহাবের অনুসরণকে শিরক, অন্ধ তাকলীদ, দলীয় গোঁড়ামীতে আবদ্ধ, পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ এবং মুকাল্লিদদেরকে মুশরিক-কাফের পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেন না, তাই এই সকল শব্দের ব্যবহারে তারা যেন বিশেষ সতর্ক হন এবং চিন্তা-ভাবনা করে হুকুম আরোপ করেন- এই উদ্দেশ্যেই এই বিষয়ে কিছু লেখা হয়েছে।

কোনো মুসলমানকে কাফের বলা খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কুরআন-সুন্নাহর এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী এসেছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে কোনো মুসলমানকে কাফের বলা সম্পর্কে নিম্নোক্ত সতর্ক বাণী এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে; তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে। কেউ তোমাদের সালাম দিলে পার্থিব জীবনের উপকরণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলবে না যে, তুমি মুমিন নও। কেননা আল্লাহর নিকট প্রচুর গণীমতের সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো পূর্বে এমনই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। সুতরাং

যাচাই-বাছাই করে দেখবে। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহই সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।”^{৪০১}

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোনো মুসলমানকে কাফের বলা সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন,

عن أبي ذر أن النبي قال: لا يرمى رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.

“হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কাউকে ফাসেক বা কাফের বললে, যদি উক্ত লোকটি এমন না হয়, তবে তা তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।”^{৪০২}

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة، وابن عمر، أن النبي عليه السلام قال: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما.

“হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অপরাধী ভাইকে বলে, ‘হে কাফের!’, তবে এই কুফরী তাদের দুজনের একজনের দিকে ফিরে আসবে।”^{৪০৩}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله

“কোনো মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেওয়া তাকে হত্যার সমতুল্য।”^{৪০৪}

এ প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরাম একটি মূলনীতি বলেছেন, যদি কারো কোনো কথার মাঝে ৯৯ ভাগ কুফরির সম্ভাবনা ও একভাগ ঈমানের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ঈমানের সম্ভাবনা রাখে এমন বাক্যের ধর্তব্য হবে। হ্যাঁ, যদি সে নিজেই ব্যাখ্যা করে দেয়, তার কথার কী মর্ম, তখন তার

^{৪০১} সূরা নিসা ৯৪।

^{৪০২} সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪৫।

^{৪০৩} সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০৩।

^{৪০৪} সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬০৪৭।

ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে আবার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ৯৯টি কুফুরী কথা বলবে তারপরও তাকে মুমিন বলা হবে।^{৪০৫}

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল, একজন মুসলমানকে কাফের-মুশরিক বলা কত বড় অন্যায়। আর এ কাজটিই করে চলেছেন আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা। তাই আমরা অনুরোধ করব, ভাই! আগে أصول التكفير (কাউকে কাফের বলার মূলনীতি) নিয়ে পড়াশুনা করুন। অন্যথায় বিপরীত ঘটতে পারে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

কামরুল ইসলাম

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রতি স্বল্প হাদীস জানার অপবাদ

প্রশ্ন :- কোন কোন ইমাম যেমন ইবনে খালদুন ও ইবনে হিব্বান রহ. প্রমুখ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সম্পর্কে স্বল্প হাদীস জানার যে অভিযোগ করেছেন তা কি সঠিক? আর এ অভিযোগের কারণই বা কী?

উত্তর :- এ অভিযোগ সত্য নয়। আমরা প্রথমে উপরোক্ত দুই জনের অভিযোগ লক্ষ্য করি, এরপর জবাব উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইবনে খালদুন রহ. তার ‘মুকাদ্দিমায়’ বলেন,

فأبو حنيفة رضي الله يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً، أو نحوها.

“বলা হয়ে থাকে, ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত হাদীস সতেরটি পর্যন্ত পৌঁছেছে।”^{৪০৬}

ইবনে হিব্বান রহ. বলেছেন,

حدث بمائة وثلاثين حديثاً مسانيد، ما لهُ حَدِيثٌ فِي الدُّنْيَا غَيْرُهُ، أَخْطَأَ مِنْهَا فِي مِائَةِ وَعِشْرِينَ حَدِيثاً، إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَقْلَبُ إِسْنَادَهُ أَوْ غَيْرَ مَتْنِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. ১৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এগুলো ছাড়া দুনিয়াতে তার আর হাদীস নেই। আবার ১৩০টির মধ্যে ১২০টি হাদীসেই তিনি ভুল করেছেন। তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত সনদ উল্টা-পাল্টা করেছেন অথবা মতন পরিবর্তন করে ফেলেছেন।”^{৪০৭}

প্রিয় পাঠক! যাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. এর হাদীস বিষয়ে দক্ষতা ও পারঙ্গমতার ব্যাপারে নূন্যতমও ধারণা আছে, তারা এমন অভিযোগ বিশ্বাস করতে পারে না।

ইবনে খালদুন প্রসঙ্গ:

ইবনে খালদুনের বক্তব্যটি সঠিক ও বাস্তব সম্মত নয়। তার এমন বক্তব্যের কারণ সম্পর্কে কারো কারো বক্তব্য হলো, যেহেতু ইমাম সাখাবী রহ. (মৃ. ৯০২ হি.) এর মতে ইবনে খালদুন ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে পারদর্শী হলেও ‘উলূমে শরয়ীয়াহ’তে অভিজ্ঞ ছিলেন না, তাই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর হাদীসের তুরাহ সম্পর্কে তার ভাল জানা-গুনা ছিল না।

^{৪০৬} মুকাদ্দিমা ৪৯১।

^{৪০৭} আল-মাজরুহীন, ইবনে হিব্বান, ৩/৬৩।

হয়তো কারো কাছ থেকে শুনে তিনি ইমাম সম্পর্কে স্বল্প হাদীস জানা বা বর্ণনার ধারণা ব্যক্ত করেছেন। আর এ ধারণা তার কাছেও অস্পষ্ট বা অগ্রহণযোগ্য ছিল, যা তার 'يقال' 'দুর্বলতা প্রকাশক শব্দ' দ্বারা বুঝা যায়।

আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. 'শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ' এর টীকায় বলেন,

وما قاله ابن خلدون فهفوة مكشوفة، لا يجوز لأحد أن يغتر بها، لأن رواياته على تشدده في الصحة لم تكن سبعة عشر حديثاً فحسب، بل أحاديثه في سبعة عشر سفرأ، يسمى كل منها بمسند أبي حنيفة، خرجها جماعة من الحفاظ وأهل العلم بالحديث بأسانيدهم إليه، ما بين مقل منهم ومكثر، حسبما بلغهم من أحاديثه، وقلما يوجد بين تلك الأسفار سفر أصغر من سنن الشافعي رواية الطحاوي، ولا من مسند الشافعي برواية أبي العباس الأصم الذين عليهما مدار أحاديث الشافعي. وقد خدم أهل العلم تلك المسانيد جمعاً وتلخيصاً وتخریجاً وقراءة وسماعاً ورواية، فهذا الشيخ محدث الديار المصرية الحافظ محمد بن يوسف الصالحی صاحب كتاب الممتعة في السيرة وغيرها يروى تلك المسانيد السبعة عشر عن شيوخ له، ما بين قراءة وسماع ومشافهة وكتابة بأسانيدهم إلى مخرجيها في كتبهم، في كتابه "عقود الجمان". وكذا يرويها بطرق محدث البلاد الشامية الحافظ شمس الدين بن طولون في "الفهرست الأوسط" عن شيوخ له، سماعاً وقراءة مشافهة وكتابة بأسانيدهم كذلك إلى مخرجيها،...

সারাংশ “ইবনে খালদুন তার ইতিহাসের ‘মুকাদ্দিমায়’ যা বলেছেন, তা সুস্পষ্ট অযৌক্তিক প্রলাপ বৈ কিছু নয়। কেউ যেন এতে ধোঁকাগ্রস্থ না হয়। কেননা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস সংখ্যা শুধু ১৭টি ছিল না, বরং সতেরটি দপ্তরে লিপিবদ্ধ এবং প্রত্যেকটির নাম হল, ‘মুসনাদে আবী হানীফা’, যা রচিত হয়েছে হফফাজে হাদীস ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের কলমে। এগুলোর সবচেয়ে ছোট দপ্তরটিও তাহাবী সূত্রে বর্ণিত ‘সুনানে শাফেয়ী’ এবং আবুল আব্বাস আহমের সূত্রে বর্ণিত ‘মুসনাদে শাফেয়ী’র চেয়ে বড়। অথচ ইমাম শাফেয়ী রহ. এর হাদীসের ভিত্তি এই দুই কিতাবের উপরই।...”^{৪০৮}

তাছাড়া ইবনে খালদুন রহ. এর এই ধারণাসুলভ দাবির জবাবে ইমাম আব্দুল হাই লাখনবী রহ. ‘উমদাতুর-রিআয়াহ’ এর ভূমিকা ১/৩৪-৩৭ এবং ‘তায়কিরাতুর রাশেদ’ এর ২২৩-২২৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তবে ইবনে খালদুন রহ. উপরোক্ত বক্তব্য নকল করার পর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর খুবই প্রশংসা করেছেন, যা আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুরা সাধারণত এড়িয়ে যান বা উল্লেখ করেন না। তিনি বলেন,

ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم،

والتعويل عليه واعتباره رداً وقبولاً.

“আবু হানীফা রহ. হাদীস শাস্ত্রে বড় মুজতাহিদ হওয়ার দলিল হলো, মুজতাহিদ ইমামদের মাঝে তাঁর মাযহাবের নির্ভরযোগ্যতা এবং কোন আলোচনা গ্রহণ ও বর্জন করতে তাঁর সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা।”^{৪০৯}

সুতরাং ইবনে খালদুন রহ. নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা রহ. কে হাদীস শাস্ত্রে বড় মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস মনে করতেন।

ইবনে হিব্বানের বক্তব্য প্রসঙ্গ:

যুগশ্রেষ্ঠ হাফিযুল হাদীসগণ ইবনে হিব্বানের এ জাতীয় বক্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। নিম্নে তার সম্পর্কে কয়েক জন মুহাদ্দিস এর মতামত তুলে ধরা হল।

এক. ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. ‘মীযানুল ই’তিদাল্লে’ বলেন,

وأما ابن حبان فإنه يقع كعاداته، فقال فيه: يروي عن قوم ضعاف أشياء

يدلسها عن الثقات، حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في

أخباره ألزقت به تلك الموضوعات، وحمل الناس عليه في الجرح، فلا يجوز عندي

الاحتجاج بروايته كلها بحال.

“ইবনে হিব্বান তো স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী অনবরত গর্জন দেয়। সে এমন দুর্বল রাবীদের থেকে বর্ণনা করে, যারা নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে ‘তাদলীস’ করে থাকে। শ্রোতা যখন তা শুনে, তো জাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে না। তার বর্ণিত বিষয়ের মাঝে এ জাতীয় হাদীসের আধিক্যের কারণে সহীহ ও জাল হাদীসের সংমিশ্রণে তাতে এক হযবরল অবস্থা সৃষ্টি

হয়েছে।...সুতরাং আমার নিকট কোনও অবস্থায় তার সকল বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েয হবে না।”^{৪১০}

দুই. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وابن حبان ربما جرح الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه.

“ইবনে হিব্বান কখনো সেকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীকে অভিযুক্ত করেন। মনে হয় যেন তিনি নিজেই জানেন না তার মাথা থেকে কী বের হয়।”^{৪১১}

আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. ‘তানীবুল খাতীব’ এর ৮৯ নং পৃষ্ঠায় ইবনে হিব্বান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

ড. মোস্তফা সিবাঈ রহ. ‘আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়ী’ল ইসলামী’ এর মধ্যে বলেন,

إن من يطالع مذهب الإمام يجده قد وافق الأحاديث الصحيحة في مئات من المسائل، وقد جمع شارح " القاموس " السيد مرتضى الزبيدي - رحمه الله - كتاباً جمع فيه الأحاديث من مسانيد الإمام أبي حنيفة والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب الستة سماه: " عقد الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة ". فكيف وافق اجتهاد الإمام مئات الأحاديث الصحيحة، وليس عنده إلا بضعة عشر حديثاً، أو خمسون، أو مائة وخمسون أخطأ في نصفها؟.

“যে ব্যক্তি ইমাম আযমের মাযহাবকে ভাল করে অধ্যয়ন করবে, সে এ মাযহাবের শত শত মাসায়েলকে সহীহ হাদীস মোতাবেক পাবে। কামূস ভাষ্যকার (‘তাজুল আরুস’ গ্রন্থকার) সাইয়েদ মুর্তাযা যাবীদী রহ. (মৃ. ১১৪৫-১২০৫ হি.) ইমাম আযমের মুসনাদসমূহ থেকে ঐ সমস্ত হাদীসকে একত্র করে একটি কিতাব সংকলন করেছেন, যে হাদীসগুলোর বর্ণনাতে হাদীসের ছয় কিতাব গ্রন্থকারগণ একমত হয়েছেন। গ্রন্থটির নাম হচ্ছে, ‘উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফাহ’। সুতরাং ইমাম আযমের ইজতিহাদগুলো কীভাবে শত শত সহীহ হাদীসের মোতাবেক হলো? অথচ (তোমরা তো বলো) ইমামের নিকট তো ১৭/৫০/১৫০টি হাদীস ছিল, যার অর্ধেকেরই তিনি ভুল করেছেন।”^{৪১২}

^{৪১০} মিয়ানুল ইতিদাল ২/২৮৫, শামেলা ৩/৪৫-৪৬।

^{৪১১} আল-কওলুল মুসাদ্দাদ পৃ. ৩৩।

^{৪১২} আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়ী’ল ইসলামী, পৃ. ৩৭২।

প্রশ্ন :- ইমাম আবু হানীফা রহ. কি ইলমে হাদীসে দক্ষ ছিলেন? থাকলে তার প্রমাণ কী?

উত্তর :- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা ও পারঙ্গমতার অনেক প্রমাণ আছে। নিম্নে কিছু প্রমাণ কয়েকটি পয়েন্টে উল্লেখ করা হলো।

এক. সমকালীন মুহাদিসীনদের দৃষ্টিতে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.।

দুই. পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের প্রশংসা এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইমামতের ব্যাপারে ইজমা'।

তিন. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মুসনাদসমূহকে মুহাদিসীনে কেরামের সংরক্ষণ।

চার. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর স্বরচিত অনবদ্য কিতাব 'কিতাবুল আসার'।

পাঁচ. মুহাদিসীনে কেরাম কর্তৃক ইমাম আবু হানীফা রহ.কে হাফিজুল হাদীস হিসেবে গণ্য করা।

মুহাদিসীনদের দৃষ্টিতে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.:

১. ইমাম বুখারীর উস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম (১২৬-২১৫ হি.) বলেন,

كان أعلم أهل زمانه.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।”^{৪১৩}

২. আবু ওসমান শাদ্দাদ ইবনে হাকীম বলখী রহ. (মৃ. ২১০ হি.) বলেন,

ما رأيت أعلم من أبي حنيفة.

“আমি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বড় কোন আলেম দেখিনি।”^{৪১৪}

আল্লামা যফর আহমদ ওসমানী রহ. বলেন,

ولا يخفى أن العلم في ذلك الزمن لم يكن إلا علم الحديث والقرآن فأعلم الناس

حينئذ من كان أعلمهم بالقرآن والحديث

“এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, তৎকালীন যুগে ‘ইলম’ বলতে ইলমুল হাদীস ও ইলমুল কুরআনকে বুঝানো হতো। তাই মানুষের মধ্যে সর্বাধিক

^{৪১৩} তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৫০।

^{৪১৪} তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৩।

ইলমের অধিকারী হওয়ার অর্থ তিনি ইলমুল হাদীস ও ইলমুল কুরআনে সবার শীর্ষে ছিলেন।”^{৪১৫}

৩. ইয়াহইয়া ইবনে মাসীন রহ. (১৫৮-২৩৩ হি.) বলেন,

كان أبو حنيفة ثقة في الحديث.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।”^{৪১৬}

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع وكان يفتي برأي أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه

كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا.

“আমি ওকী’ ইবনুল জাররাহ রহ. এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার মতো কাউকে দেখিনি। (অথচ) ওকী’ ইবনুল জাররাহ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতানুসারে ফাতোয়া প্রদান করতেন এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সকল হাদীস হেফজ করে রাখতেন। আর তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেছেন।”^{৪১৭}

৪. প্রসিদ্ধ হাফিযুল হাদীস ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ. (১১৮-২০৬ হি.) বলেন,

أدركت ألف رجل وكتبت عن أكثرهم وما رأيت فيهم أفقه ولا أروع ولا

أعلم من خمسة، أولهم أبو حنيفة.

“আমি এক হাজার মনীষী পেয়েছি, তাদের অধিকাংশ থেকেই আমি হাদীস লিখেছি। তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, অধিক খোদাভীরু ও সর্বাধিক ইলমের অধিকারী পেয়েছি পাঁচজনকে। তন্মধ্যে প্রথমজন হলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ.।”^{৪১৮}

৫. হাফেজ ইবনে খসরু তার সনদে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা থেকে বর্ণনা করেন যে, খালফ ইবনে আইয়ূব রহ. (মৃ. ২০৫/২২০ হি.) বলেন,

صار العلم من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى أصحابه، ثم

صار إلى التابعين، ثم صار إلى أبي حنيفة، وأصحابه،

^{৪১৫} কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩১০।

^{৪১৬} তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৫।

^{৪১৭} জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফায়লিহী, ইবনে আদিল-বার মালেকী, পৃ. ৪৩১।

^{৪১৮} প্রাগুক্ত।

“আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইলম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছেছে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে সাহাবায়ে কেরামদের কাছে, এরপরে তাবৈঈদের নিকট, অতঃপর আবু হানীফা ও তার শিষ্যগণের নিকট পৌঁছেছে।”^{৪১৯}

৬. মিসআর ইবনে কিদাম (মৃ. ১৫৩/১৫৫ হি.) রহ. (যিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্রজীবনের বন্ধু এবং তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন) বলেন,

الْفَقْهُ فُجَاءَ مِنْهُ بِمَا تَرَوْنَ.

“আমরা আবু হানীফার সাথে হাদীস তলব করেছি, এতে তিনি আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। আমরা পরহেযগারী অর্জনের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছি, তো আমাদের উপর তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং আমরা একত্রে ফিকহ অর্জন করেছি, আর এতে তিনি যে স্তরে পৌঁছেছেন, তা তো আপনারা দেখছেন।”^{৪২০}

৭. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১১৯-১৮১ হি.) বলেন,

لَوْلَا أَعَانَنِي اللَّهُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ لَكُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ.

“যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান রহ. এর মাধ্যমে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি ‘সাধারণ’ লোক বা অন্যদের মতোই থেকে যেতাম।”

অন্যত্র বর্ণিত আছে,

لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدَارِكُنِي بِأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ لَكُنْتُ بَدْعِيًّا.

“আল্লাহ তাআলা আবু হানীফা ও সুফিয়ান ছাওয়ারী সাহাবীর সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ করিয়ে না দিতেন, তাহলে আমি বিদআতী হয়ে যেতাম।”^{৪২১}

এতো এক সামান্য ফিরিস্তি দেওয়া হলো। যদি সবটুকু উল্লেখ করি, তবে প্রবন্ধের কলেবর অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই এতটুকু নির্দিধায় বলতে পারি যে, আবু হানীফা রহ. এর ইমামতের উপর উম্মতের ইজমা’ হয়ে গেছে।

^{৪১৯} তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৬।

^{৪২০} মানাকিবে আবু হানীফা, আল্লামা সামসুদ্দীন যাহাবী রহ. পৃ. ২৭।

^{৪২১} ফাযায়েলে আবী হানীফা, আবুল কাসিম ইবনুল আওয়াম পৃ. ৮৪।

আল্লামা হাফেজ ইবনে আদিল বার মালেকী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) তাঁর ‘আল-ইনতিকা ফী ফাযায়িলিল আয়িম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা’ কিতাবে আবু হানীফা রহ. এর ভূয়সী প্রশংসাকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরেছেন। এতে পূর্ববর্তী ৬৮ জন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ওলামায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করেছেন; যারা ছিলেন ইলমের বিভিন্ন শাখার স্তম্ভ। উক্ত কিতাবটির টীকায় শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ রহ. আরো দুজনের নাম উল্লেখ করে বলেন,

وأكثر ما حدد به العلماء التواتر عددا سبعون فقد بلغ الشاء على الإمام أبي حنيفة حد التواتر ولكن ممن؟ من خيار سلف هذه الأمة وعلمائها المشهود لهم بالدين والعلم والورع.

“ওলামাগণ তাওয়াতুরের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন ৭০, আর আবু হানীফা রহ. এর প্রশংসাও তাওয়াতুরের সর্বোচ্চ সংখ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে কাদের মাধ্যমে? উম্মতের পূর্ববর্তী সে সকল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এ সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে, যাদের দীনদারী, ইলম ও তাকওয়া চির স্মরণীয় হয়ে আছে।”^{৪২২}

পরবর্তী মুহাদ্দিসীদের দৃষ্টিতে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.:

চতুর্থ শতাব্দি পরবর্তী মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইমাম আবু হানীফা রহ. কে হাদীস বিশেষজ্ঞ মনে করতেন এবং তাঁদের অমর গ্রন্থসমূহে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর গুণকির্তন করেছেন।

স্মর্তব্য যে, ইমাম ইবনে আদিল বার রহ. ৪৬৩ হি.তে ইনতিকাল করেন, যার কারণে তার কিতাবে উল্লিখিত ৬৮জন মুহাদ্দিসের সকলেই ছিলেন তাঁর পূর্বযুগের। তাই সঙ্গত করণেই ইমাম ইবনে আদিল বার রহ. এর যুগ পরবর্তী ইমাম ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরামের নাম উক্ত কিতাবে আসেনি। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হল। যেমন:-

আবু সাআদ সামআনী (মৃ. ৫৬২ হি.), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.), ইবনুল কায়্যিম (মৃ. ৭৫৬ হি.), ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.), হাফেজ ইবনে কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি.), ইবনে হাজার আসকালানী, তাজউদ্দিন সুবকি (মৃ. ৭৭১ হি.), হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাবী (মৃ. ৯০২ হি.), ইবনে হাজার হাইতামী মাক্কী (মৃ. ৯৭৪ হি.), ইবনু আল্লামান শাফেয়ী

(মৃ. ১০৫৭ হি.), আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (মৃ. ৯৭৩ হি.), ইমাম আলাউদ্দিন কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.), ইবনুল আসীর আল-জাযারী (মৃ. ৬০৬ হি.), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী (মৃ. ৯১১ হি.), হাফেজ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শামী শাফেয়ী (মৃ. ৯৪২ হি.) (রাহিমাহুল্লাহ) সহ শত শত ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা অন্য মাযহাব ও ভিন্ন মানহাজের (মাশরাব) হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সুতরাং এটা স্বীকৃত বাস্তবতা যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিকহ ও হাদীস উভয় ক্ষেত্রেই ইমাম।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাসানীদ সংরক্ষণ:

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর যে সকল মুসনাদের নাম আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তার সংখ্যা ২৮/২৯টি। প্রকৃত সংখ্যার ব্যাপারে আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ইমামের সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এমন কিতাবকে মুসনাদ বলা হয়।

যারা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মুসনাদ সংকলন করেছেন, সে সব সৌভাগ্যবান মুহাদ্দিসগণ হলেন:-

১. হাফেজ মুহাম্মদ বিন মাখলাদ আদ-দুরী রহ. (মৃ. ৩৩১ হি.)।
২. হাফেজ ইবনে উকদাহ রহ. (মৃ. ৩৩১ হি.)।
৩. ইবনু আবীল আওয়াম রহ. (মৃ. ৩৩৫ হি.)।
৪. কাযী ওমর বিন হাসান বিন আলী আশনানী রহ. (মৃ. ৩৩৯ হি.)।
৫. বড় মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে আদী রহ. (মৃ. ৩৬৫ হি.) (আল-কামেল ফী দুআফায়ির রিজাল গ্রন্থকার)।
৬. হাফেজ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-হারেছী রহ. (মৃ. ৩৪০ হি.)।
৭. হাফেজ তালহা বিন মুহাম্মদ বিন জাফর আল-বাগদাদী (মৃ. ৩৮০ হি.)।
৮. হাফেজ ইবনুল মুযাফফার আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন মুযাফফার বিন মূসা আল-বাগদাদী রহ. (মৃ. ৩৭৯ হি.)।
৯. হাফেজ ইবনুল মুকরি/শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন আলী আল-আসবাহানী (মৃ. ৩৮১ হি.)।
১০. ইমাম দারাকুতনী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৩৮৫ হি.) (সুনানে দারাকুতনীর লেখক)।

১১. হাফেজ ইবনে শাহীন (মৃ. ৩৮৫ হি.) ।
 ১২. হাফেজ ইবনে মানদাহ রহ. (মৃ. ৩৯৫ হি.) ।
 ১৩. ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব আল বুসাইরী আল-মাওয়ারী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৪০৫ হি.) ।
 ১৪. ইমাম আবু নুআইম আল-আসবাহনী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৪৩০ হি.) ।
 ১৫. শায়খুল ইসলাম হাফেজ আবু ইসমাইল আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-আনসারী (মৃ. ৪৮১ হি.) ।
 ১৬. কাযী আবু বকর আব্দুল বাকী আল-আনসারী বাগদাদী হাম্বলী রহ. (মৃ. ৫৩৫ হি.) ।
 ১৭. হাফেজ ছিকাতুদ্দীন ইবনে আসাকির শাফেয়ী রহ. ।
 ১৮. হাফেজ ইবনে খসরু হানাফী রহ. (মৃ. ৫২২ হি.) ।
 ১৯. ইমাম আলী বিন আহমদ ইবনুল মাকী আর-রাযী হানাফী রহ. (মৃ. ৫৯০ হি.) ।
 ২০. হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাবী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৯০২ হি.) ।
 ২১. ইমামুল হারামাইন মুসনিদুদ দুনিয়া আবুল মাহদী ঈসা বিন মুহাম্মদ আল জা'ফরী আছ-ছাআলেবী রহ. (মৃ. ১০৮২ হি.) ।
 ২২. হাফেজ আবু আলী আল-বাকরী ।
- এছাড়াও মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শামী রহ. 'উকদুল জুমান' এর মাঝে আরোও কিছু মুসনাদের কথা উল্লেখ করেছেন ।
২৩. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী রহ. (মৃ. ২০৪ হি.) এর সূত্রে আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন হুবাইশ রহ. ।
 ২৪. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ সূত্রে আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন খালিদ আল-কালাজী রহ. ।
 ২৫. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সূত্রে কিছু মুহাদিসীনের মুসনাদ ।
 ২৬. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে শ্রবনকৃত কিছু মুহাদিসীনের মুসনাদ ।
 ২৭. ইমাম হাম্মাদ বিন আবী হানীফা রহ. এর সূত্রে কিছু মুহাদিসীনের মুসনাদ ।
 ২৮. ইমাম মুহাম্মদ রহ. বর্ণিত মুসনাদ, যা 'কিতাবুল আসার' নামে প্রসিদ্ধ ।

জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আযম প্রসঙ্গ:

ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ থেকে ১৫টি নুসখাকে একত্রিত করেছেন কাযিউল কুযাত, মুহাদিস আবুল মুআইয়াদ খুওয়ারেযমী রহ. (মৃ. ৬৫৫ হি.) 'জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আযম' নামে ।

কিতাবটি সংকলনের কারণ বর্ণনার্থে খুওয়ারেযমী রহ. ভূমিকায় লিখেন, (وقد سمعت) بالشام عن بعض الجاهلين أنه ينقصه (أي أبا حنيفة) ويستصغره ويستعظم غيره ويستحقره وينسبه إلى قلة رواية الحديث ويستدل باشتهار المسند الذي جمعه أبو العباس الأصم للشافعي وموطأ مالك ومسنند أحمد. وزعم أنه ليس لأبي حنيفة مسند وكان لا يروي إلا عدة أحاديث فلحقني حمية دينية ربانية وعصية حنفية نعمانية...

সারাংশ “আমি শাম দেশের কোন কোন অজ্ঞ লোককে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আবু হানীফার কোন মুসনাদ নেই। আর তিনি কেবল মুষ্টিমেয় কিছু হাদীসের বর্ণনাকারী... এ সমস্ত কথা শুনে আমার মাযহাবী আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগল। তাই আমি ইচ্ছে করলাম, বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক সংকলিত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পনেরটি মুসনাদ এক মলাটে একত্র করব।”^{৪২৩}

‘মুসনাদুল ইমামিল আযমের’ ইলমী অবস্থান প্রসঙ্গে:

গভীর বিশ্লেষণ করে দেখলে কেউ এই কিতাবের ব্যাপারে তুচ্ছ-জ্ঞান রাখতে পারে না। মুসনাদের ইলমী মান কত উর্ধ্ব তা আঁচ করা যায় ওলামায়ে কেরামের ভাষ্য থেকে। নিম্নে কিছু তুলে ধরা হল:-

এক. বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন জাফর কাত্তানী মালেকী রহ. (মৃ. ১৩৪৫ হি.) ‘আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ’ কিতাবে সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদে আযিম্মায়ে ছালাছা ও মুয়াত্তা মালেক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর লিখেছেন,

فهذه هي كتب الأئمة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأولى تكمل الكتب

العشرة التي هي أصول الإسلام وعليها مدار الدين.

“এগুলো চার (মাযহাবের) ইমামের কিতাব, এর পূর্বে আলোচিত ছয় কিতাবের সাথে এ কিতাবগুলোকে মিলালে দশটি কিতাব হয়। এ দশটি কিতাব ইসলামের মূল ভিত্তিগ্ৰন্থ এবং দীন-ইসলাম এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।”^{৪২৪}

^{৪২৩} উল্লেখ্য, ‘জামিউল মাসানীদ’ একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ। কারণ তিনি যদিও দাবি করেছেন এতে মুসনাদের পনেরটির সংখ্যা জমা করার, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

^{৪২৪} আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ পৃ. ১৬।

দুই. বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ও হাদীস পর্যালোচক আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হামযা হুসাইনী দিমাশকী রহ. ‘আত-তায়কিরাহ বি রিজালিল আশারাহ’ কিতাবের ভূমিকাতে বলেন,

مسند الشافعي موضوع لأدلة على ما صح عنده من مروياته وكذلك مسند

أبي حنيفة.

“মুসনাদে শাফেয়ী এমন বর্ণনার সংকলন, যা ইমাম শাফেয়ীর কাছে সহীহ বলে বিবেচিত। অনুরূপভাবে ‘মুসনাদে আবী হানীফা’র একই অবস্থা।”

তিন. শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদিসে দেহলভী রহ. স্পষ্ট বলেন,

مسند أبي حنيفة وأثر إمام محمد بن أبي حنيفة

“মুসনাদে আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ বর্ণিত ‘কিতাবুল আসার’ ফিকহে হানাফীর ভিত্তিতুল্য।”^{৪২৫}

চার. শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম আলেম আরেফ বিল্লাহ আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা’রানী রহ. (মৃ. ১৭৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘মীযানুল কুবরা’ তে ‘মাসানিদে আবী হানীফা’ সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বলেছেন,

كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তিনটি মুসনাদে যে হাদীসসমূহ আমরা পেয়েছি, তা সবই সহীহ।”^{৪২৬}

‘কিতাবুল আসার’ প্রসঙ্গ:

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর স্বরচিত ও অনবদ্য রচনা ‘কিতাবুল আসার’ সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন:-

১. কিতাবুল আসার ব্যতীত সুনান সংক্রান্ত হাদীসের যত কিতাব লিখা হয়েছে তার সংকলকদের কেউ তাবেঈ ছিলেন না। সুনান সংকলকদের ভেতরে তাবেয়ী হওয়ার ফযীলতটি একমাত্র ইমাম আবু হানীফা রহ. এরই অর্জিত হয়েছে।

২. ইমাম আযমের হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে পূর্ণ সতর্কতা ইলমে হাদীস মহলে বেশ পরিচিত।

ইমাম ওকী’ ইবনুল জাররাহ রহ. বলেন,

لقد وجد الورع عن أبي حنيفة في الحديث ما لم يوجد عن غيره.

^{৪২৫} কুররাতুল আইনাইন ফী তায়যীলিশ শাইখাইন পৃ. ১৭১।

^{৪২৬} আল-মীযানুল কুবরা পৃ. ৮৪।

“ইমাম আবু হানীফা রহ.এর হাদীসের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন।”^{৪২৭}

ইমাম আলী ইবনুল জা'দ রহ. (মৃ. ২৩৫ হি.) বলেন,

أبو حنيفة إذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, মনে হত যেন তিনি মুক্তো ছড়াচ্ছেন।”^{৪২৮}

৩. তারীখ ও রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের ইলমে হাদীসের উপর পাণ্ডুলিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, বিখ্যাত তাবেঈ হাম্মাম ইবন মুনাবিহ এর সহীফা ইত্যাদি। তবে এটি সত্য যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পূর্বে হাদীসের যত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, এগুলোর শাস্ত্রীয় বিন্যাস ছিলো না। বরং যে হাদীস তাদের স্মরণে বা কাছে ছিলো, সেগুলো তারা অবিন্যাস্তভাবে লিখে রাখতেন।

ইসলামের ইতিহাসে অধ্যায় পরিচ্ছেদ আকারে শাস্ত্রীয় বিন্যাসে রচিত প্রথম হাদীসের কিতাব ‘কিতাবুল আসার’ এবং এ বিষয়ে প্রথম সংকলকের মর্যাদা ও গৌরব একমাত্র ইমাম আবু হানীফা রহ. এরই অর্জিত হয়েছে। কিতাবুল আসারের বিন্যাস এতটাই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিলো যে, অদ্যবধি প্রচলিত ধারার যত হাদীসের কিতাব সংকলিত হয়েছে কিতাবুল আসারের বিন্যাসকে অনুসরণ করেই লিখা হয়েছে। তাই এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, প্রচলিত ধারার সুনান রচনাশৈলীর আবিষ্কারক ইমাম আবু হানীফা রহ.।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে ‘কিতাবুল আসার’ এর কিছু বৈশিষ্ট্য:

কিতাবুল আসারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করা হল:

এক. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. লিখেছেন,

من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا

ثم تبعه مالك ابن أنس في ترتيب الموطأ ولم يسبق أبا حنيفة أحد.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবন চরিতের স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য হল, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যে শরীয়তের ইলমকে সকলের পূর্বে সংকলন করেছেন এবং অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। পরে ইমাম মালেক বিন আনাস রহ. তাঁর ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এ

^{৪২৭} মানাকিবুল ইমামিল আযম, সাদরুন্না আয়িম্মা মাক্কী রহ. ১/৯৭।

^{৪২৮} জামিউল মাসানিদ, খুওয়ারেযমী ২/৩০৮।

বিন্যস্ততার অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পূর্বে কেউ অগ্রগামী হতে পারেনি।”^{৪২৯}

দুই. ইমাম আবু বকর আতীক বিন দাউদ ইয়ামানী রহ. বলেন যে,
 فَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ ضَمَّنَا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلَ مَنْ دَوَّنَهَا فَيَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ ضَمَّنَهَا ثُمَّ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ دَوَّنَهَا عَلَى خَطِّهَا.

“আল্লাহ তাআলা নিজে তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়তের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ শরীয়ত সংকলন করেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলা যে শরীয়ত হেফাজতের দায়িত্ব নিবেন আর সে শরীয়তের প্রথম সংকলক ভুল রচনা করবেন, এটা অসম্ভব বিষয়।”^{৪৩০}

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তার ‘উজালায়ে নাফে’ কিতাবে লিখেছেন,

صحيح بخارى وصحيح مسلم هر چند در بسط و كثرت احاديث ده چند موطا باشند ليكن طريق روايت

احاديث و تميز رجال و راه اعتبار و استنباط از موطا آموخته اند

“সহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যাপ্তি ও দীর্ঘতার দিক থেকে মুয়াত্তা মালেকের দশগুনেরও বেশি। কিন্তু হাদীস বর্ণনার পস্থা, রাবীদের পার্থক্য, ইতিবার ও ইস্তেমাতে বৈচিত্র মুয়াত্তা থেকেই তারা শিখেছেন।”^{৪৩১}

মুয়াত্তা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি বলেছেন,

اصل وام صحيحين است

“এটিই সহীহাইন তথা বুখারী মুসলিমের মূল ও মাতাস্বরূপ”।

আর ‘কিতাবুল আসার’ হচ্ছে মুয়াত্তার মূল ও উৎস গ্রন্থ, এ হিসেবে ‘কিতাবুল আসার’ হচ্ছে সহীহাইনের মায়ের মা।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল আযীয দারাওয়ারদী রহ. বলেন,

كَانَ مَالِكٌ يَنْظُرُ فِي كُتُبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ يَنْتَفِعُ بِهَا.

^{৪২৯} তাবরীযুস সাহীফা ফী মানাকিবী আবী হানীফা. পৃ. ৩৬।

^{৪৩০} মানাকিবুল ইমামিল আযম, সাদরুল আযিয়া মাক্কী, ২/১৭৩।

^{৪৩১} উজালায়ে নাফে, পৃ. ৫।

“ইমাম মালেক আবু হানীফা রহ. এর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতেন ও এর দ্বারা উপকৃত হতেন।”^{৪৩২}

সদরুল আয়িম্মাহ মুওয়াফফাক বিন আহমদ মাক্কী রহ. ‘মানাকিবুল ইমামিল আযম’ বর্ণনা করেন,

انتخب أبو حنيفة رحمه الله الآثار من أربعين ألف حديث.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. ৪০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে ‘কিতাবুল আসার’ সংকলন করেছেন।”^{৪৩৩}

ইয়াহইয়া বিন নসর ইবনে হাজেব রহ. বলেন,

سمعت أبا حنيفة يقول: عندى صناديق من الحديث، ما أخرجت منها إلا

الشيء اليسير الذى ينتفع به.

“আমি ইমাম আবু হানীফা রহ. কে বলতে শুনেছি যে, আমার কাছে হাদীসের অনেক সিন্দুক রয়েছে। কিন্তু আমি তার মধ্য থেকে উপকারে আসে এমন মুষ্টিমেয় হাদীসই প্রকাশ করেছি।”^{৪৩৪}

‘উকদুদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা’ গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজেবের উক্তি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوء كتباً فقلت: ما هذه؟ قال: هذه أحاديث

كلها، وما حدثت به إلا اليسير الذى ينتفع به.

“আমি আবু হানীফার একটি কিতাবভর্তি ঘরে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাকে বললাম, এগুলো কী? তিনি উত্তর দিলেন, এগুলো সবই হাদীস। তবে আমি এগুলো থেকে অল্পকিছু হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মানুষের প্রয়োজন পড়ে।”

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. ছয়লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে সহীহ বুখারী সংকলন করেছেন আর ইমাম আবু হানীফা রহ. মাত্র চল্লিশ হাজার হাদীস হতে ‘কিতাবুল আসার’ লিপিবদ্ধ করেছেন!

উত্তর: প্রথমত, ইমাম আবু হানীফা রহ. শুধু এতে আহকাম সংশ্লিষ্ট হাদীস এনেছেন, অন্যান্য হাদীস উল্লেখ করেননি যেমনটি ইমাম বুখারী রহ. করেছেন।

^{৪৩২} আখবারু আবী হানীফা, ইবনে আবিল আওয়াম, পৃ. ২৫৩।

^{৪৩৩} মানাকিবুল ইমামিল-আযম, সাদরুল আয়িম্মা মাক্কী ১/৯৫।

^{৪৩৪} মানাকিবুল ইমামিল-আযম, ১/৯৫।

দ্বিতীয়ত: ইমাম আবু হানীফা রহ. এর যুগে হাদীসের সনদ বা সূত্রের সংখ্যা ৪০/৫০ হাজারের বেশি ছিলো না। অর্থাৎ তাঁর যুগে সনদ ও বর্ণনাসূত্রের আধিক্য ও বিস্তৃতি সৃষ্টি হয়নি। তাই হাদীসের সংখ্যা কম ছিলো আর এ সংখ্যাটিই একশতক পেরিয়ে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর যুগে কয়েক লক্ষ হাদীসে পৌঁছায়। যেমন কোনো মুহাদ্দিস তার দশজন ছাত্রের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন আর এই হাদীসটিই দশটি সনদ তথা সূত্রে ইমাম বুখারীর কাছে পৌঁছল, তখন মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এই দশ সূত্রকে দশটি হাদীস বলা হবে। আপনি যদি ‘মুআত্তা মালেক’ ও ‘কিতাবুল আসার’ এর হাদীসগুলো অন্যান্য হাদীসের কিতাব থেকে বের করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, পূর্বোক্ত দু’ কিতাবের এক একটি হাদীসের ১০/২০ নয়, বরং শত শত সনদ বা সূত্র বের হয়ে আসবে।

এ সমস্ত আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. শুধু হাদীস বেশিই জানতেন না; বরং তিনি হাফেজে হাদীস ও প্রচলিত ধারার সুনানের কিতাব রচনার আবিষ্কারক এবং হাদীস জগতের সম্রাট ছিলেন।

মুহাদ্দিসীনে কেঁরাম কর্তৃক ইমাম আবু হানীফা রহ.কে ‘হাফেজুল হাদীস’ হিসেবে গণ্য করা:

যে সকল জগদ্বিখ্যাত ও সর্বমহলে সমাদৃত মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু হানীফা রহ. কে হাফেজুল হাদীসগণের মধ্যে গণ্য করেছেন, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হল। যেমন :-

এক. ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তার ‘তায়কিরাতুল হুফফাজ’ (১/১২৬ পৃ.) গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নাম হাফেজে হাদীসের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

দুই. হাফেজ ইবনে আদিল হাদী হাম্বলী রহ. তাঁর ‘আল-মুখতাসার ফী তাবাকাতি ওলামাইল হাদীস’ গ্রন্থে।

তিন. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. তাঁর ‘তাবাকাতুল হুফফাজ’ কিতাবে।

চার. হাফেজ ইবনে নাসির দেমাশকী রহ. তাঁর ‘বাদীআতুল বায়ান’ ও ‘আত-তিবয়ান লিবাদীয়াতিল বায়ান’ নামক হাফিজুল হাদীসের জীবন চরিত গ্রন্থদ্বয়ে।

পাঁচ. মুহাদ্দিস ইবনুল মিবরাদ হাম্বলী রহ. তার ‘তাবাকাতুল হুফফাজ’ গ্রন্থে।

ছয়. মুহাদ্দিস ইবনে রুস্তম ইবনে কুবাদ রহ. তার ‘তারাজিমুল হুফফাজ’ গ্রন্থে।

সুতরাং কিছু লোক ছাড়া সকলের সামনেই এটা সুস্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. হাফেজে হাদীস ছিলেন। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণের বক্তব্য জানার পর আপত্তিকারীদের অভিযোগের কি কোন মূল্য থাকে?!

হানাফী মাযহাবের মাসায়েল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়

প্রশ্ন :- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বর্ণিত মাসআলা ও হানাফী মাযহাবের সমাধান কি হাদীস পরিপন্থী? কোন ধরনের লোকেরা এ মনোভাব পোষণ করেন?

উত্তর :- হাল যমানায় কিছু মানুষের অভিযোগ যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাসায়েলসমূহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

অনেকেই বলে থাকেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রায় মাসআলায় হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। এ সব অভিযোগ এ কালের নতুন নয়, বরং পূর্ববর্তীদের অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরামও ভুল বুঝে এ জাতীয় কথা বলেছিলেন। তবে যারা এ বিষয়ে পূর্বে সমালোচনা করেছিলেন বা এখন করছেন এদের মাঝে কয়েক ধরনের লোক রয়েছে।

ক. কেউ মাযহাব ও তাকলীদ বিরোধী মনোভাব নিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার মুখরোচক শ্লোগান তুলে এমন অপবাদ ছড়াচ্ছে। সুস্পষ্ট গোমরাহীর কারণে এরা আমাদের আলোচনার বাহিরে। কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গি হারফিয়্যা তুন্নছ বা কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থেই সীমাবদ্ধ।

খ. আবার কেউ ‘তাআচ্ছুব’ বা মাযহাবী অন্ধানুকরণ ও গোঁড়ামীর কারণে এ ধরনের সমালোচনা করেছেন। ভিন্ন মাযহাবের প্রতি বিরূপ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে পূর্ববর্তী অনেক মুহাদ্দিসগণও পদস্থলনের শিকার হয়েছেন।

গ. কোন ইমাম (ইখতিলাফ ফী ফাহমিন নুসূস) নসের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝার ভিন্নতার কারণে অপর কোন ইমামের মতামত খণ্ডন করেছেন। উদাহরণত: হিজরী তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ আবু বকর ইবনে আবী শাইবা রহ. (মৃ. ২৩৫ হি.) ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতামত খণ্ডন করেছেন।

প্রশ্ন :- ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে ইবনে আবী শাইবার বক্তব্য কী? তা সঠিক না অমূলক বক্তব্য?

উত্তর :- হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে তার ‘আল মুসান্নাফ’ বেশ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, যা আহকাম সংক্রান্ত হাদীসে ভরপুর। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কোন মাযহাবের অগ্রাধিকার দেননি। বরং আহলে হেজাজ ও আহলে ইরাক প্রত্যেকের বর্ণনাকে পক্ষপাতহীনভাবে একত্র করেছেন। ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. তাঁর ‘আল মুসান্নাফ’ এর ২০ তম খণ্ডে আবু হানীফার মতামত খণ্ডন করার জন্য স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় লিখেছেন। যার নাম হচ্ছে,

هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“এ অধ্যায়টি এমন মাসায়েলের সমষ্টি, যাতে ইমাম আবু হানীফা রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের বিরোধিতা করেছেন।”

এ অধ্যায়টিতে ইবনে আবী শাইবা দাবি করেছেন যে, এখানে বর্ণিত ১২৫টি মাসআলা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আসারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। অথচ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ফতোয়া এর বিপক্ষে। ওলামায়ে আহনাফের অন্তরের প্রশস্ততা ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব দেখে হয়তো আশ্চর্য্য হবেন যে, তথাপিও তারা এ গ্রন্থটি এবং এর সংকলককে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি। বরং তাদের দৃষ্টিতে ইবনে আবী শাইবাও একজন ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কিছু মাসআলা খণ্ডন করেছেন, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই।

কারণ ইজতিহাদী মাসআলায় মতানৈক্য হতেই পারে। প্রত্যেক ফকীহেরই ভিন্নমত পোষণ করা এবং মাসআলা যাচাই ও পর্যালোচনার অধিকার রয়েছে। কোন শাস্ত্রে যদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে সে শাস্ত্র উন্নতি লাভ করতে পারে না। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকহের বিস্তৃতি ও উন্নতি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ইলমী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। এর কারণে নুসূসে ‘শরঈয়া’ হতে চিন্তা-ভাবনা এবং মাসআলা ইস্তেমাতের সবধরণের নিয়ম-পদ্ধতি ও মূলনীতি সুস্পষ্টরূপে উম্মতের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

ইবনে আবী শাইবার দাবি ও তার খণ্ডন:

ইমাম ইবনে আবী শাইবা ইমাম আবু হানীফার সাথে যে সকল মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছেন, তার সংখ্যা হচ্ছে ১২৫ টি। যদি

তর্কের খাতিরে মেনেও নেয়া হয়, সবকটিতে ইমাম আবু হানীফা রহ. ভুল করেছেন, তবুও দেখা যায়, ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত মাসআলার তুলনায় গড় হিসেবে এ সংখ্যা উল্লেখ করার মত নয়। কারণ ইমাম আবু হানীফার মাসায়েলের সংখ্যা প্রচুর।

আল্লামা আবুল ফযল কিরমানী রহ. (ইমামুল হারামাইনের সমকালীন আলিম) এর বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বর্ণিত মোট মাসআলার সংখ্যা প্রায় (৫০০০০০) পাঁচ লক্ষ। ‘ইশারাতুল মারাম’ এর মধ্যেও এটি বর্ণিত আছে।

হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ইনায়া’ গ্রন্থকারের মতে ফিকহে হানাফীর মাসায়েল সংখ্যা (১২৭০০০০) বার লক্ষ সত্তর হাজারের বেশি। (এ সংখ্যাটি আসল ও ফরা’ অর্থাৎ মূল ও শাখাগত মাসআলা সমষ্টি হিসেব করে নির্ধারিত হয়েছে।)

আরেক বর্ণনা মতে মাসআলার সংখ্যা (৮৩০০০) তিরিশি হাজার।

যদি আমরা স্বল্প সংখ্যা (৮৩০০০) ধরে হিসেব করি, তাহলে ইবনে আবী শাইবার দাবি মতে গড় হিসেবে প্রতি ৬৬৪ মাসআলায় একটি মাসআলা ভুল হয়। আর কিরমানী রহ. বর্ণিত মধ্যম সংখ্যা (৫০০০০০) ধরলে প্রতি ৪০০০ মাসআলাতে একটি মাসআলা ভুল হয়। আর ‘ইনায়া’ গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত সর্বোচ্চ সংখ্যা (১২৭০০০০) ধরে হিসেব করলে প্রতি ১০১৬০টি মাসআলাতে একটি ভুল হয়।

এর অর্থ এটাই দাঁড়ালো যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. বিশাল সংখ্যক (১০১৬০/৪০০০/৬৬৪) মাসআলায় সঠিক ছিলেন, আর এর বিপরীতে মাত্র একটিতে (ইবনে আবী শাইবার দাবি মতে) ভুল মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং (১০১৬০) দশ হাজার একশত ষাটটি মাসআলা সঠিক বর্ণনা করায় দুই গুন সাওয়াব পাবেন। আর একটাতে ভুল করার দরুন একগুণ সাওয়াব পাবেন।

এ তো ছিল ইবনে আবী শাইবার রহ. এর দাবি বিনা বাক্যে মেনে নিলে সে মতে হিসাব, কিন্তু আসলেই কি ইমাম আবু হানীফা রহ. উক্ত মাসআলাগুলোতে ভুল করেছেন?

এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পর যে বিষয়টি সামনে আসে, তার সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে উল্লেখ করা হল:-

ইবনে আবী শাইবার দাবিকৃত ১২৫টি মাসআলার অর্ধেক (৬২-৬৫) এমন, যেগুলোতে উভয় পক্ষে হাদীস বিদ্যমান। অর্থাৎ তিনি যেমন তার

পক্ষে হাদীস দেখিয়েছেন, তেমনি ইমাম আবু হানীফার পক্ষেও হাদীস রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই উজুহে তারজীহ (প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দানের শর্তাবলী) মোতাবেক এক হাদীসকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়ে নির্দিষ্ট মাসআলা গ্রহণ করেছেন। কাজেই এতে কাউকে হাদীস বিরোধী বলার সুযোগ নেই।

আর বাকি থাকল ৬০/৬৩টি। এগুলোর প্রায় ২৪টি মাসআলা এমন, যেখানে, ইবনে আবী শাইবা রহ. খবরে ওয়াহেদ পেশ করেছেন, আর ইমাম আবু হানীফা রহ. কুরআনের আয়াত ও খবরে মশহুর দিয়ে দলিল প্রদান করেছেন। তবে এটা আহলে ইলমের কাছে স্পষ্ট যে, খবরে ওয়াহেদের উপর কুরআনের আয়াত ও খবরে মশহুরই প্রাধান্য পাবে।

ইবনে আবী শাইবা রহ. প্রায় ১২টি এমন মাসআলা খণ্ডন করেছেন, যার সাথে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি এসব মাসআলা বলেছেন বলে কোনও প্রমাণ নেই এবং ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রায় ১২টি মাসআলা এমন, যাতে ফাহমুল হাদীস বা হাদীসের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সুস্পষ্ট সাল্য ওলামা মহলে বেশ প্রসিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ফকীহের সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য হবে।

তাছাড়া মুহাদ্দিসীনরা নিজেরাই ফকীহদেরকে অগ্রাধিকার দেন। যেমন, ইমাম আ'মাশ রহ. (৬১-১৪৮ হি.) ইমাম আবু হানীফা রহ.কে বলেছেন,

أَنتُمُ الْأَطْبَاءُ وَنَحْنُ الصِّيَادِلَةُ.

“তোমরাই হলে ডাক্তার, আর আমরা হলো ঔষধ বিক্রেতা।”^{৪৩৫}
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ.

“ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসের অর্থের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।”^{৪৩৬}

আর ১২টি মাসআলা এমন, যেগুলোতে আবু হানীফা রহ. এর ভুল হয়েছে। এই হচ্ছে ইমাম ইবনে আবী শাইবার অভিযোগের মূলচিত্র।^{৪৩৭}

প্রশ্ন :- কে কে ইবনে আবী শাইবার বক্তব্যের পূজ্যানুপূজ্য জবাব দিয়েছেন?

^{৪৩৫} আল-খায়রাতুল হিসান, পৃ. ৬১, ফাযায়েলে আবী হানীফা, পৃ. ১০২।

^{৪৩৬} সুনানে তিরমিযী ১/১১৮।

^{৪৩৭} দেখুন, যাহেদ কাউসারী রহ. রচিত আন-নুকাতুত তারীফা এর ভূমিকা পৃ. ৪-৫।

উত্তর :- যারা ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবার এই অভিযোগের বিস্তারিত জবাব সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো:-

এক. হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী (মৃ. ৭৭৫ হি.) ‘আদ-দুরারুল মুনীফা ফির রাদি আলা ইবনে আবী শাইবা আন আবী হানীফা’ গ্রন্থে। এ কিতাবটির কথা আল্লামা কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ. ‘তাজুত তারাজিম’ পৃ. ১৯৬ ও আল্লামা সালেহী শামী রহ. ‘উকদুল জুমান’ পৃ. ৩৯৭-৪০৩ তে উল্লেখ করেছেন।

দুই. আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৯৪২ হি.) যা তিনি ‘উকদুল জুমান ফী মানাকিবি আবী হানীফাহ আন-নু’মান’ (৪০৩ পৃষ্ঠা) এর মাঝে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

قلت شرعت في المسودة في رده (رد صنيع ابن أبي شيبة) على سبيل التفصيل فأجبت عن عشرة أحاديث فرأيت أن ذلك في مجلدين كبيرين — وأنا مشغول بتحرير كتابي "سبل الهدى الرشاد" فأخرت الكلام على أحاديث ابن أبي شيبة...

“আমি পাণ্ডুলিপিতে ইমাম ইবনে আবী শাইবার অভিযোগের বিস্তারিত খণ্ডন করতে শুরু করেছিলাম এবং ইতোমধ্যে দশটি হাদীসের পূর্ণাঙ্গ জবাব লেখার পরে দেখলাম, তাতেই বেশ বড়সড় দুই খণ্ড হয়ে গেছে। অপরদিকে আমি ‘সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ’ নামক কিতাব লিখায় ব্যস্ত ছিলাম, তাই ইবনে আবী শাইবার জবাবের বিষয়টি একটু পিছিয়ে দিলাম...”

তিন. হাফেজ কাসিম বিন কুতলুবুগা রহ. (মৃ. ৮৭৯ হি.) ‘আল-আজয়িবা আন ই’তিরায়ি ইবনে আবী শাইবা’ গ্রন্থে এ অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। এ কিতাবটির কথা তাঁর শিষ্য আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. (মৃ. ৯০২ হি.) ‘আদ-দওউল লামে’ গ্রন্থে ৬/১৮৫তে উল্লেখ করেছেন।

চার. আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. (মৃ. ১৩৭১ হি.) ‘আন-নুকাতুত তারীফা ফিত তাহাদ্দুসি আন রুদুদি ইবনে আবী শাইবা আলা আবী হানীফা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান পূর্ণাঙ্গ জবাবের শুধু এই কিতাবটিই পাওয়া যায়।

পাঁচ. শায়খ ড. আব্দুল মাজিদ মাহমুদ হাফিযহাফ্ফাহ ‘আল ইত্তিজাহাতুল ফিকহিয়া ইনদা আসহাবিল হাদীস ফিল কারনিস সালিস আল-হিজরী’ গ্রন্থের ৪৬৩-৫৭৩ পৃষ্ঠাতে সংক্ষিপ্তরূপে জবাব দিয়েছেন।

ছয়. ড. মুহাম্মদ কাসেম আবদুল হারেছি হাফিয়াল্লাহ 'মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদিসীন' গ্রন্থের ৩১৮-৫০৬ পৃষ্ঠাতে প্রত্যেকটি অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব লিখেছেন।

প্রশ্ন :- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতো অন্য কোন ইমাম সম্পর্কেও কি হাদীস বিরোধিতার অপবাদ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর :- শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ. নয়; বরং মুতাকাদিমীনের অনেক ফকীহ ইমাম সম্পর্কেও হাদীস বিরোধিতার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল:-

এক. ইমাম লাইস ইবনে সা'দ (মৃ. ১৬৩ হি.) বলেন, আমি ইমাম মালেকের সত্তরটি মাসআলা এমন পেয়েছি, যার সবকটিতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি এ বিষয়টি আমি তাকে লিখেও পাঠিয়েছি।^{৪৩৮}

দুই. ইমাম শাফেয়ী রহ. (মৃ. ২০৪ হি.) ইমাম মালেক রহ. এর মাসআলাকে খণ্ডন করে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর অনেক মাসআলা সুস্পষ্ট সুন্নাহ বিরোধী। এ ব্যাপারে ইমাম রাযী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'মানাকিবুশ শাফেয়ী'তে আলোচনা করেছেন।

তিন. ইবনে হাযম যাহেরী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'মারাতীবুদ দিয়ানাহ'তে লিখেন যে, 'মুআত্তা'র মাঝে সত্তরেরও বেশি এমন হাদীস আছে, যার উপর স্বয়ং ইমাম মালেক রহ. আমল করেননি।^{৪৩৯}

কিন্তু এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, এ সমস্ত ইমামগণ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। যদি বাস্তবে এমনটি হতো, তবে ইমামগণের ইমামত তো দূরের কথা, তাদের ইসলাম নিয়েই সন্দেহ-সংশয় দেখা দিতো।

তবে প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলো ইজতিহাদী মাসায়েল। তাই কোন বর্ণনা এক ইমামের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে, তা অপর ইমামের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া আবশ্যিক নয়। হতে পারে প্রত্যাখ্যানকারী ইমামের নিকট নিজ ইলম অনুযায়ী হাদীসটিতে কোন ত্রুটি ধরা পড়েছে বা তাহকীক-তাদকীক করে তাকে মানসূখ মনে হয়েছে, অথবা তার নিকট হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণীয় মনে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে আব্দিল বার মালেকী রহ. এর কথাটি উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন,

^{৪৩৮} জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফায়লিহী ২/১৪৮।

^{৪৩৯} তাদরীবুর রাবী, পৃ. ২৩; তা'জীলুল মানফাআ, পৃ. ৪।

لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ يُثْبِتُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَرُدُّهُ دُونَ ادِّعَاءِ نَسْخِ ذَلِكَ بِأَثَرٍ مِثْلِهِ، أَوْ يَجْمَعُ أَوْ يَعْمَلُ يَجِبُ عَلَى أَصْلِهِ الْإِقْيَادُ إِلَيْهِ، أَوْ طَعْنٍ فِي سَنَدِهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ سَقَطَتْ عِدَالَتُهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَّخَذَ إِمَامًا، وَلَزِمَتْهُ اسْمُ الْفَسْقِ، وَلَقَدْ عَافَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

“উম্মাহর ওলামায়ে কেরামের কারোও অধিকার নেই যে, কোনও হাদীসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত মেনে নেয়ার পরে কোন প্রকার নাসখ বা রহিত করণের দাবি ছাড়া তাকে অগ্রহণযোগ্য বলবে। চাই নাসখটি অন্য হাদীস দ্বারা হোক বা ইজমা দ্বারা ... কিংবা হাদীসটির সনদের মাঝে কোন ত্রুটি থাকে। কেননা এর বিপরীত যদি কোন ইমাম করে, তাহলে তার ইমামত তো দূরের কথা আদালত বা ন্যায় পরায়ণতাই নষ্ট হয়ে যাবে, বরং তার নামের সাথে ‘ফাসেক’ শব্দটি জুড়ে দেয়া হবে। আর এটা সন্দেহাতীত যে, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এমন কাজ থেকে হেফাজত করেছেন।”^{৪৪০}

প্রশ্ন :- ইমাম চতুষ্ঠয় ও অন্য মুজতাহিদগণ হাদীসের বিরোধিতা করেননি; বরং হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন, এই মর্মে সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য কি?

উত্তর :- ইমাম আবু হানীফা ও অন্য আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন হাদীসের বিরোধিতা করেননি- এই মর্মে সালাফ ও খালাফ ওলামায়ে কেরামের কিছু উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল:-

এক. আল্লামা সুলায়মান তুফী হাম্বলী রহ. স্বীয় গ্রন্থ ‘শরহ মুখতাসারির রওয়া’ কিতাবে কিয়াসবিরোধীদের আলোচনায় বলেন,

وجملة القول فيه: أنه قطعاً لم يخالف السنة عناداً، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهاداً لحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابتة أجران، والطاعنون عليه إما حساد، أو جاهلون بمواقع الاجتهاد.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে সারকথা হচ্ছে, তিনি কখনো সুন্নাহর খেলাফ করেননি। বরং (ব্যাখ্যিকভাবে যা প্রতীয়মান হয় যে,) ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীসের বিরোধিতা করেছেন, তা সুস্পষ্ট দলিল

ও যুক্তি সঙ্গত উপযুক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে ইজতিহাদের কারণে করেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দলিল প্রমাণাদী মানুষের নিকট বিদ্যমান আছে। এ ক্ষেত্রে বিরোধীদের মাঝে খুব কম লোকই ইনসাফ ও ন্যায্য সঙ্গত কাজ করেছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. ইজতিহাদে ভুল করলে এক সাওয়াব এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দ্বিগুন সাওয়াব পাবেন। ইমাম আযমের সমালোচকরা হয়তো হিংসুটে কিংবা ইজতিহাদ বিষয়ে অজ্ঞ।”^{৪৪১}

দুই. খতীব বাগদাদী রহ. ইবনে কারামাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ওকী’ ইবনুল জাররাহ রহ. এর মজলিসে ছিলাম। সেখানে একলোক দাড়িয়ে বললো, ইমাম আবু হানীফা রহ. কিছু মাসআলায় ভুল করেছেন। এ কথা শুনে ওকী’ ইবনুল জাররাহ রহ. বললেন,

كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ ومعه مثل أبي يوسف، وزفر في قياسهما، ومثل يحيى بن أبي زائدة، وحفص بن غياث، وحبان، ومندل في حفظهم الحديث، والقاسم بن معن في معرفته باللغة العربية، وداود الطائي، وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ من كان هؤلاء جلساؤه لم يكذب يخطئ؛ لأنه إن أخطأ رده.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. কীভাবে ভুল করতে পারেন! অথচ তাঁর পাশে কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফারের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। হিফজে হাদীসের ক্ষেত্রে ইয়াহইয়া আবী যায়েদা, হাফছ বিন গিয়াস, হিব্বান ও মিনদিল বিন আলীর মত ব্যক্তিত্ব আছেন। আরবী ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাসেম বিন মাআনের মতো ব্যক্তি আছেন। খোদা-ভীরুতা ও ধর্মানুরাগে দাউদ তায়ী ও ফুযাইল বিন ইয়াযের মত ব্যক্তিত্ব আছেন। যার পাশে এ সকল শিষ্য ও সহচরবৃন্দ রয়েছেন, তিনি কখনো মাসআলা বর্ণনায় ভুল করতে পারেন না। তিনি যদি ভুল করতেন, তবে এ সকল ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই তা শুধরে দিতেন।”^{৪৪২}

ড. মোস্তফা সিবাঈ রহ. এর কথা আবারো উল্লেখ করছি। তিনি ‘আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা’ গ্রন্থে বলেন,

“যে ব্যক্তি ইমাম আযমের মাযহাবকে ভাল করে অধ্যয়ন করবে, সে এ মাযহাবের শত শত মাসায়েলকে সহীহ হাদীস মোতাবেক পাবে। কামূস ভাষ্যকার (‘তাজুল আররুস’ গ্রন্থকার) সাইয়্যেদ মুর্তাযা যাবীদী রহ. (ম্.

^{৪৪১} শরহ মুখতাসারির রওয়া ৩/২৯০।

^{৪৪২} তারিখে বাগদাদ ১৪/২৪৭

১১৪৫-১২০৫ হি.) ইমাম আযমের মুসনাদসমূহ থেকে ঐ সমস্ত হাদীসকে একত্র করে একটি কিতাব সংকলন করেছেন, যে হাদীসগুলোর বর্ণনাতে হাদীসের ছয় কিতাব গ্রন্থকারগণ একমত হয়েছেন। গ্রন্থটির নাম হচ্ছে, 'উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফাহ'। সুতরাং ইমাম আযমের ইজতিহাদগুলো কীভাবে শত শত সহীহ হাদিসের মোতাবেক হলো? অথচ (তোমরা তো বলো) ইমামের নিকট তো ১৭/৫০/১৫০টি হাদীস ছিল, যার অর্ধেকই তিনি ভুল করেছেন।”^{৪৪৩}

মাসউদুর রহমান

^{৪৪৩} আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীয়'ল ইসলামী, পৃ. ৩৭২।

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ হাদীস কি (যয়ীফ) দুর্বল?

প্রশ্ন :- হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ হাদীস কি দুর্বল?

উত্তর :- ‘হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ হাদীস দুর্বল’- এ অভিযোগ সঠিক নয়। এর দ্বারা আহলে হাদীস ভাইয়েরা সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়!

এ প্রসঙ্গে শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা’রানী রহ.(মৃত্যু ৯৭৩ হি.) বলেন,

اعلم يا أخي! أنني طالعت بحمد الله تعالى أدلة المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإني خصصته بمزيد اعتناء، وطالعت عليه كتاب "تخريج أحاديث كتاب الهداية" للحافظ الزيلعي وغيره من كتب الشروح، فرأيت أدلته رحمه الله وأدلة أصحابه ما بين صحيح، أو حسن، أو ضعيف كثرت طرقه حتى لحق بالحسن، أو الصحيح في صحة الاحتجاج به من ثلاثة طرق وأكثر إلى عشرة، وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه، وألحقوه بالصحيح تارة وبالحسن أخرى.

وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا في كتاب "السنن الكبرى" للبيهقي التي ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهم؛ ...

وقد قدمنا أني لم أجب عن الإمام أبي حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظن كما يفعل ذلك غيري، وإنما أجيب عنه بعد التبع والفحص عن أدلة أقواله وأقوال أصحابه،

وكتابي المسمى بـ "المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين" كافل بذلك؛ ..

“আমি চার মাযহাব বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের দলিল-প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছি। এবং ইমাম য়াযলাঈ রহ. কর্তৃক লিখিত হেদায়া কিতাবের তাখরীজ ‘নাসবুর রায়া’ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করে দেখলাম, হানাফী মাযহাবের দলিল-প্রমাণ সহীহ ও কিছু হাসান পর্যায়ের। আর এমন কিছু যয়ীফ হাদীস, যা এক থেকে দশটি সূত্রে

বর্ণিত হওয়ায় তা সহীহ বা হাসানরূপে গণ্য হয়। আর এই ধরনের হাদীস দ্বারা জুমহুর মুহাদিসগণ দলিল পেশ করে থাকেন।

ইমাম বায়হাকী রহ. এর ‘সুনানে কুবরা’তে অধিক পরিমাণে এই প্রকারের যঈফ হাদীস বিদ্যমান।...”^{৪৪৪}

এ সম্পর্কে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন,

يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات وبالأخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ আমলকে দলিল ও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেন।”^{৪৪৫}

এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় এভাবে, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ., যিনি সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য মুহাদিস। তার ফিকহী সমাধানগুলো ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহী সমাধানগুলোর সাথে মিলে যায়, কেবল ১৫ টি সমাধানে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।^{৪৪৬}

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা রহ. যে সকল হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে মাসআলা বলেছেন, সেই একই হাদীসকে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ.ও দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং এ সকল হাদীস যদি দূর্বল হত, তাহলে সুফিয়ান ছাওরী রহ. তা কখনও গ্রহণ করতেন না।

এই বিষয়ে খাতামুল মুহাদিসীন আল্লামা কাশিরী রহ. বলেন,

“আমি ৩০ বছর অধ্যয়নের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, হানাফী মাযহাবের দলিলগুলো অন্যান্য মাযহাবের দলিলের সমমানের বা তার চেয়ে উর্ধ্ব, শুধু দু’টি মাসআলায় ব্যতিক্রম।”^{৪৪৭}

ড. মোস্তফা সিবাঈ রহ. তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘আস-সুনাতু ওয়া মাকানাতুহা’ এর মধ্যে বলেন,

“যে ব্যক্তি ইমাম আযমের মাযহাবকে ভাল করে অধ্যয়ন করবে, সে এ মাযহাবের শত শত মাসায়েলকে সহীহ হাদীস মোতাবেক পাবে।”^{৪৪৮}

^{৪৪৪} আল-মীযানুল কুবরা পৃ. ৮২-৮৫।

^{৪৪৫} আল-ইনতিকাহ ফী ফাযাঈলিস-সালাসাহ, পৃ. ১৪৩

^{৪৪৬} তবাকাতুল মুহাদিসীন বি-আসবাহান ২/২১৭।

^{৪৪৭} নকশে দাওয়াম, পৃ. ১৭৫।

^{৪৪৮} আস-সুনাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়’ল ইসলামী, পৃ. ৩৭২।

এই ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টি ইজতিহাদ নির্ভর হওয়ার কারণে প্রত্যেক ইমামের আলাদা মূলনীতি রয়েছে। কোনও বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ থাকার মানেই হল, সেখানে মতবিরোধ হওয়া এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকা।

এই বিষয়ে নিম্নে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে:-

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره... وللعلماء بالرجال وأحوالهم في

ذلك من الإجماع والاختلاف, مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.

“হাদীস দুর্বল হওয়ার বিষয়টি ইজতিহাদী বা গবেষণামূলক। তাতে অন্যদের জন্য মতবিরোধ করার সুযোগ রয়েছে।”^{৪৪৯}

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى

ذلك من العلم...

“ইমামগণ রাবী বা বর্ণনাকারীদের মান নির্ণয়ের বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যেমনিভাবে শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ করেছেন।”^{৪৫০}

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, হাদীস ও রাবীর সহীহ-যঈফ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার মূলনীতিসমূহ ইজতিহাদ ও গবেষণা নির্ভর।

এছাড়া ফকীহ ইমামের হাদীস গ্রহণ-বর্জন বিষয়ে স্বতন্ত্র মূলনীতি রয়েছে, যা মুহাদিসদের মূলনীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. বলেন,

ليس طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث ولا نعلم أحدا

من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردّها ولا اعتبر أصولهم فيها.

“হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ফুকাহাদের পদ্ধতি মুহাদিসগণের পদ্ধতির মতো নয়। আমরা কোনো ফকীহের ব্যাপারে এই কথা শুনি নি যে, সে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে মুহাদিসগণের পদ্ধতির দ্বারস্থ হয়েছেন।”^{৪৫১}

^{৪৪৯} রফউল মালাম, পৃ. ১৯-২০।

^{৪৫০} ইলালুস সাগীর ১/৭৫৬।

^{৪৫১} শরহ মুখতাসারুত তাহাবী ৪/২৪৪।

সুতরাং কোনো হাদীস একজন ফকীহের নিকট সহীহ। কিন্তু মুহাদ্দিসের নিকট সহীহ নাও হতে পারে। তাই এটা বলা সঠিক হবে না যে, ‘তার গবেষণা-আমল যঈফ হাদীসের ভিত্তিতে ছিলো’।

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. এর বক্তব্যটি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, তারা এমন কথা বলে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা শা’রানী রহ. বলেন,

“ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর দলিলগুলোতে যে দুর্বলতা এসেছে তার কারণ হলো, তার পরবর্তী রাবীগণের দুর্বলতা।” এরপর বলেন,

كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح.

“ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তিন মুসনাদে যে হাদীসসমূহ আমরা পেয়েছি, তা সবই সহীহ।”^{৪৫২}

শায়খ মোল্লা খাতির রহ. বলেন,

إن الفقهاء الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المتبوعين كلهم كانوا قبل

أصحاب الكتب الستة ...

“নিশ্চয় সম্মানিত ফকীহগণ, যাদের অগ্রভাগে রয়েছেন অনুসরণীয় চার ইমাম (আবু হানীফা, মালেক, আহমদ ও শাফেয়ী রহ.) তাঁরা প্রত্যেকেই ‘সিহাহ সিভাহ’ সংকলকগণের পূর্ব যুগের। তাই তারা নিজের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীগণের সনদে হাদীস বর্ণনা করেননি। এই ইমামগণের নিকট অনেক হাদীস ছিলো, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা শরীয়তের অনেক মাসআলা পেশ করেছেন।...”^{৪৫৩}

ওয়ালী উল্লাহ

^{৪৫২} আল-মীযানুল কুবরা পৃ. ৮৪।

^{৪৫৩} মাকানাতুস সহীহাইন পৃ. ৫১৩।

ইলমে হাদীস ও কূফা নগরী ইমাম বুখারী ও মাযহাবে হানাফী

ইমাম বুখারী রহ. ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য যেসব শহরে গিয়েছেন, তার মাঝে কূফা নগরীতে তিনি সবচেয়ে বেশি গিয়েছেন। সেখান থেকে সবচেয়ে বেশি ইলম অর্জন করেছেন। এজন্য বুখারীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কূফী রাবী (কূফার অধিবাসী হাদীসের বর্ণনাকারী) বিদ্যমান। অথচ কূফার বিরুদ্ধাচারণকারীরা কার বিরুদ্ধাচারণ করছে নিজেরা বুঝতেও পারছে না।

কূফাকে আবাদকারী হলেন হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস। আবাদের নির্দেশদাতা হলেন হযরত ওমর রা.। আবাদ করার জন্য প্রথম আমীর হিসেবে কূফায় আসেন আম্মার বিন ইয়াসির রা.।

কূফার প্রথম শিক্ষক হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং যারা প্রথমে আবাদ করেছেন, তাদের ১০৫০ সাহাবীদের মাঝে ৭০ জনই বদরী সাহাবী। আর ৩১৩ জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ আদায়কারী সাহাবী।

সুতরাং কূফার বদনাম করলে মূলত কার বদনাম করা হয়? বদনাম তো প্রতিষ্ঠানের হয় না, হয় প্রতিষ্ঠাতার। তাহলে কূফার বদনাম করা মানে হল কূফার প্রতিষ্ঠাতার বদনাম করা।

আহলে হাদীস ভাইয়েরা একটি খোড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে থাকে যে, কূফাতে হযরত হুসাইন রা. শহীদ হয়েছেন তাই এটি অভিশপ্ত ভূমি।

কোনো এলাকায় আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা শহীদ হলে বা কষ্ট পেলে সে স্থান যদি অভিশপ্ত হয়, তাহলে মক্কা-মদীনাও অভিশপ্ত হয়ে যাবে, নাউযুবিল্লাহ। কারণ মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। ওহুদে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিহরাবে হযরত ওমর রা. শহীদ হয়েছেন। মদীনায় হযরত ওসমান রা. শহীদ হয়েছেন। তায়েফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর আক্রমণ হয়েছে।

এখন বলুন, মক্কা-মদীনা, উহুদ, তায়েফের বদনাম করাটা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ? তেমনি হযরত হুসাইন রা. শহীদ হওয়ার কারণে কূফার

বদনাম করা যাবে না। যারা শহীদ করেছেন তাদের বদনাম হতে পারে, কিন্তু যেখানে শহীদ হয়েছেন সে স্থানের বদনাম করাটা যুক্তিযুক্ত নয়।

এবার দেখুন কূফা নগরীতে ইলমে হাদীসের কেমন চর্চা ছিল। ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেন,

دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. (مقدمة فتح الباري، ذكر نسبه ومولده ومنشئه ومبدأ طلبه للحديث ص ٦٧ دار الحديث).

“আমি সিরিয়া, মিশর ও জাযীরাতুল আরবে গিয়েছি ২ বার। বসরাতে গিয়েছি ৪ বার। এবং হেজাযে অবস্থান করেছি ৬ বছর। আর কতবার যে কূফা আর বাগদাদে মুহাদ্দিসদের সাথে গিয়েছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।”^{৪৫৪}

ইমাম বুখারী রহ. হেজাযে কতদিন ছিলেন মনে আছে, মিশর, সিরিয়া ও জাযীরাতুল আরবে কতবার গেছেন মনে আছে। কিন্তু কূফা আর বাগদাদে কত বার গেছেন তা আধিক্যের কারণে তিনি ভুলেই গেছেন।

এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, কূফা নগরীতে ইলমে হাদীসের কত বেশি চর্চা ছিল এবং কূফার সাথে ইমাম বুখারী রহ. এর ইলমী নিসবত কতটা গভীর ছিল। এ কারণেই বুখারী শরীফের এমন পৃষ্ঠা খুব কমই আছে যাতে কূফী বর্ণনাকারী নেই। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কূফী রাবী। এটাও সুস্পষ্ট প্রমাণ ইমাম বুখারী কূফার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ। তাই ইমাম বুখারী হানাফী মাযহাবের প্রাণকেন্দ্রের ভক্ত ও ঋণী।

ইমাম হাকেম রহ. ‘মা’রিফাতু উলুমিল হাদীস’ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

قال الإمام الحاكم رحمه الله في أول "ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث": هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ، والمذاكرة، والتبرك بهم، وبذكرهم من المشرق إلى الغرب. فذكر من أهل المدينة المنورة ٤٠ راويًا، ومن أهل مكة المكرمة ٢١ راويًا، وذكر من أهل كوفة ٢٠١ راويًا وعدة من بينهم الإمام أبا حنيفة.

“এই অধ্যায়ে তিনি পূর্ব-পশ্চিমের প্রাসঙ্গ ‘ছিকাহ’ তাবেয়ী ও তাবয়ে- তাবেয়ীদের আলোচনা করেছেন, যাদের হাদীসকে জমা করা হয় মুখস্ত ও মুযাকারার জন্য এবং যাদের আলোচনা করা হয় বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওয়ার ৪০ জন রাবীকে (হাদীস বর্ণনাকারী) উল্লেখ করেন। এবং মক্কা মুকাররমার ২১ জনকে। আর কূফার ২০১ জন রাবীকে উল্লেখ করেন, এবং তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নামও উল্লেখ করেছেন।”

প্রিয় পাঠক! যদি কূফাতে ইলমে হাদীস না থাকে বা কম থাকে, (যা কারো কারো ধারণা) তাহলে ইমাম বুখারী রহ. এতবার সফর করলেন কেন? এভাবে ইমাম হাকেম রহ. যেখানে মদীনা মুনাওয়ার ৪০ জন এবং মক্কা মুকাররমার ২১ জন রাবীকে উল্লেখ করলেন, সেখানে কূফার ২০১ জন রাবী পেলেন কীভাবে?

তাছাড়া ইমাম বুখারী রহ. এর বুখারী শরীফের দিকে আমরা একটু নজর দেই। বুখারীতে শাওয়াহেদ, মুরসালসহ সর্বমোট ৯০০৮২ বর্ণনা আছে। সনদের মাঝে বুখারী রহ. যার কাছ থেকে হাদীস নিয়েছেন তিনি হলেন ইমাম বুখারী রহ. এর শায়খ। আর সনদের সর্বশেষে যিনি হন তিনি হন সাহাবী। বুখারীতে এমন বর্ণনা অনেক আছে, যাতে ইমাম বুখারীর শায়খও কূফী এবং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীও কূফাতে অবস্থানকারী। শুধু তাই নয়, এমন বর্ণনাও আছে যার প্রতিটি বর্ণনাকারী কূফী। যেমন-

حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال

عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم لا أدري - زاد أو نقص

الخ (صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم الحديث ৩৭২)

বুখারীর এ বর্ণনাটিতে লক্ষ্য করুন, ইমাম বুখারীর শায়খ ওসমান, তার শায়খ জারীর, তার শায়খ মানসুর, তার শায়খ ইবরাহীম নাখরী, তার শায়খ আলকামা, তার শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.।^{৪৫৫}

এ হাদীসের সনদে ৬ জন রাবী আছে, আর ৬ জনই কূফী রাবী। শুধু কি তাই? বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীসের সনদের দিকে লক্ষ্য করুন,

حدثنا أحمد بن إشبك حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن

أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

এ হাদীসের সনদে শুধুমাত্র হযরত আবু হুরায়রা রা. ছাড়া বাকি সকল রাবী কুফী। আহমদ বিন ইশকাব, মুহাম্মদ বিন ফুযাইল, উমারা বিন কা'কা' ও আবু যুরআ সবাই কুফী।

আরো দেখুন, ইমাম বুখারী রহ. বুখারীতে যেসব হাদীস এনেছেন সনদ সহকারে, তাতে ৫ রাবীর সনদও আছে, ৪ রাবীর সনদও আছে এবং আছে ৩ রাবীর সনদও। ইমাম বুখারী রহ. এর সবচেয়ে গর্ব হল ৩ রাবীর সনদের উপর। এবার দেখুন সেসব সুলাসিয়াত বা ৩ শুধু রাবীর সনদের কী হাল?

বুখারীতে মোট সুলাসিয়াত হল ২২ টি। এ ২২টি সুলাসিয়াতের ১১টির সনদে ইমাম বুখারী রহ. এর শায়খ হলেন, মক্কী বিন ইবরাহীম। আর তিনি হলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র।

৬ টি হাদীসের বর্ণনাকারী রাবী হলেন, আবু আসেম আন-নাবীল রহ.। তিনিও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র।

এতে ৩টি হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন আদিল্লাহ আনসারী। তিনিও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র।

এর মাঝে একটি হাদীসের বর্ণনাকারী রাবী হযরত হাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া রহ.। তিনি কুফী তথা কুফায় অবস্থানকারী ব্যক্তি।

আর একজন বর্ণনাকারী হলেন, ইসাম বিন খালেদ আল-হিমসী। যিনি হিমসের অধিবাসী।

এবার লক্ষ্য করুন! ইমাম বুখারী রহ. এর যে সুলাসিয়াতের উপর গর্ব, সেই ২২ টি সুলাসিয়াতের ২০টির বর্ণনাকারী ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র। আর ১টি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিজের এলাকা কুফার। আর একজন শুধুমাত্র হেমসের অধিবাসী।

এভাবে ইমাম বুখারী রহ. থেকে তাঁর কিতাব ৯০ হাজার ছাত্ররা পড়েছেন। কিন্তু বুখারী শরীফের সনদ প্রসিদ্ধ চারজনের মাধ্যমে। যথা-

১. ইবরাহীম বিন মা'কিল বিন হাজ্জাজ আন-নাসাফী রহ.। তিনি ২৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

২. হাম্মাদ বিন শাকের আন-নাসাফী রহ., যিনি ৩১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

৩. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী রহ. । তিনি ৩২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন ।

৪. আবু তালহা মানসুর বিন মুহাম্মদ রহ. । তিনি ২৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন ।

লক্ষ্য করুন! ৯০ হাজার ছাত্রদের মাঝে যে চারজনের সনদে বুখারী প্রসিদ্ধ হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম দুইজন তথা ইবরাহীম রহ. ও হাম্মাদ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মুকাল্লিদ ও অনুসারী ।

তাহলে বুঝা গেল, ইমাম বুখারী রহ. এর বুখারী শরীফ যে চারজনের মাধ্যমে বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে, তন্মধ্যে দুইজন হানাফী ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মুকাল্লিদ ও অনুসারী ।

আমজাদ হোসাইন

হানাফীরা মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ ও তার জবাব

প্রশ্ন :- হানাফীরা কি মুরজিয়া?

উত্তর:- হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ মুরজিয়া নয়, বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর একান্ত অনুসারী।

প্রশ্ন:- হানাফীরা মুরজিয়া না হলে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে মুরজিয়া কেন বললেন? যেমন, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ‘গুনয়াতু-তালিবীন’ গ্রন্থে বলেছেন। অতএব হানাফীরদরকে মুরজিয়া বলার কারণ কী? এবং তার ব্যাখ্যা বা বাস্তবতা কী?

তাছাড়া রিজাল শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবেও অনেক হানাফী মুহাদ্দিসকে মুরজিয়া বলা হয়েছে কেন? এর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর :- মুরজিয়া একটি আরবী শব্দ, যা ইরজা থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হল, আশা করা; আকাঙ্ক্ষা করা বা পিছিয়ে দেয়া।

পরিভাষায় এটি একটি সম্প্রদায়ের নাম, যারা ঈমান আনার পরে আমল করা ছাড়াই জান্নাতে যাওয়ার আশা করে। অন্য কথায় বললে, তারা ঈমান আনার সাথে সাথে আমল করতে হবে- এ কথার পক্ষপাতি নয়। বরং আমলকে ঈমান থেকে পেছনে ফেলে রেখে, আমল ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করার স্বপ্ন দেখে এবং মনে করে, কিয়ামত দিবসে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কেবল ঈমান আনাই যথেষ্ট, আমল করার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে ঈমান আনল, সে হাজারও আমল তরক করুক বা গুনাহের সাগরে ডুবে থাকুক না কেন, আল্লাহ তাকে তার ঈমানের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাতে বাধ্য।

আজকে যারা লিখনী ও কলমের খোঁচায় হানাফীদেরকে মুরজিয়া চিত্রায়িত করতে সাচ্ছন্দবোধ করে, তাদের সাথে থাকলে, তারা হানাফীদের কিতাব পত্রে, বা কোনও নির্ভরযোগ্য হানাফী এমন বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা দেখাক! আবু হানীফা রহ. সহ হানাফী ইমামদের আকীদা বিষয়ক কিতাবাদি তো সকলের হাতের নাগালেই রয়েছে। একটু কষ্ট করে বাস্তবতা খতিয়ে না দেখে, বরং ‘কে বা কারা বলেছে’ তার উপর ভিত্তি করে এমন জঘন্য অপবাদ আরোপ করাও কি কোনো মুসলিমের কাজ?!

বাস্তবতা হল, মু’তামিল-খারেজীরা আবু হানীফা রহ. এর সাথে সম্মুখ মুনাযারা ও বিতর্কে বার বার পরাজিত হয়ে তাকে মুরজিয়া অপবাদ দিতে

শুরু করে। পরে কোনো কোনো আহলে সুন্নাহর ইমামের কাছে আবু হানীফাকে মুরজিয়া বলা হলে তারা বলতেন, হ্যাঁ তিনি মুরজিয়া তবে ভ্রান্ত মুরজিয়া নন, বরং তিনি সুন্নী মুরজিয়া।

উল্লেখ্য, “ইমাম আবু হানীফা মুরজিয়া নন” সরাসরি এ কথা না বলার কারণ হল, ‘মুরজিয়া’ এর একটি শাব্দিক মানে হল ‘পেছনে রাখা’ আর ইমাম আবু হানীফা রহ. আমলকে ঈমানের মূল গঠন প্রণালী থেকে পিছিয়ে দেয়ার কারণে তাকে শাব্দিক অর্থে মুরজিয়া বলা হয়েছে।

তাই বলে তাকে ভ্রান্ত মুরজিয়া বলার কোনো যৌক্তিকতা আছে?

আসুন তার পরেও আমরা সে সকল বইয়ের পাতায় একটু চোখ বুলিয়ে আসি, যেখানে ইমাম আবু হানীফাকে মুরজিয়া বলা হয়েছে। তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিবে যে, তারা যে সব বর্ণনার উপর ‘হানাফীরা মুরজিয়া’- এ তকমার ভিত্তি দাড় করিয়েছে, তা কতটুকু মজবুত!

আমরা প্রথমে মুরজিয়া ও তার উৎসশব্দ ‘ইরজা’ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি।

মুরজিয়া শব্দটি ‘ইরজা’ থেকে গঠিত। ‘ইরজা’র শাব্দিক অর্থ হল, “تأخير” অর্থাৎ পিছিয়ে দেয়া, “إعطاء الرجاء” অর্থাৎ ভরসা প্রদান করা, আশ্বাস দেয়া।

‘ইরজা’ দু প্রকার:-

১. ইরজাউস-সুন্নাহ, অর্থাৎ সুন্নাহসম্মত ইরজা।
২. ইরজাউল-বিদআহ অর্থাৎ সুন্নাহ পরিপন্থী ইরজা।

প্রথম প্রকার থেকে উদ্দেশ্য হল, আমলকে ঈমানের মূল ভিত্তি না বলা, বরং পরিপূরক বলা।^{৪৫৬}

গুনাহগার মুমিনের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোন শাস্তির কথা না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছে হলে আপন অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে ‘শাস্তি ভোগ করবে’ না বলা এবং ক্ষমার আশাও রাখা। যেমনটি হযরত ঈসা আ. বলেছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন,

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, (তাও করতে পারেন, আপনাকে কেউ কিছু বলার নেই) আপনি তো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।”^{৪৫৭}

উল্লেখ্য, এই আশা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এটা তখনই সম্ভব, যখন আমলকে ঈমানের মূল রুকন বা গঠনপ্রণালীর অংশ মনে করা হবে না। অন্যথায় আমলে ত্রুটি থাকলে বা অন্য গুনাহ থাকলে মূল ঈমানে ত্রুটি হয়ে যেত, ব্যক্তিকে মুমিন বলা যেত না।

এ প্রকারের ‘ইরজা’ কুরআন-সুন্নাহসম্মত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদার অন্তর্ভুক্ত। যারা এমন আকীদা পোষণ করে তাদেরকে ‘সুনী মুরজিয়া’ বলা হয়।

আর দ্বিতীয় প্রকার থেকে উদ্দেশ্য হল, একথা মনে করা যে, ঈমান (অন্তরে বিশ্বাস) থাকলে গুনাহে কোন ক্ষতি নেই।^{৪৫৮} অর্থাৎ গুনাহ করলেও কোন শাস্তি হবে না। সুতরাং আমলের কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। আর এই আশা রাখা বা আশ্বাস দেয়া যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার পরে আমল না করলেও, সে নিশ্চিত জান্নাতী হবে। যারা এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তাদেরকে ‘ভ্রান্ত বা বিদআতী মুরজিয়া’ বলা হয়।

হানাফীরা (ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত) মুরজিয়া নন:

যারা ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষক, তাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট যে, ওলামায়ে কেরাম মুরজিয়াকে দু-প্রকার তথা ভ্রান্ত মুরজিয়া ও আহলুস-সুন্নাহ মুরজিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা রহ., তাঁর ছাত্র ও নির্ভরযোগ্য রাবীগণকে সুনী মুরজিয়া হিসেবে গণ্য করা হত।^{৪৫৯}

ওসমান আল-বাত্তী রহ. আবু হানীফা রহ. এর কাছে প্রেরিত চিঠিতে বলেছেন, ‘আপনারা তো মুরজিয়া।’ তখন আবু হানীফা রহ. জবাবে বললেন, মুরজিয়া দু’ধরনের:

ক. অভিশপ্ত মুরজিয়া। (তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই)।

খ. রহমতপ্রাপ্ত মুরজিয়া। (আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত)।

^{৪৫৭} সূরা মায়েদা ১১৮।

^{৪৫৮} তানীবুল খতীব পৃ. ৯১।

^{৪৫৯} আর-রফউ ওয়াত তাকমীল পৃ. ৩৬০-৩৬১।

তিনি চিঠির জবাবে আরো লিখেন, নবীগণ আ.ও এমন (সুন্নী মুরজিয়া) ছিলেন; আপনি কি জানেন না যে, ঈসা আ. (নিজ উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহকে) বলেছেন, “আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন (তাতে আপনার কী লাভ) তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, (সেটাও করতে পারেন, সব আপনার ইচ্ছায়) আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”^{৪৬০}

অর্থাৎ আমরা যেমনিভাবে (মুসলমান) গুনাহগারকে মুমিন মনে করি এবং তার পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি চাইলে শাস্তি দিতে পারেন বা ক্ষমাও করতে পারেন। ঈসা আ.ও এমন মত পোষণ করতেন। সুতরাং আমাদেরকে (ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত) মুরজিয়া মনে করবেন না।

আবু হানীফা রহ. চিঠির জবাবে আরো লিখেছেন,

من أصاب الإيمان وضيع شيئا من الفرائض، كان مؤمنا مذنبا، وكان لله تعالى

فيه المشيئة إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له...

“যে ঈমান এনেছে, তবে কোন ফরয আমল ছেড়ে দিয়েছে, সে গুনাহগার মুমিন সাব্যস্ত হবে। তার পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছে হলে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছে হলে ক্ষমা করতে পারেন।”^{৪৬১}

আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ৯৭৫ হি.) আবু হানীফা রহ. এর জীবনীগ্রন্থ ‘আল-খায়রাতুল হিসান ফী মানাকিবি আবী হানীফাতান নু’মান’ এর ৩৭ নং পরিচ্ছেদে বলেছেন,

قد عد جماعة الامام أبا حنيفة من المرجئة وليس هذا الكلام على حقيقته، أما أولا فقال شارح المواقف كان غسان المرجيء ينقل الارجاء عن أبي حنيفة ويعده من المرجئة وهو افتراء عليه قصد به غسان ترويح مذهبه بنسبته الى هذا الامام الجليل، وأما ثانيا فقد قال الآمدي ان المعتزلة كانوا في الصدر الأول يلقبون من خالفهم في القدر مرجئا أو لأنه لما قال الايمان لا يزيد أو ينقص ظن به الارجاء بتأخير العمل عن الايمان.

“কিছু লোক আবু হানীফা রহ.কে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য করেছে। তবে তা বাস্তব অর্থে নয়। কেননা প্রথমত: ‘শরহুল মাওয়াফেক’

^{৪৬০} সূরা মায়দা ১১৮।

^{৪৬১} রিসালাতু আবী হানীফা ইলা ওসমান আল-বাত্তী, যা আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ. এর ‘আল-আকীদা ওয়া ইলমুল কালাম’ গ্রন্থের শেষে রয়েছে।

প্রণেতা (আল্লামা তাফতযানী রহ.) বলেছেন, গাসসান মুরজী আবু হানীফা রহ.এর নামে মুরজিয়াদের মতবাদ বর্ণনা করত। এটা তাঁর উপর অপবাদ। গাসসান নিজের (ভ্রান্ত) মতবাদ মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে আবু হানীফার মত মহান ব্যক্তিত্বের নাম ব্যবহার করেছে।

দ্বিতীয়ত: আমেদী রহ. বলেছেন, মু'তাহিলারা প্রথম যুগে তাকদীর প্রসঙ্গে তাদের বিরোধীদেরকে মুরজিয়ার তকমা দিত। অথবা এজন্য মুরজিয়া বলা হয়েছে যে, যেহেতু আবু হানীফা রহ. বলেছেন, ঈমান বাড়েও না, কমেও না, তাই কেউ কেউ ধারণা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা আমলের কোন গুরুত্ব না দিয়ে আমলকে ঈমান থেকে পেছনে ফেলে রেখেছেন।”^{৪৬২}

আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর ‘গুনয়াতুত তালিবীন’ প্রসঙ্গ:

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ‘গুনয়াতুত তালিবীন’ কিতাবের একটি পরিচ্ছেদে উম্মতে মুহাম্মাদীর ফিরকাসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে হানাফীদেরকে মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর বলেছেন, ‘হানাফী মুরজিয়া’ হল, আবু হানীফা নু’মান বিন সাবিত এর অনুসারীগণ। সুতরাং আসুন, আমরা একটু বিষয়টি খতিয়ে দেখি।

এ বিষয়ে উস্তাদে মুহতারাম সাঈদ আহমদ সাহেব (হাফিয়াহুল্লাহ) ‘আল-ই’তিমাদ’ গ্রন্থে যে বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন, তা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,

প্রথমত: শায়খ জিলানী উপযুক্ত দল-উপদলের বিবরণ দেওয়ার পর লিখেছেন, *على ما ذكره البرهوتي في كتاب الشجرة*

অর্থাৎ “আমি এই তথ্য বারাহতীর ‘কিতাবুশ শাজারা’ এর উপর ভিত্তি করে লিখেছি।”

এ ব্যাপারে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাহমুদ হাসান টুংকী রহ. ‘মু’জামুল মুসান্নিফীন’ (২/১৫৯) গ্রন্থে বলেন, বারাহতী এবং তার ‘কিতাবুশ শাজারা’ উভয়ই অজ্ঞাত ও অপরিচিত। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত: আমরা দেখার চেষ্টা করব বাস্তবেই হানাফীদের কথা ‘গুনয়াতুত তালিবীন’ গ্রন্থে আছে কি না?

উস্তাদে মুহতারাম বলেন, হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত কিতাবের জগতে ‘গুনয়াতুত তালিবীন’ এর ১০টির অধিক নুসখার সন্ধান পেয়েছি। এগুলো

অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, নুসখাগুলোর পরস্পরের বক্তব্যে ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে।

সবগুলো নুসখার বক্তব্য যাচাই করলে মোটামোটি তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

প্রথম প্রকারের বক্তব্য হল:-

أما الحنفية فهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت.

“হানাফী মুরজিয়া হলো আবু হনিফা নু’মান বিন সাবেতের অনুসারীগণ।”

অর্থাৎ আবু হানীফার সকল অনুসারীগণ মুরজিয়া।

এমন বক্তব্য চারটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং একটি মুদ্রিত নুসখায় রয়েছে।

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দুটি হলো:-

১. মাকতাবাতুল আকসার পাণ্ডুলিপি।

২. আল-মাকতাবাতুল কাদেরিয়ার ১৬৭৭ নং পাণ্ডুলিপি।

এছাড়া আরো দুটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে।

মুদ্রিত নুসখাটি হলো:-

মাতবায়ে সিদ্দিকী, লাহোর থেকে উর্দু তরজমাসহ ‘ফুতুহুল গায়ব’ নামে প্রকাশিত নুসখা।

দ্বিতীয় প্রকারের বক্তব্য হলো:-

وأما الحنفية فهم بعض أصحاب أبي حنيفة.

“হানাফীয়া হল আবু হানীফার কিছু অনুসারী।”

অর্থাৎ এখানে بعض বা ‘কিছু’ শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় আবু হানীফার সকল অনুসারীই মুরজিয়া নয়। বরং তার অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছু লোক হল মুরজিয়া, যারা আমলী মাসআলার ক্ষেত্রে আবু হানীফার অনুসরণ করে ঠিক, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ না করে মুরজিয়াদের অনুসরণ করে।

এমন বক্তব্য চারটি মুদ্রিত নুসখায় পাওয়া গিয়েছে। নুসখাগুলো হল:-

১. দারু ইহয়াইত তুরাস আল-আরবী থেকে মুদ্রিত নুসখা। (প্রথম প্রকাশ ১৪১৬হি. ১৯৯৬ ইং. পৃ. ১২৮)

২. মাতবায়ে আ-মান্দ, লাহোর থেকে ফারসী তরজমাসহ মুদ্রিত নুসখা পৃ. ২৩০।

৩. দারু সাদের ও দারুল বাশায়ের থেকে মুদ্রিত নুসখা পৃ. ১/১১৪।

৪. উলুল আলবাব ও আলবাবী আলহালাবী দামেস্ক থেকে মুদ্রিত নুসখা।

উল্লেখ্য, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাহমুদ হাসান টুংকী রহ. ‘মু’জামুল মুসান্নিফীন’ গ্রন্থে (২/১৫৮) লিখেন, “কিছু নুসখা পাওয়া যায়, যেগুলো থেকে بعض বা কিছু শব্দটি বাদ পড়েছে।”

তৃতীয় প্রকারের বক্তব্য হলো:-

কতক নুসখা এমন পাওয়া গেছে, যেগুলোতে ‘হানাফিয়া’ শব্দটিই নেই, বরং তার স্থলে আছে ‘গাসসানিয়া’। সে সকল নুসখার ইবারত এমন:-

وأما الغسانية فهم أصحاب غسان الكوفي.

“আর গসসানিয়া হল গসসান কূফীর অনুসারী।”

এমন বক্তব্য কয়েকটি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত নুসখায় পাওয়া গিয়েছে।

মুদ্রিত নুসখাগুলো হলো:-

১. দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত/লেবানন কর্তৃক মুদ্রিত নুসখা। (১/১৮৬) প্রথম প্রকাশ ১৪১৭হি. ১৯৯৭ইং. তাহকীক সালেহ আবীয়া।

উল্লেখ্য, এ নুসখার শুরুতে লিখা রয়েছে, এটি ইবনে হাজার হাইতামী রহ. এর সহস্বে লিখিত নুসখা থেকে কপি করা হয়েছে।

২. দারুল জিল বৈরুত থেকে মুদ্রিত নুসখা (১/২৩৩) প্রথম প্রকাশ ১৪২০হি. ১৯৯৯ইং তাহকীক, ইসাম ফারেস আল-হেরেস্তানী।

৩. দারুল খাইর থেকে মুদ্রিত নুসখা। তাহকীক, মাজেদ ইরসান আল-কীলানী।

হস্তলিখিত নুসখা হলো:-

‘আল-মাকতাবাতুল কাদেরিয়া’ এর ৩৭ নং পাণ্ডুলিপি।

উপর্যুক্ত চারটি নুসখায় ‘হানাফিয়া’ শব্দটি নেই। বরং তার স্থলে ‘গাসসানিয়া’র নাম রয়েছে।

সুতরাং বাস্তবে ‘গুনয়াতুত তালেবীন’ গ্রন্থে হানাফিয়ার নাম আছে কিনা, তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল।

এবার কালের শীর্ষ ইমামদের এ ব্যাপারে কী মতামত, তা একটু দেখি।

মুরজিয়া অপবাদের জবাবে আব্দুল হাই লখনবী রহ.:

ইমাম আব্দুল হাই লখনবী রহ.কে অপবাদদাতা লা-মাযহাবীরাও মান্যবর মনে করেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখেন। তাই ইমাম লখনবী রহ. এ বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখ করা হল।

ইমাম লাখনবী রহ. ‘আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল’ গ্রন্থে ‘গুনয়াতুত তালেবীনে’র বিবরণ উল্লেখ করার পর লিখেন, “‘গুনয়ার’ এই বক্তব্য নিয়ে শীয়ারা অনেক হৈচৈ করেছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবু হানীফা ও তার অনুসারীদেরকে মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দিয়েছে। পরে আবু হানীফার সাথে বৈরীভাবপূর্ণ কিছু আহলুস সুন্নাহও শীয়াদের তাকলীদ ও অনুসরণ করে আবু হানীফা এবং তার অনুসারীদেরকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার জন্য মুরজিয়া বলতে শুরু করে।

শীয়াদের এমন অপবাদে আশ্চর্য এবং দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ তারা আহলুস সুন্নাহর দূশমন। তারা উম্মতে মারহুমার সালাফ এবং বড় বড় সাহাবাগণকেও গালিগালাজ ও অপবাদ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। সেখানে আবু হানীফা ও তার অনুগামীদেরকে অপবাদ দিতে তাদের কী আসে যায়?!

তবে দুঃখ ও আশ্চর্য লাগে ঐ সব লোকদের দেখে, যারা একদিকে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের দাবী করেন। অপর দিকে কোন প্রকারের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই উম্মাতে মুসলিমার সালাফ এবং ইমামদেরকে গালি-গালাজ করেন, তাদের উপর অপবাদ দিয়ে থাকেন।

তিনি আরো বলেন, পূর্বেও এখনও ‘গুনয়ার’ এই বক্তব্য নিয়ে চার মাযহাবের ওলামাদের মধ্যে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে এবং সবারই সামনে এটি জটিল প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে যে, আব্দুল কাদের জিলানীর মত মহান ও মহৎ ব্যক্তির পক্ষে কি করে আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে এমন মন্তব্য প্রকাশ পেতে পারে!?

এই প্রশ্ন উঠার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর রচিত ‘আল-ফিকহুল আকবার’ এবং ‘আল ওসিয়াহ’ নামক কিতাবদ্বয় আজও পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান। আবু হানীফার আকীদা কী ছিল, তা এ কিতাবদ্বয় পাঠ করলে সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এমতাবস্থায় সবকিছু থেকে চোখ বন্ধ করে আবু হানীফা রহ.কে মুরজিয়া বলার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

২. শায়খ জিলানী নিজেই ইমাম আবু হানীফাকে ‘ইমাম’ শব্দে উল্লেখ করেছেন এবং শরয়ী মাসআলায় মতানৈক্যের ক্ষেত্রে অন্য ইমামগণের সঙ্গে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতামতও উল্লেখ করেছেন।

যেমন ফজরের নামাযের ‘সময়’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইমাম আহমদ রহ. এর নিকট তাগলীস বা অন্ধকার থাকতে ফজর পড়া উত্তম। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট ‘ইসফার’ বা কিছুটা আলোকিত হওয়ার পর ফজর পড়া উত্তম।

যদি শায়খ জিলানী ইমাম আবু হানীফাকে ভ্রান্ত মুরজিয়া মনে করতেন, তাহলে তিনি আবু হানীফা রহ.কে ইমাম বলতেন না এবং শরয়ী বিষয়ে তার মতামতও উল্লেখ করতেন না।

এরপর ইমাম লখনবী রহ. ওলামাদের মন্তব্য থেকে দশটি জবাব উল্লেখ করেছেন এবং তার অধিকাংশই তিনি খ-ন করেছেন। আমরা সেখান থেকে সংক্ষেপে কয়েকটি জবাব উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম লখনবীর দ্বিতীয় জবাব:

তিনি বলেন, আব্দুল গণী নাবলুসী রহ. সহ কেউ কেউ বলেছেন, হানাফীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ কোনো ব্যক্তি এই বক্তব্য ‘গুনয়া’তে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এটি পূর্বে ছিল না।

তিনি প্রমাণ হিসেবে কিছু উদাহরণ পেশ করেন যে, অনেক বড় বড় ওলামাদের কিতাবেও এভাবে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ-ন:- লখনবী রহ. বলেন, এটাতো কেবল একটি সম্ভাবনা। আর সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। হ্যাঁ, তবে যদি ‘গুনয়া’র এমন কোন নুসখা পাওয়া যায়, যেখানে ‘হানাফিয়া’র ব্যাপারে এ বক্তব্য নেই, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, এটি অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে; অন্যথায় নয়।

ইমাম লখনবীর তৃতীয় জবাব:

কেউ কেউ বলেছেন, হানাফিয়া শব্দটি ‘গাসসানিয়া’র পরিবর্তে ভুলক্রমে এসে গেছে।

খ-ন:- লখনবী রহ. উপর্যুক্ত জবাব খ-ন করতে গিয়ে বলেন, পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার দাবী কেবল সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। যদি এক স্থানে মেনেও নেওয়া হয় যে, ভুলক্রমে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যার স্থানে কি করে ‘হানাফিয়া’ আসলো? উভয় স্থানে ভুল হবে- এটা মানা যায় না।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জবাবে ইমাম লখনবী রহ. সম্ভাবনার কথা বলেছেন এবং ‘হানাফিয়া’ শব্দ নেই- এমন নুসখার দাবী করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা উপরে তৃতীয় প্রকার নুসখার আলোচনায় এমন চারটি নুসখা দেখাতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে হানাফিয়া শব্দ নেই। বরং তার স্থলে (শব্দ ও ব্যাখ্যা উভয় স্থানেই) ‘গাসসানিয়া’ শব্দ রয়েছে।

সুতরাং কেবল সম্ভাবনা নয়, বরং অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, ‘হানাফিয়া’ শব্দটি ‘গাসসানিয়া’র স্থলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এখানে ইমাম যাহাবী রহ. এর কথাটিও গুরুত্ব রাখে। তিনি ‘সিয়ারু আ’লামীন নুবালা’ গ্রন্থে (২০/৪৫১) শায়খ জিলানীর জিবনীর শেষাংশে লিখেন, “শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী বড় উচ্চ মর্যাদার আধিকারী। কিন্তু তার কিছু কথা এবং দাবী অমূলক। অবশ্য এসব অমূলক কথার অনেক গুলোই তার নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে।”

এছাড়াও আব্দুল কাহের বাগদাদী রহ. ‘আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক’ (পৃ. ১৩৬)-এ এবং আব্দুল কারীম শাহরাস্তানী রহ. এবং ‘আল-মিলাল ওয়ান নিহাল’ গ্রন্থে (দারুত তাওফীকিয়া লিততুরাস পৃ. ১০০) মুরজিয়াদের তালিকায় ‘গাসসানিয়া’ উল্লেখ করেছেন (হানাফীয়া নয়)।

এছাড়াও শাহরাস্তানী রহ. ‘আল-মিলাল’ গ্রন্থে বলেছেন,

ومن العجيب! أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه، ويعده من المرجئة! ولعله كذب كذلك عليه؟ لعمرى! كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجئة السنة. وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة، ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: "الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص"، ظنوا أنه يؤخر العمل

عن الإيمان. والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل!؟

وله سبب آخر، وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول، والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر: مرجئا، وكذلك الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقَي المعتزلة والخوارج. والله أعلم.

“কী অদ্ভুত ব্যাপার! গাসসান তার নিজের মতাদর্শ আবু হানীফা রহ. এর নামে বর্ণনা করে এবং তাকে মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করে।

সম্ভবত! সে ইমামের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়েছে। খোদার কসম! ইমাম আবু হানীফা এবং তার অনুসারীদের ‘মুরজিয়াতুস সুন্নাহ’ বলা হত। অথচ অনেক রচয়িতাগণ তাকে মুরজিয়াদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

এর একটি কারণ এটা হতে পারে, ইমাম আবু হানীফা রহ. যেহেতু বলেছেন, ঈমান কেবল অন্তরের সত্যায়নকেই বলা হয়; ঈমান বাড়েও না এবং কমেও না। তাই তারা ধারণা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা আমলের কোন গুরুত্ব দেন না। পরকালে মুক্তির জন্য কেবল ঈমানকেই যথেষ্ট মনে করেন।

অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কেননা যিনি আমলী মাসআলা-মাসায়েলের গবেষণায় জীবন ব্যয় করলেন, কীভাবে ভাবা যায়, তিনি আমল ছেড়ে দেয়ার ফতোয়া দিবেন?!

এর দ্বিতীয় কারণ হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রথম যুগের ‘কাদেরিয়া’ ও ‘মু’তামিলাদের’ বিরোধিতা করতেন। আর মু’তামিলারা যারা তাদের বিরোধিতা করতো, তাদের উপর মুরজিয়া তকমা লাগাতো। হুবহু একই কাজ করতো খাওয়ারিজদের অঙ্গ ফেরকা ‘ওয়াদিয়া’ও। খুব সম্ভব আবু হানীফা রহ. এর উপর এই অপবাদটি মু’তামিলা এবং খাওয়ারিজদের পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে।”

আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা আরো কিছু ব্যক্তিকে অনুসরণীয় মনে করেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখেন। এমন কিছু ব্যক্তির বক্তব্য তুলে ধরা হল।

ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী ‘আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়া’ গ্রন্থে (১/২৭-২৯) বলেন, হানাফীদের ব্যাপারে ‘গুনয়াতুত তালেবীনে’র বক্তব্য সম্পর্কে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করে বলল, এই বক্তব্যের উপরে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

১. নির্ভরযোগ্য সকল উলামাদের ঐক্যমতে হানাফীগণ আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে ভ্রান্ত মুরজিয়া বলা কখনোই ঠিক হবে না।

২. মুরজিয়ারা যে আকীদা পোষণ করার কারণে মুরজিয়া হয়েছে, হানাফীগণ তো সে আকীদা পোষণ করেন না। তারপরেও তাদেরকে কেন মুরজিয়া বলা হবে?

মুরজিয়াদের আকীদা হলো কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার পর যত গুনাহেই লিপ্ত হোক, সে জাহান্নামে যাবে না বরং জান্নাতই তার আবাসস্থল।

পক্ষান্তরে হানাফীসহ সকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা হলো, ঈমান আনার পরে পাপে লিপ্ত হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ চাইলে

ক্ষমা করতে পারেন, চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন। সুতরাং হানাফীদের মুরজীয়া বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

জবাবে ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী বললেন, মুরজীয়া দুই প্রকার। এক প্রকার মুরজীয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে বহির্ভূত। আরেক প্রকার মুরজীয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার মুরজীয়া: তাদের আকীদা হল, যে ব্যক্তি মনে প্রাণে শরীয়ত বিশ্বাস করল এবং মুখে স্বীকার করল, সে যতই গুনাহ করুক তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের মুরজীয়া: যারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। তাদের আকীদা হলো, আমল ঈমানের অংশ নয় ঠিক, কিন্তু সাওয়াব ও আযাব আমলের উপর ভিত্তি করেই দেওয়া হবে।

এই দুই মুরজীয়ার আকীদার পার্থক্য হল, সকল সাহাবা এবং তাবেঈগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথম প্রকার মুরজীয়াদের আকীদা ভুল। এবং সালাফ বলেছেন, সাওয়াব ও আযাব আমলের উপর ভিত্তি করেই দেয়া হবে। সুতরাং সাহাবাগণ যাদেরকে ভুল বলবেন, তারা নিশ্চিত ভ্রান্তদল হবে।

অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের আকীদার ব্যাপারে কোন ইজমা পাওয়া যায় না, বরং এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান আমল থেকে ভিন্ন। আবার এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা বুঝে আসে ঈমান ও আমল এক ও অভিন্ন।

লক্ষণীয়! যারা মনে করেন, আমল ও ঈমান ভিন্ন জিনিস এবং যারা মনে করেন আমল এবং ঈমান একই জিনিস। উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, সাওয়াব এবং আযাব আমলের উপর ভিত্তি করেই হবে। সুতরাং তাদের মাঝে পার্থক্য হল, কেবল শাস্তিক বর্ণনা বা উপস্থাপনের মধ্যে।

ইমাম আবু হানীফা আহলুস সুন্নাহর বড় ইমাম, কিন্তু পরবর্তিতে কিছু লোক যারা মু'তামিল, মুরজীয়া বা অন্য কোন দলের আকীদা পোষণ করত, তারা আমলী মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসরণ করার নামে নিজেদেরকে হানাফী দাবী করতে শুরু করে এবং নিজেদের আকীদা মানুষের মাঝে প্রচার করার জন্য বলে বেড়াতে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফাও আমাদের মত আকীদা পোষণ করতেন।

এ কারণেই ইমাম তাহাবী রহ. সহ অন্যান্য ইমাম এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন এবং তাদেরকে প্রতিহত করেছেন। আর মানুষের সামনে আবু হানীফার সঠিক আকীদা প্রকাশ করেছেন। ফলে সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হানাফীগণ আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। (আত-তাফহীমাত)^{৪৬৩}

● খতীব বাগদাদী রহ. ‘তারীখে বাগদাদ’ এর পৃ. ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮০ তে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হানীফা রহ. মুরজিয়া ছিলেন।

বাস্তবতা হল, তিনি যে সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোই দুর্বল। কারণ সূত্রগুলোতে এমন কিছু বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা অগ্রহণযোগ্য ও ঘৃণিত। আর যদি কোনটি সহীহও ধরে নেওয়া হয়, তবুও তা থেকে সুন্নী মুরজিয়া বুঝে নিতে হবে, ভ্রান্ত মুরজিয়া উদ্দেশ্য নয়।^{৪৬৪}

● শায়খ আব্দুল ফজল আহমদ বিন আলী বিন আমর বায়কান্দী বুখারী শীযী (যিনি সুলাইমানী নামে প্রসিদ্ধ) বলেছেন, মিসআর (বিন কিদাম) হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান, নু’মান বিন সাবিত আবু হানীফা, আমর বিন মুররাহ ইত্যাদী মুরজিয়া ছিলেন, তিনি আরো কিছু লোকের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. সুলাইমানীর কথার জবাবে বলেছেন,

ولا عبرة بقول السليمانى: كان من المرجئة مسعر، وحماد بن أبي سليمان

والنعمان، وعمرو بن مرة.

“সুলাইমানীর একথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, মিসআর (বিন কিদাম), হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান, নু’মান (বিন ছাবিত আবু হানীফা), আমর বিন মুররাহ প্রমুখ মুরজিয়া ছিলেন।”^{৪৬৫}

● শায়খ হামেদ হুসাইন বিন মুহাম্মদ হুসাইনী শীযী হিন্দী ‘ইসতিকছাউল ইফহাম’ কিতাবের লেখক শায়খ সুলাইমানীর অনুকরণে আবু হানীফা রহ.কে মুরজিয়া বলেছেন। অথচ সে সুলাইমানী অন্য স্থানে আবু হানীফা রহ. কে শীযী বলেছেন, তাহলে তার কথার কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?!

^{৪৬৩} দেখুন, ‘আল-ইতিমাদ ফী তাওদীহিল ইকতিসাদ’ গ্রন্থের ৬ নং মতলবে ২০ নং প্রশ্নের উত্তর।

^{৪৬৪} তানীযুল খতীব পৃ. ৯৩, বিস্তারিত জানতে দেখুন, প্রাণ্ড পৃ. ৮৭-৯১।

^{৪৬৫} দেখুন, মীযানুল ইতিদাল মিসআর বিন কিদাম এর জিবনী।

ইমাম যাহাবী রহ. আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতেম রহ. এর জীবনীতে বলেছেন, আমি সুলাইমানীর আলোচনা না করলে তার জীবনী উল্লেখ করতাম না। সে মারাত্মক কাজ করেছে। কেননা সে বলেছে, ঐ সমস্ত শীয়া মুহাদ্দিসদের নামের বর্ণনা, যারা আলী রাযি. কে ওসমান রাযি. এর উপর প্রধান্য দেন। তারা হলেন আ'মাশ, নূ'মান বিন ছাবিত (আবু হানীফা), শু'বা বিন হাজ্জাজ, আব্দুররাজ্জাক, উবায়দুল্লাহ বিন মুসা, আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতেম।^{৪৬৬}

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী রহ. 'আর রফ'ওয়াত তাকমীল" (পৃ. ৩৫২) গ্রন্থে সুন্নি মুরজিয়া এবং বিদআতী মুরজিয়ার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অজ্ঞ ব্যক্তির যখন মীজানুল ঈতিদাল, তাহযীবুল কমাল, তাহযীবুত তাহযীব ও তাকরীবুত তাহযীব ইত্যাদি রিজাল শাস্ত্রের কিতাব সমূহে দেখবে বিভিন্ন নাকিদীন ইমামদের পক্ষ থেকে অনেক রাবীর উপর মুরজিয়া হওয়ার তকমা লাগানো হয়েছে, তখন তারা মনে করবে, এরা আসলেই আহলুস সুন্নাহ থেকে বহির্ভূত; ভ্রান্ত জাহান্নামী ফিরকা মুরজিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এ সকল কিতাবে উল্লেখ থাকার কারণেই ইমাম আবু হানীফা এবং তার উস্তাদ ও শাগরিদদের উপরে এমন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

মূলতঃ ইরজা বা মুরজিয়ার উভয় প্রকার সম্পর্কে জানা না থাকার কারণেই মানুষ এমন মহান ইমামের উপর অপবাদ আরোপের মত জঘন্য পপের শিকার হয়েছে।

ইমাম যাহাবী 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে 'মিসআর ইবনে কিদাম' রহ. এর জীবনীতে লিখেন, "মিসআর হুজ্জাত এবং ইমাম। সুলায়মানী তার ব্যাপারে যে বলেছেন, 'মিসআর, হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান, আবু হানীফা... এরা সবাই মুরজিয়া ছিল'- এ কথাই কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ইমাম যাহাবী আরো বলেন, অনেক বড় বড় ইমামগণ (সুন্নি) মুরজিয়া ছিলেন। তাদের ব্যাপারে বিদেষ পোষণ করা ঠিক নয়।

ইমাম কাশ্মীরি রহ. 'ফয়যুল বারীতে' (১/৫৩-৫৪) বলেন, আমল ঈমানের অংশ কিনা? এ বিষয়ে চারটি মাযহাব রয়েছে। খাওয়ারেজ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে আমল ঈমানের অংশ। কেউ আমল ছেড়ে দিলে খারেজীদের মতে ঈমান থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে।

আর মু'তামিলারা মনে করে, আমল ত্যাগকারী ঈমান থেকে বের হবে ঠিক, কিন্তু কাফের হবে না। বরং কুফর এবং ঈমানের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে, অর্থাৎ সে মুমিনও না কাফেরও না।

এই গেল খাওয়ারেজ এবং মু'তামিলাদের দুই মাযহাব,

তৃতীয় মাযহাব মুরজিয়াদের, তারা বলে আমল তো ঈমানের অংশই না, উপরন্তু আখেরাতে মুক্তির জন্য আমলের কোন প্রয়োজনই নেই; কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট।

তাহলে দেখা গেল, প্রথমোক্ত দুই মাযহাব এবং মুরজিয়াদের মাযহাব বিপরীত দুই মেরুতে। এক পক্ষের দাবি আমল ত্যাগকারি কাফের, অপর পক্ষের দাবি আমলের কোন প্রয়োজন নেই।

চতুর্থ মাযহাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর। তারা এ ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বনকারী। তাদের দাবি হলো, আমল করা আবশ্যকীয়। তবে কেউ আমল ত্যাগ করলে, সে কাফের হবে না, বরং ফাসেক হবে। তারা খারেজী ও মু'তামিলাদের মত অতিরিক্ত কঠোরতাও করে না, আবার মুরজিয়াদের মত আমলকে তুচ্ছও মনে করে না।

এরপর আহলুস সুন্নাহ আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদিসের বক্তব্য হলো, বিশ্বাস এবং আমল উভয়টির সংযুক্তিতে ঈমানের অস্তিত্ব।

আর ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ ফকীহ ও মুতাকাল্লিমীনের মত হল, আমল ঈমানের অংশ নয়। তবে উভয় দলই এ কথার উপর একমত যে, বিশ্বাস ত্যাগকারী কাফের এবং আমল ত্যাগকারী ফাসেক। সুতরাং বর্ণনা ভঙ্গির ভিন্নতা ছাড়া তাঁদের মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য থাকল না।

মুহাদিসগণ যদিও আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন, কিন্তু এমন অংশ মনে করেন না, যার অনুপস্থিতিতে মূল ঈমান চলে যাবে, বরং তাদের নিকটেও আমল ত্যাগ করার কারণে ঈমান চলে যায় না।

আর ইমাম আবু হানীফা যদিও আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন না, তবুও আমলের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং মানুষকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং আমলকে ঈমান বৃদ্ধির কারণ মনে করেন। মুরজিয়াদের মত আমলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। তবে যেহেতু মুহাদিসীদের তুলনায় ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বর্ণনা ভঙ্গি মুরজিয়াদের

কাছাকাছি, তাই হানাফীদেরকে মুরজিয়া বলে অপবাদ দেয় হয়েছে। এটা স্পষ্ট আমাদের উপর একটি জুলুম।

যদি বক্তব্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়ে শুধু বর্ণনা ভঙ্গি এক হওয়ার কারণেই আমরা মুরজিয়া হয়ে যাই, তবে এই যুক্তিতে মুহাদিসগণও মু'তামিল সাব্যস্ত হবে। কারণ মু'তামিলারাও মুহাদিসগণের মত আমলকে ঈমানের অংশ মনে করে। অথচ আমরা তাদেরকে মু'তামিল বলি না। যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত শিকার হয়ে আমাদের উপর মুরজিয়া অপবাদ লাগিয়েছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। দীন কেবল কল্যানকর্মীতার নাম। কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি এবং মন্দ উপাধী দেয়ার নাম নয়। (ফয়যুল বারী)

ইবনে আবীল ইয় রহ. (যিনি আমলের দিক থেকে হানাফী আর আকীদার দিক থেকে সালাফী) 'শরহুল আকীদাতিত তাহাবীয়া' গ্রন্থে (পৃ. ৪৬২) বলেন, আবু হানীফা রহ. এবং আহলুস সুন্নাহর অন্য ইমামগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে, তা কেবল কেবল শাস্ত্রিক মতানৈক্য, তার দ্বারা আকীদার মধ্যে কোন সমস্যা হয় না।...

ইমাম ইবনুল আসীর শাফেয়ী রহ. 'জামেউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল' গ্রন্থের পরিশিষ্টে (১২/৯৫৩-৯৫৪) বলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. একজন আমলী আলেম ছিলেন, তিনি একাধারে দুনিয়াত্যাগী, নির্মোহ, ইবাদত গুজার, মুত্তাকী, খোদাভীরু, শরঈ ইলমের ইমাম, এবং সন্তোষজনক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার উপর বিভিন্ন তকমা লাগানো হয়েছে। খলকে কুরআন, কদর এবং ইরজা বা মুরজিয়া সহ আরো অনেক উদ্ভট বিষয় আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা থেকে তিনি পুত-পবিত্র।...ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ. (যিনি হানাফী মাযহাবের বড় ইমাম) একটি কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন (আকীদাতু আবী হানীফা রহ.) বা 'আবু হানীফার আকীদা'। তাতে বর্ণিত সবগুলোই আহলুস সুন্নাহর আকীদা। তার ব্যাপারে যে সকল বিষয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলোর একটিও তাতে উল্লেখ নেই। তার অনুসারীগণ যেহেতু তার অবস্থা, আকীদা-বিশ্বাস ও রায় সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি অবগত, তাই অন্যদের বর্ণনার বিপরীতে তার অনুসারীদের বর্ণনা মেনে নেয়াই শ্রেয়।

আর ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, কেন বলা হয়েছিল? কী ছিল তার কারণ? কোন বিষয় তাদেরকে উদ্ভুদ্ধ করল? সব কিছুই বর্ণিত আছে। সেগুলো এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ

আবু হানীফার মত মানুষ এবং ইসলামে তার মত ব্যক্তিত্বের জন্য অপবাদের ওয়রখাহী করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই।” (জামিউল উসূল)

সায়্যিদ মুরতাযা যাবিদী রহ. ‘উকুদুল যাওয়াহিরিল মুনীফা’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, আবু হানীফাকে মুরজিয়া বলাটা ভুল। কারণ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সকল অনুসারীগণ মুরজিয়াদের আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন।

যদি আবু হানীফা মুরজিয়া হতেন, তবে তার অনুসারীগণ নিশ্চিত তার রায় গ্রহণ করতো। অথচ তারা এখনও মুরজিয়াদের রায়ের চরম বিরোধী। যদি সকল মানুষ একদিকে থাকে, তার বিপরিতে দু’একজন ভিন্ন দাবি করে, তবে তার কথার প্রতি সন্দেহ করা যাবে না এবং তার দাবি সত্যায়ন যোগ্য নয়। এমনকি আবু হানীফা রহ. এর মতে মুরজিয়ার পেছনে নামায় পড়াও যায়েজ নেই।

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বড় চমৎকার কথা বলেছেন,

لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة، ثبت عليه ما ادعى عليه به، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، لزم ترك محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبته قوم إلى ما يرغب به عنه.

“যদি কারো প্রতি উদ্ভট বিষয়ের নিসবত সম্বন্ধের দাবি করা হলেই, তা প্রমাণিত হয়ে যেত এবং এর মাধ্যমে তার সাক্ষ্য ও নির্ভর যোগ্যতা বাতিল হয়ে যেত, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিস অগ্রহণযোগ্য হয়ে যেতেন। কারণ এমন কোন মুহাদ্দিস নেই, যার ব্যাপারে কেউ না কেউ অসঙ্গতিপূর্ণ কোন বিষয়ের দাবি করেনি।^{৪৬৭}

আল্লাহ পাক সবাইকে সহীহ বুঝ দান করেন। আমীন!

কেফায়েতুল্লাহ

আহলে হাদীস: ইতিহাস, ক্রমবিকাশ পরিচিতি ও পর্যালোচনা

এক নম্বরে উপশিরোনাম সমূহ:

- ইসলামী দৃষ্টিকোণে উপমহাদেশের অবস্থান কী ছিল?
- উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন কখন ঘটে?
- এতে হানাফীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কী?
- বর্তমান লা-মাযহাবীদের শ্লোগান সদৃশ শ্লোগান কি পূর্বে ছিল?
- আহলে হাদীস আন্দোলন কখন শুরু হয়?
- বর্তমান আহলে হাদীসরা কি পূর্বকার যুগের সেই আহলে হাদীস ও আসহাবুল হাদীস?
- ‘মাযহাব ছাড়’ এই শ্লোগানধারীরা কি ‘নবজন্ম’ ফিরকা নয়?
- বর্তমান আহলে হাদীসদের নীতিমালা কী কী?

হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। কোনো ফিরকা বা মতবাদের অনুসারী দল সম্পর্কে অধ্যয়নের নীতিমালার অন্যতম হলো, উক্ত দলের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্যক অবগতি। তাই যে কোনো ফিরকা ও দলকে হক কিংবা বাতিলপন্থী নির্ণয় করার পিছনে এ দিকটির গুরুত্ব অপরিসীম, যা বোদ্ধামহলে স্বীকৃত।

হক থেকে বিচ্যুত ফিরকাসমূহ থেকে একটি হল, ‘লা-মাযহাবী’ ফিরকা। সামনে তাদের ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে।

আমাদের লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীস ভাইয়েরা নিজেদেরকে এক আকর্ষণীয় শিরোনামে পেশ করে থাকে। যথা : মাযহাব নামক গৌড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র সহীহ হাদীসের অনুসরণ।

বোদ্ধামহলে স্বীকৃত কথা হলো, হক থেকে বিচ্ছিন্ন সব দল ও মতবাদই আকর্ষণীয় মনমাতানো মনোমুগ্ধকর মোড়কে নিজেদেরকে পেশ করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের হাটহাজারী মাদরাসার উস্তাদে মুহতারাম মুফতি নূর আহমদ সাহেব -হাফিয়াহুল্লাহ- ‘সহীহ মুসলিম’এর এক দরসে খুব

আক্ষেপের সাথে বলেন, “আজকাল কী হলো! যাদের মাঝে সুন্নাতের পাবন্দী নেই, তারা হয়ে গেছে সুন্নী। যারা তাকদীর মানে না, তারা হয়ে গেছে কাদরিয়্যাহ। আর যারা হাদীস মানেনা তারা হয়ে গেছে আহলে হাদীস”। যেমনটি ‘আহলে কুরআন’রা কুরআন অনুসরণের নামে হাদীস অস্বীকার করে থাকে।

প্রশ্ন :- ইসলামী দৃষ্টিকোণে উপমহাদেশের অবস্থান কি?

উত্তর :- জানা কথা যে, পূর্বযুগ থেকেই এই উপমহাদেশের নাম ছিল হিন্দ। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা এই হিন্দ বা পাক-ভারত উপমহাদেশকে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা সৌভাগ্য মণ্ডিত করেছেন।

- হযরত আদম আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে কারও কারও ভাষ্যমতে এই হিন্দুস্তানেই অবতরণ করেন।

হাফেজ ইবনে কাছীর রহ তাঁর রচিত তাফসীরে **أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا** আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন,

ونزل آدم بالهند ، ونزل معه الحجر الأسود... عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال: أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض الهند.....

“হযরত আদম আলাইহিস সালাম হিন্দুস্তানে অবতরণ করেন এবং সাথে করে হাজারে আসওয়াদ নিয়ে আসেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আদম আ. জান্নাত হতে হিন্দের ‘দাহনা’ নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং তার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বিষয়ক কিতাব ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার’ মাঝেও এমনটি উল্লেখ করেছেন।”^{৪৬৮}

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব সম্পর্কে হিন্দুস্তানবাসীরা সম্যক অবগত ছিল। তখনকার যুগের এক বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আদা হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করে সাহাবাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ইমাম হাকেম আবু আব্দিল্লাহ নিশাপুরী রহ. (মৃ. ৪০৫ হি.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

^{৪৬৮} তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১/১৭৪, দারুল আকীদা ২০০৮ সন; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/৮০, মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত ষষ্ঠ প্রকাশনা ১৪০৫ হি.।

«أَهْدَىٰ مَلِكُ الْهِنْدِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُرَّةً فِيهَا زَلْجَبِيلٌ فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً وَأَطْعَمَنِي مِنْهَا قِطْعَةً».

“একদা হিন্দুস্তানের বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কলসে করে আদা হাদিয়া পাঠায়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে সবাইকে খেতে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকেও এক অংশ খেতে দিলেন।”^{৪৬৯}

এমনিভাবে ব্যবসার সুবাদেও উপমহাদেশের বণিকদের সাথে আরব বণিকদের সু-সম্পর্ক ছিল। এ কারণে কিছু আরব বণিকদের মাধ্যমে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন।

তখনকার সারান্দীপের কতক আহলে ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকীদা-বিশ্বাস চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত এই দলটি পথের চড়াই-উৎরাই ও কিছু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ায় এমন সময় পৌঁছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রা. উভয়েই ইন্তেকাল করেন। এবং তখন ছিল হযরত ওমর রা. এর শাসনামল।^{৪৭০}

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ‘হিন্দুস্তান’ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, যেমন সাহাবায়ে কেরাম রা. কে ‘গায়ওয়ায়ে হিন্দ’-এর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

عصابتان من أمتي حررهما الله من النار : عصابة تغزو الهند ، وعصابة تكون

مع عيسى بن مريم.

“আমার উম্মতের দুই দলকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তাআলা নিষ্কৃতি দান করবেন। একটি হলো, যারা ‘গায়ওয়ায়ে হিন্দ’ এ জিহাদ করবে। দ্বিতীয়টি হলো, যারা হযরত ঈসা আ. এর সাথে থাকবে।”^{৪৭১}

- ইতিহাসের আলোকে আরও প্রমাণিত হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাক্কী ও মাদানী যিন্দেগীতে উপমহাদেশের অনেক লোক আরব দেশে ছিল। যাদেরকে আরবী

^{৪৬৯} মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ৭১৯০।

^{৪৭০} খিলাফাতে রাশেদা আওর হিন্দুস্তান, মাও. কাযী আতহার মুবারকপুরী পৃ. ৩১।

^{৪৭১} সুনানে নাসায়ী, গায়ওয়াতুল হিন্দ অধ্যায় হা. ৩১৭৫, এর সনদ সহীহ।

ভাষায় ‘যুত’ বলা হত। সম্ভবত এটা উর্দু ভাষায় ‘জুট’ এর প্রতিশব্দ। তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, পোষাক তাদের পরিচয় বহন করত। এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: لَا تَبْرَحَنَّ خَطُّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَلِّمُونَكَ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ... الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এশার নামায পড়ে ফিরে আসলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাত ধরে মক্কার নিম্নভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। তারপর ইবনে মাসউদ রা. কে এক স্থানে বসিয়ে একটি রেখা টেনে বললেন, ‘তুমি এ রেখা অতিক্রম করো না, অচিরেই তোমার নিকট কিছু লোক আসবে। তারা তোমার সাথে কোনো কথা বলবে না, তাই তুমিও তাদের সাথে কথা বলো না’।

ইবনে মাসউদ রা, বলেন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। আমি আমার স্থানে বসাবস্থায় কিছু লোক আমার নিকট আগমন করল, যেন তারা আকৃতিগত দিক থেকে ‘যুত’ বাসীদের সদৃশ...।”^{৪৭২}

২- হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ غَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَأَدَمُ جَسِيمٌ سَبَطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মে’রাজে ঈসা, মূসা ও ইবরাহীম আ. কে দেখেছিলাম। ঈসা আ. লাল বর্ণ কোকড়ানো চুল প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। মূসা আ. ছিলেন বাদামি রং বিশিষ্ট মোটাতাজা বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী, সোজা চুলধারী, যেন ‘যুত’ গোত্রের লোক।”^{৪৭৩}

^{৪৭২} তিরমিযী হা. ২৩২১।

^{৪৭৩} সহীহ বুখারী হা. ৩৪৩৮, দারু ইবনে হায়ম থেকে প্রকাশিত।

৩- হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. এর সাথে দশম হিজরীতে নাজরান থেকে বনু হারেস এর একটি প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করল। তাদের দেখে বলে উঠলেন,

من هؤلاء؟ كأنهم من رجال الهند.

“এদেরকে তো হিন্দুস্তানের লোকদের মত মনে হচ্ছে, এরা কারা?”^{৪৭৪}

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় এখানকার লোকদের আরবে আনাগোনা, অবস্থান ও সম্পর্ক ছিল।

তা ছাড়া ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে সাহাবায়ে কিরামের রা. এর জামাআতে কিছু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের নামও পাওয়া যায়। যেমন : হযরত যুবাইর যুতন হিন্দি রা.^{৪৭৫} ও মালিকুল হিন্দ হযরত বাযান রা.^{৪৭৬}

প্রশ্ন :- উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন কবে এবং হানাফীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কী?

উত্তর :- হিন্দুস্তানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুসলমানদের আগমন শুরু হয় দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা.-এর যামানায়। প্রায় পঁচিশজন সাহাবায়ে কেরাম ও বিশজন তাবেয়ী রহ. হিন্দুস্তানে আগমনের কথা ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া যায়।

এভাবে মুসলিম দিগ্বিজয়ী বীর সিপাহসালার মুহাম্মদ বিন কাসিম রহ. এর ভারত বিজয়ের তিনশত বছর পর্যন্ত এখানে মুসলমানদের আগমন ক্রমশ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে এখানকার বিরাট সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এদিকে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। একদা ২২৮ হিজরীতে খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ বাদশাহ ইসকান্দার কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্য একদল লোক পাঠায়। তারা সেখানে গিয়ে স্থানীয় লোকদেরকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী পায়।

^{৪৭৪} সহীহ ইবনে হিশাম ২/৪৫৭-৪৫৮, দারুল হাদীস কাহেরা থেকে ২০০৬ সনে প্রকাশিত।

^{৪৭৫} আল-ইসাবা ১/১৭৮।

^{৪৭৬} তাজরীদু আসমা'ইস সাহাবা ১/৪৫।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়, হিন্দুস্তানের মুসলমান দীর্ঘ সময় থেকে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতা ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষ দখল করার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

স্বয়ং নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব এই বাস্তবতাকে একাধিক স্থানে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں اور اسی مذہب کے عالم، فاضل، قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک جم غفیر نے کل کر فتاویٰ ہندیہ یعنی فتاویٰ عالمگیری جمع کیا اور اس میں شیخ عبدالرحیم دہلوی والد بزرگوار شاہ ولی اللہ مرحوم کے بھی شریک تھے۔

“ہিন্দوستان کے مسلمانوں کے सम्पर्के سار کथा হলো, যখন থেকে এখানে ইসলাম আগমন করে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু অধিকাংশ লোকই বাদশাহদের তরীকা ও মাযহাব অনুসরণ করে থাকে, তাই অদ্যাবধি আলেম-ওলামা, কাযী, মুফতি ও বিচারক, এই মাযহাব কেন্দ্রিক হয়ে আসছে।”^{৪৮০}

তিনি অন্যত্র বলেন,

اور ہند کے اکثر حنفی اور بعض شیعہ اور کم تر اہل حدیث ہیں۔

“(তার যুগে) হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হলেন, হানাফী মাযহাব অনুসারী। আর কিছু শিয়া ও অল্প কিছু আহলে হাদীস।”^{৪৮১}

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

حنفی جن سے یہ ملک بھرا ہوا ہے۔

“এই দেশ (হিন্দুস্তান) হানাফী মাযহাব অনুসারী দিয়েই ভর্তি।”^{৪৮২}

সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের উক্তির মাধ্যমেই এ আলোচনাটির ইতি টানা হলো।

^{৪৮০} তরজুমানে ওয়াহাবিয়া পৃ. ১০, মুহাম্মদী প্রকাশনী সাহোর।

^{৪৮১} প্রাপ্ত পৃ. ৫৭।

^{৪৮২} তরজুমানে ওয়াহাবিয়া পৃ. ১৫।

প্রশ্ন :- বর্তমান আহলে হাদীস ভাইদের শ্লোগান সদৃশ শ্লোগান কি পূর্ব যুগে ছিল?

উত্তর :- বাস্তবতা হলো, পূর্ব যুগের মনীষীগণ (মুজতাহিদ ব্যতীত) কোনো না কোনো ইমামের অনুসরণ করেছেন। তাঁদের কেউ ইমামের অনুসরণকে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত মনে করেননি। বরং তাঁরা সঠিক পন্থায় কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের জন্যই ইমামগণের বাতলানো মতকে অবলম্বন করেছেন, যা একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। আর ‘ইমামগণের নয়, সরাসরি কুরআন-হাদীসরই অনুসরণ’ সদৃশ শ্লোগান বহু পূর্বেই সর্বপ্রথম একদল লোক যারা ‘যাহিরিয়্যাহ’ নামে খ্যাত তাদের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল। মৌখিক দাবির দিক থেকে তারা ও বর্তমান আহলে হাদীসগণ কাছাকাছি। মৌলিকভাবে পার্থক্য শুধু এতটুকু, যাহিরিয়্যারা ইজমা’কে শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য করে থাকে। আর আহলে হাদীসরা গণ্য করেন না।

তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ইমাম দাউদ বিন আলী আসফাহানী রহ. (২০২-২৭০) এমন দাবি করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর শিষ্যদের থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন এবং হাদীস অন্বেষণের প্রতি তার বেশ ঝোক ছিল। প্রথম পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসরণ করতেন। তাঁর প্রতি সীমাহীন মুগ্ধও ছিলেন। কিন্তু কাল পরিক্রমায় তিনি হাদীসের বাহ্যিকতার অনুসরণের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। এবং এক পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসরণ হতে বিমূখ হয়ে পড়েন।^{৪৮৩}

তবে বাস্তবতার ময়দানে তাঁর এই মৌখিক দাবির উপর তিনি অটল থাকতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রেই কিয়াসের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।

যেমন খতীব বাগদাদী রহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) তার সম্পর্কে বলেন,

إنه أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى القياس في الأحكام قولا واضطر إليه

فعلا.

“দাউদ যাহিরী রহ., হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি শরীয়তের বাহ্যিকতার দাবি করে আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে কিয়াসকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কিয়াসের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।”^{৪৮৪}

^{৪৮৩} তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়া পৃ.৫৩১।

^{৪৮৪} তারীখে বাগদাদ ৮/৩৭৪।

এরপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে পূর্ণরূপে এগিয়ে আসেন আবু মুহাম্মদ আলী বিন আহমদ আন্দালুসী রহ. (৩৮৪-৪৫৬ হি.) যিনি ইবনে হাযম যাহেরী নামে পরিচিত।

তিনি এ মাযহাব কে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি তাঁর বিরামহীন প্রচেষ্টায় এক সময় হাম্বলী মাযহাবের চেয়েও এর প্রসিদ্ধি বেশি ছিল। তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যতার দরুণ তার জন্য এটি সম্ভবও হয়েছিল। কিন্তু তার ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ কিয়াসকে অস্বীকারের দাবির উপর তিনিও অটল থাকতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রে তিনিও কিয়াসের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন। আর এটা চির ধ্রুব সত্য হলো, কিয়াস অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

এরপর তার কতিপয় শিষ্য যেমন শায়খ আব্দুল্লাহ সহ অন্যরা এর প্রচার প্রসারে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েন। যার ফলে প্রত্যেক যুগেই তাদের চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত কিছু না কিছু লোক ছিল।

এরপর সপ্তম শতাব্দীতে তাদের ব্যাপকভাবে উত্থান হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ও স্পেন এর সকল শহরে তাদের মাযহাব বাদশাহ ইয়াকুব কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ পর্যন্ত তাদের ব্যাপক উত্থান ছিল। সংক্ষিপ্তভাবে এখানেই এর ইতি টানছি। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড. আবু যুহরা রহ. রচিত ‘তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়া’।

আহলে হাদীস ইতিহাস উল্লেখ করার পূর্বে উপমহাদেশে মুসলমানদের কিছু অবস্থা তুলে ধরা সঙ্গত মনে হচ্ছে, যা তাদের ইতিহাস পর্যালোচনায় যথেষ্ট সহায়ক হবে।

প্রশ্ন :- ভারত উপমহাদেশে কখন ‘আহলে হাদীস আন্দোলন’ শুরু হয়?

উত্তর :- যতটুকু জানা যায়, উপমহাদেশে ‘তাকলীদ ছাড়’ ফিতনাটা হিজরী দশম শতাব্দীর শেষ দিকে বাদশাহ হুমায়ুন এর তিরোধানের পর তার ছেলে সম্রাট আকবর এর মাধ্যমে সূচনা হয়। তার কিছু দরবারী মোল্লা তাকে মুজতাহিদ বানিয়ে দেয়। আর সম্রাট আকবরের যামানায় ইসলাম ও মুসলমানদের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, তা কারও কাছে অজানা নয়।

কিন্তু এ ফিতনা বেশি দিন আর বাকি থাকেনি। তারপর সম্রাট জাহাঙ্গীর এর শাসনামলে এগারতম শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ আহমদ সারহিন্দ যিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী নামে খ্যাত, তাঁর মুখলিসানা

৪৮৭ তরজুমাতে ওয়াহাবিয়াহ পৃ. ১৬ ।

অন্যত্রে তিনি লিখেন,

اور یہ لوگ (غیر مقلدین) اپنے دین میں وہی آزادی برتتے ہیں جس کا اشتہار بار بار انگریز

سرکار سے جاری ہوا۔

“এ সমস্ত লোক নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে ওই স্বাধীনতার কথাই বলছে, যা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বারংবার ঘোষিত হয়েছে।”^{৪৮৮}

তিনি আরো বলেন,

اور (مقلدین) چاہتے ہیں کہ وہی تعصب مذہبی و تقلید شخصی اور ضد و جہالت آبائی جوان میں

آتی ہیں قائم رہیں۔ اور جو آسائش رعایا ہند کو بوجہ آزادی مذہب گورنمنٹ عطا کی وہ اٹھ جائے۔

“মাযহাব-অনুসারীরা মাযহাবী গোড়ামী, (নবাব সাহেবের ভাষ্যমতে) তাকলীদে শাখছী এবং পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা অজ্ঞতার উপর বাকি থাকতে চায়। এবং ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত ধর্মে স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা থেকে মানুষদেরকে বঞ্চিত করতে চায়।”^{৪৮৯}

আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবী বন্ধুদের শায়খুল কুল মিয়া নাযীর হোসাইন দেহলভী রহ.-এর শ্বশুর ও উস্তাদ মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব লা-মাযহাবীদের উৎপত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

سوبانی مبانی اس طریقہ نواحدات (غیر مقلدیت) کا عبدالحق ہے جو چند روز سے بنارس میں

رہتا ہے اور حضرت امیر المؤمنین نے حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا اور

علمائے حرمین معظمین نے اسے قتل کا فتویٰ لکھا۔ مگر کسی طرح باگ کر وہاں سے بچ نکلا۔

پھر اس کے شاگرد خاص اور پیرو باخلاص دوسرے شہروں مثل عظیم آباد کلکتہ وغیرہ میں

پھیل گئے۔ ...

সারকথা, “এই নব উদ্ভাবিত ফিরকা ও দলের জনক হলেন আব্দুল হক বেনারসি। তার কিছু আপত্তিকর কর্মকাণ্ডের কারণে সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. তাকে মুজাহিদদের জামাত থেকে বহিস্কার করেন। এবং হারামাইনের ওলামায়ে কেরাম (তার ভ্রাতা) কর্মকাণ্ডের দরুন তাকে হত্যা করার ফতোয়া লিখে পাঠান। কিন্তু সেখান থেকে সে কোনোক্রমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে

যায়। পরবর্তীতে তার অনুসারীরা আযীমাবাদ, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং নিজেকে সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর খলীফা বলে দাবি করে সাধারণ লোকদেরকে নিজ দলে এনে গোমরাহ করতে থাকে। পরবর্তীতে এই দাওয়াত কিছুটা প্রচারিত হলে হকপন্থীদের সাথে তাদের তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। এমনকি পিতা, পুত্র, ভাই ও গোলাম-মনিবের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।”^{৪৯০}

এ প্রসঙ্গে নবাব কুতুবুদ্দীন এর কথা খুবই স্পষ্ট, তিনি বলেন,

مسكين قطب الدين مسلمان بهائيوں کی خدمات عالیا ت میں سلام پہچانے کے بعد حدیث پاک النصح لكل مسلم کے مقتضائی کے مطابق التماس کرتا ہے کہ تخمیناً چالیس برس کا عرصہ ہوا کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی اور مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا عبدالح صاحب ان حضرات کے ملک پنجاب لے جانے کے بعد بعض مفسدین مزاجوں کے خیال میں ائمہ دین متین کے تقلید کا کچھ انکار آیا تھا اور فقہاء اور فقہ کی طرف سے عناد کا تخم بالخصوص جناب حضرت ابو حنیفہ کی طرف ان سے دل میں جما تھا منجملہ ان لوگوں کے جنہوں لاند ہی کی خوب دادے کر بہت سے مسلمانوں کو حضرت سید احمد شہید کی خلافت کا مدعی بن کر بہکایا۔ اور فساد و نو احدث مذہب کا پھیلا مولوی عبدالح حق رہی تھا۔

“موسلمیم ভাইদের শুভ কামনায় বাদ সালাম আমি কুতুবুদ্দীন বলছি, সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী, মাওলানা ইসমাইল ও মাওলানা আব্দুল হাই রহ. পাঞ্জাবে আগমন করার প্রায় ৪০ বৎসর পর কতিপয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের মান্যবর ইমামগণের অনুসরণ হতে বিমুখতা প্রদর্শন দেখা যাচ্ছে। ফিকহ ও ফুকাহায়ে কেরাম এর প্রতি বিদ্বেষসুলভ আচরণ বিশেষত ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর প্রতি বিষোদগার করছে।

মোটকথা, সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর পক্ষ থেকে খিলাফতের যে ব্যক্তি বহু মুসলমানকে ধোঁকা দিয়েছে এবং নব জন্ম ফিরকার উদ্ভাবন করেছে, সে হলো আব্দুল হক বেনারসি।”^{৪৯১}

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, এই নব উদ্ভাবিত লা মাযহাবী ফিরকার জনক হলেন, আব্দুল হক বেনারসী। এবং দল আকারে ১২৪৬ সনে এর আত্মপ্রকাশ হয়।

^{৪৯০} তাসীহুদ দালদীন ও তাওফীরুল হক এর টীকা ১৭ দ্র.।

^{৪৯১} আননাজাতুল কামলা পৃ. ২১৬।

কারণ আব্দুল হক বেনারসী সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর ১২৪৬ হিজরিতে শাহাদতের পর তার খলীফা হওয়ার দাবি করে।

তবে নবাব সিদ্দীক হাসান খান ও মৌলভী মুহাম্মদ শাহাজানপুরী প্রমুখের ভাষ্যমতে এ দলটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংঘবদ্ধ এবং আত্মনিবেদিত মিশন হিসেবে রূপ দেন শাইখুল কুল মাও. সাইয়েদ নাযীর হোসাইন দেহলভী। তিনি তার রচনা, বক্তৃতা, ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই মিশনটাকে জনসাধারণের মাঝে পরিচিতি দান করেন।^{৪৯২}

সংশয় নিরসন:

প্রশ্ন :- বর্তমান আহলে হাদীসরা কি হাদীসে বর্ণিত সেই ‘আহলুল হাদীস’ বা ‘আসহাবুল হাদীস’?

উত্তর :- সর্বজনবিদিত কথা হলো, আহলুল হাদীস বা আসহাবুল হাদীস একটি শাস্ত্রীয় পরিভাষার নাম। বিশেষ কোনো ফিরকা বা মতবাদের নাম নয়। তাই ফিকহী বিষয়ে যে কোনো মাযহাবের অনুসারীও আসহাবুল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাই হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অথচ লা-মাযহাবী ভাইদের অনেক বইয়ে পরিচয় দেয়া হয়েছে, ‘আহলে হাদীস’ মানে পূর্বকার যুগের ‘আসহাবুল হাদীস’ বা ‘আহলুল হাদীস’ এর অনুসারী!

এখানে প্রথমে ‘আসহাবুল হাদীস’ বা ‘আহলুল হাদীস’ থেকে কারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন, এটা পরিষ্কার হওয়া চাই। তারপর বর্তমান নামধারী আহলে হাদীস ভাইদের উপর প্রয়োগ হয় কিনা দেখা যাবে।

আহলে ইলমের নিকট স্বীকৃত কথা হলো, যুগ যুগ ধরে হাদীস, উলূমুল হাদীস ও উসূলে হাদীস এর কিতাবসমূহের আলোকে ‘আহলুল হাদীস’ শব্দটি ঐ ব্যক্তির উপর প্রতিপাদ্য হয়, যে হাদীসের সনদ ও মতন (সূত্র ও মূল ভাষ্য) নিয়ে নিবেদিত...। হাদীস শরীফের হেফাযত, সংরক্ষণ ও হাদীস অশ্বেষণে যাঁরা দূর-দূরান্ত রিহলা ও সফর করে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। শাস্ত্রীয় বিষয় সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে, তার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। স্বয়ং সালাফীদের আস্থাভাজন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ প্রসঙ্গে সুন্দরই বলেছেন,

رُشْن لا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رَوَايَتِهِ بَلْ نَعْنِي

بِهِمْ: كُلُّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاتِّبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا

“শুধুমাত্র হাদীস শ্রবণ, লিখন অথবা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিদেরকেই আহলে হাদীস বলা হয় না। বরং আমাদের নিকট আহলে হাদীস বলতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বুঝায়, যারা হাদীস সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন আর উভয় প্রকার অর্থের অনুসারী হবে।”^{৪৯৩}

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ওয়াযীর ইয়ামনী রহ. আহলুল হাদীস এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ اسْمٌ لِمَنْ عَنِ بِهِ وَانْقَطَعَ فِي طَلْبِهِ كَمَا قَالَ

بَعْضُهُمْ:

إِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ عِلْمُ رِجَالٍ ... تَرَكَوا الْإِبْتِدَاعَ لِلاتِّبَاعِ

فَإِذَا جَنَّ لَيْلُهُمْ كَتَبُوهُ ... وَإِذَا أَصْبَحُوا غَدَوْا لِلسَّمَاعِ

فهؤلاء هم من أهل الحديث من أي مذهب كانوا, وكذلك أهل العربية, وأهل

اللغة فإنَّ أهل كلِّ فنٍّ هم أهل المعرفة فيه, وتحقيق ألفاظه ومعانيه

“জানা কথা হলো, আহলে হাদীস এমন একটি জামাআতের নাম, যারা হাদীস অর্জনে নিজের জীবন বিলীন করে দেয়। তারা যেই মাযহাবেরই হোক না কেন।....

তরাই হলো প্রকৃতপক্ষে আহলুল হাদীস। চাই তারা ফিকহী শাখাগত বিষয়ে কোনো মাযহাবের অনুসারী হোক না কেন। আরবী ভাষার বিষয়টিও একই রকম। কারণ, প্রত্যেক শাস্ত্রীয় ব্যক্তিরাই ঐ শাস্ত্রের আহল বা পরিবার।”^{৪৯৪}

সাম্প্রতিককালের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাও. আব্দুল মালেক সাহেব (হাফিয়াহুল্লাহ) ইয়ামানী রহ. এর উল্লিখিত ইবারত উল্লেখ করে বলেন,

فَأَهْلُ الْحَدِيثِ اسْمٌ لَطَائِفَةٌ مِنْ طَوَائِفِ أَهْلِ الْعِلْمِ اعْتَنَتْ بِالْحَدِيثِ وَعِلْمِهِ،

وَلَيْسَ اسْمًا لِفِرْقَةٍ فِقْهِيَّةٍ أَوْ عَقْدِيَّةٍ، وَفِي زَمَنِ تَسَلُّطِ الْإِنْجِلِيزِ عَلَى شِبْهِ الْقَارَةِ الْهِنْدِيَّةِ

^{৪৯৩} মাজমুউল ফাতাওয়া ৪/৯৫, শামেলা ভার্সন।

^{৪৯৪} আর-রউদুল বাসিম আন সুন্নাতি আবিল কাসিম ১/১২২।

سُرقت طائفة غير المقلدين هذا الاسم..... مع أن أهل الحديث لا يصح اسما لفرقة مذهبية - ولا سيما لفرقة غير المقلدين - لا شرعا ولا عرفا.

“আহলুল হাদীস হলো, আহলে ইলমের একটি জামাআতের নাম। যারা হাদীস ও উলূমুল হাদীস নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। ফিকহী বা আকীদা কেন্দ্রিক কোনো ফিরকার নাম নয়। উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের সময় গাইরে মুকাল্লিদ নামে একটি ফিরকা বা মতবাদ এ ইলমী উপাধিটি চুরি করে এর অপব্যবহার করে। অথচ শরঈ ও বাস্তবতা উভয় দিক থেকে আহলে হাদীস উপাধি বিশেষ কোনো মতবাদের উপর প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে গাইরে মুকাল্লিদদের উপর।”^{৪৯৫}

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, বর্তমান আহলে হাদীস ভাইদের উপর সর্বদিক থেকে এই শব্দটির প্রয়োগ ইলমী খিয়ানত হবে। যারা হাদীস অনুসরণ, সংরক্ষণ ও অনুধাবন করার যোগ্যতার সাথে দূরতম সম্পর্কও রাখে না তারা আবার প্রকৃত আহলে হাদীস?!

প্রশ্ন :- লা-মাযহাবী কি একটা নবজন্মা ফিরকা নয়?

উত্তর :- লা-মাযহাবী ভাইগণ নিজেদেরকে নতুন ফিরকা হিসেবে মানতে প্রস্তুত নয়। অনেকে আবার নিজেদের অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল এটা প্রমাণ করার পিছনে আদাজল খেয়ে নেমেছে, কিন্তু বাস্তবতায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরেছেন। অবাক করার মতো বিষয়! যখন দেখি, এই সহীহ হাদীস অনুসরণের দাবিদাররা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ‘মিথ্যুক’ রাবীদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।^{৪৯৬}

একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হলো, কোনো দল বা সম্প্রদায় পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকলে এর কিছু নিদর্শন থাকে, যা তাদের পূর্বোস্তিতির উপর প্রমাণ বহন করে। এই বাস্তবতার আলোকে আহলে হাদীস ভাইদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়, এটা একটা নতুন ফিরকা বা মতবাদ। উপমহাদেশের শুরুতেই যদি তাদের উপস্থিতি থাকত, যেমনটি হানাফীদের রয়েছে, তাহলে অবশ্যই তাদের নিদর্শন থাকত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইংরেজ সরকারের আধিপত্যের পূর্বে তাদের কোনো কিছু পাওয়া যায় না।

^{৪৯৫} শরহে নুখবাহ এর উপর লিখিত তা’লীক (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৬।

^{৪৯৬} যেমন আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেব ‘আহলে হাদীস আন্দোলন কি ও কেন?’ বইয়ে করেছেন।

এ কারণেই ইংরেজদের শাসনামলের পূর্বে আহলে হাদীসের কোন কিতাব, কোন মাদরাসা, কোন মসজিদ, কোন কবরস্থান, কোন তরজমায়ে কুরআন, কোন তরজমায়ে হাদীস ছিল না। এভাবে ‘তবাকাতে হানাফীয়াহ’, ‘তবাকাতে মালিকিয়াহ’, ‘তবাকাতে শাফিয়িয়াহ’ ও ‘তবাকাতে হানাবেলাহ’ নামে চার মাযহাবের অনুসারীদের জীবনি থাকলেও তাদের এমন কোন কিতাব নেই।

আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বেনারসে আব্দুল হক বেনারসী, ভূপালে নবাব সিদ্দীক হাসান খান এর পূর্বে, সিয়ালকুটে ইবরাহীম সিয়ালকুটি, দিল্লীতে মিয়া নাযীর হোসাইন দেহলভী এর পূর্বে কোনো আহলে হাদীস পাওয়া যায় না। নিম্নে আহলে হাদীস বরণ্য ব্যক্তিদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো:-

নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেন,

فقد نبتت في هذا الزمان فرقة ذات سمعة ورياء تدعي لأنفسها علم الحديث والقرآن والعمل بهما على العلل في كل شأن مع أنها ليست في شيء من أهل العلم والعمل والعرفان لجهلها عن العلوم الآلية التي لا بد منها لطالب الحديث في تكميل هذا الشأن وبعدها من الفنون العالية التي لا مندوحة لسالك طريق السنة عنها كالصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان فضلا عن كمالات أخرى وأن تشبهوا بالعلماء ويظهروا في زي أهل التقوى.

“সাম্প্রতিককালে লৌকিকতা ও সুখ্যাতি প্রিয় একদলের উদ্ভব হয়েছে, যাদের মাঝে সর্বপ্রকার দোষত্রুটি আর পূর্ণ দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানী ও তদানুযায়ী আমলকারীরূপে দাবি করে থাকে। অথচ ইলম-আমলের সাথে এদের কোনো দূরতম সম্পর্ক নেই। কারণ, তাদের উলূমে আলিয়া তথা কুরআন হাদীস বুঝার মাধ্যম পর্যায়ে ইলম সম্পর্কেও ধারণা নেই। অথচ তা একজন তালিবে হাদীসের অত্যাবশ্যকীয়। এমনিভাবে উলূমে আ-লিয়া তথা সুন্নাহর সহযোগী ইলম যথা ইলমুস সরফ, ইলমুন নাহব, ইলমুল লুগাহ, ইলমুল মাআনী, ইলমুল বাদী’ সম্পর্কেও জানা নেই। অন্যান্য ইলমের কথা বাদই দেওয়া হলো।

এবং তারা ওলামাদের সাদৃশ্যতা ও মুত্তাকীদের পোশাকে নিজেদেরকে পরিবেশন করে থাকে।”^{৪৯৭}

এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাওহীদপন্থী ও নিষ্ঠাবান বলে দাবি করা আর অন্যদের কে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা বড়ই অদ্ভুত বিষয়। বস্তুত তারা ধর্মীয় বিষয়ে সীমাহীন বাড়াবাড়ির শিকার।

প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী মৌলভী মুহাম্মদ শাহজাহানপুরী বলেন,

کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب دیکھنے میں آرہے ہیں جس لوگ بالکل نا آشنا ہیں۔ پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں تو ہوں۔ مگر اس با کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے۔ بلکہ ان کا نام ابھی تھورے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کو خود وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحّد کہتے ہیں۔ مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلدین یا وہابی یا لاندہب کہا جاتا ہے۔

“কিছু দিন থেকে হিন্দুস্তানে এমন একটি অপরিচিত মাযহাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার সম্বন্ধে জনসাধারণ মোটেই অবগত নয়। অতীতে এ মতাদর্শের কোনো লোক কোথাও ছিল কি না সন্দেহজনক। তবে এতো অধিক পরিমাণে চোখে পড়েনি। উপরন্তু তাদের নাম মাত্র ইদানীং শুনা যাচ্ছে। তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বা মুহাম্মদী বা মুওয়াহহিদ বলে দাবি করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাদের কে গাইরে মুকাল্লিদ বা ওয়াহহাবী কিংবা লা মাযহাবী বলে আখ্যায়িত করে।”^{৪৯৮}

প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আব্দুল জব্বার গজনবী বলেন,

قد نشأت في عصرنا فرقة تدعى اتباع الحديث وهم بمعزل عنه.

“আমাদের যামানায় এক দলের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের মৌখিক দাবি হাদীসের অনুসরণ। অথচ বাস্তবতার সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।”^{৪৯৯}

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লা-মাযহাবী একটা নতুন ফিরকা।

প্রশ্ন :- বর্তমান আহলে হাদীসদের আর কোনো নাম ছিল/আছে?

উত্তর :- বর্তমান আহলে হাদীস দলের সূচনাকালে কোনো নাম ছিল না, বরং তারা নিজেদেরকে ‘আমিল বিল হাদীস’ বলে দাবি করত। তাদের

^{৪৯৭} আল-হিস্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিহাহ পৃ. ১৩৯।

^{৪৯৮} আল-ইরশাদ ফি সাবীলির রাশাদ পৃ. ১৩।

^{৪৯৯} ফাতাওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস ৪/৭৯।

এই অপতৎপরতার কারণে তদানীন্তন ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ তাদেরকে ‘ওয়াহাবী লা-মাযহাবী’ বলতে থাকে। তখন তারা নিজেদেরকে ‘মুহাম্মদী’ বা ‘মুওয়াহহিদী’ বলে পরিচয় দেয়।

এরপর চক্রান্তের কৌশলে তাদের নিকট ‘আহলে হাদীস’ নামটি অধিক যুৎসই মনে হয়। ভাগ্যক্রমে ইংরেজদের প্রত্যয়নও এদের মিলে যায়।

মৌলভী শেখ আসলাম জয়রাজপুরী (তাদের কেন্দ্রীয় এক সদস্য) বলেন,

پہلے اس جماعت نے اپنا کوئی خاص نہیں رکھاتا۔ مولانا شہید جب مخالفوں نے ان کا بدنام کرنے کیلئے وہابی مہنا شروع کیا تو نہ اپنے آپ کو محمدی کہنے لگے۔ پھر اس کو چھوڑ کر اہل حدیث کا لقب اختیار کیا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔

“প্রথমে এ দলটি নিজেদের কোনো সুনির্দিষ্ট নাম স্থির করেনি। প্রতিপক্ষরা যখন তাদের দোষ প্রচার করার সময় তাদেরকে ওয়াহাবী বলত, তখন তারা নিজেদেরকে ‘মুহাম্মদী’ বলতে লাগল। এরপর এ নামটি যুৎসই না হওয়ায় ‘আহলে হাদীস’ নামটি বেছে নিলো। যা এখনো ব্যবহৃত হয়ে আসছে।”^{৫০০}

তারা মুহাম্মদী বলতে বুঝায়, সরাসরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসারী। আর বর্তমানে তারা নিজেদেরকে ‘সালাফী’ বলে দাবি করে। কিন্তু সালাফী শব্দটিও আহলে হাদীস শব্দটির ন্যায় একটি যামানার কেন্দ্রিক একটি মুবারক পরিভাষা, যা কখনো ইসলামী ফিরকা বা মতবাদের নাম হতে পারে না।^{৫০১}

প্রশ্ন :- লা মাযহাবী ভাইদের নীতিমালা কী কী?

উত্তর :- লা-মাযহাবী ভাইদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলে বা তাদের রচিত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করলে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠে। যা দেখে মনে হয়, যেন এই বিষয়গুলো হাসিলের জন্য তাদের এত আন্দোলন ও প্রোপাগান্ডা এবং এগুলোই যেন তাদের নীতি। যেমন:-

^{৫০০} ইংরেজদেরকে আহলে হাদীস নাম বরাদ্দ করা সম্পর্কে জানতে দেখুন ‘ফিরকায়ে আহলে হাদীস পাক ও হিন্দ কা তাহকীকী জায়েয়াহ’ পৃ. ৮৫-৮৮ ও মুহাযারায়ে ইলমিয়া, মুফতি রাশেদ আহমদ কৃত পৃ. ১১-১৩।

^{৫০১} সালাফী শব্দটির প্রয়োগ তাদের উপর বাস্তবার্থে কতটুকু সঠিক- এ সম্পর্কে জানতে দেখুন, ড. সাঈদ রামাদান বুতী রহ, কতক রচিত ‘আসসালাফিয়া মারহালাতুন যামানিয়া মুবারাকা’।

১. পূর্বেকার যুগের মনীষীদের উপর অনুসরণের আস্থা না রাখা। চাই তিনি যতই যুগশ্রেষ্ঠ মান্যবর হন না কেন।

২. বড় বড় মুফাসসির-মুজতাহিদ, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পূর্ণ দক্ষতার সাথে কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা উদঘাটন করেছেন, তাদের অনুসরণ করা যাবে না। প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ মাও. সানাউল্লাহ রচিত তাফসীর গ্রন্থই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেই কিতাবটিকে স্বয়ং তাদের ঘরানার লোকেরাই বিরূপ মন্তব্য করে থাকে।

৩. প্রায় মাসআলায় সহজতার পথকে বেছে নেয়া। আর তাদের বিপক্ষে কোনো হাদীস পেশ করা মাত্রই হাদীসটি দুর্বল ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যান করে বসবে। তাদের এই নীতির আলোকে মনে হয়, তারা বীহর নামায বিশ এর বদলে আট রাকআত, শবে বরাত বলতে কিছুই নেই, চারদিন পর্যন্ত কোরবানীর সুযোগ এবং এক সাথে তিন তালাক প্রদানে এক তালাক পতিত হওয়া ইত্যাদিকে বেছে নেওয়া।^{৫০২}

উল্লেখ্য, লা-মাযহাবী ও আহলে হাদীসদের পরস্পরের মাঝেও অনেক ফিরকা ও উপদল রয়েছে। প্রত্যেক ফিরকার আবার কিছু ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালাও আছে। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথের দিশা দিন। আমীন!

ইবরাহীম আলখলীল

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

^{৫০২} বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, গাইরে মুকাল্লিদ কা ফেরেব, মাওলানা জালালুদ্দিন আমজাদী সাহেব

পাঠকের মন্তব্য

الاقتصاد في التقليد والاجتهاد

تأليف

حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي



وعليه دروس قيمة وتعليقات نفيسة وتخريجات حديثة:

الاعتماد في توضيح الاقتصاد

سعيد أحمد

عفا الله عنه وعافاه

خادم الطلبة بجامعة دار العلوم معين الإسلام، هاتھزاري



مکتبۃ الاجتہاد
মাকতাবাতুল ইজতিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৯৪২-৫১৩২৩৫
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩